দাসকাহিনী

আদান-প্রদান

দাসকাহিনী

রমেশচন্দ্র শাহ

অনুবাদ
অজিত রায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

প্রত্যেক সমাজেরই গদ্য-আখ্যানের নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু সমস্ত সমাজেই আধুনিক উপন্যাসের সূচনায় পশ্চিমি প্রভাবের প্রতিফলনই চোখে পড়ে। এ-কথা ভিন্ন যে স্বকীয় বিকাশধারায় তাবৎ ভাষাসমূহে নিজস্ব আখ্যান-পরম্পরার সঙ্গে একটা সৃজামান সম্পর্কের অন্বেষাও আনুপূর্বিক অব্যাহত থেকেছে। হিন্দী উপন্যাস-সাহিত্যের ঋদ্ধিও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং তার উৎপত্তিই ঘটেছে পশ্চিমি সংস্কৃতির সঙ্গে একটা সিসৃক্ষু সংঘাতের প্রেক্ষাপটে। সাধারণত 1882 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লালা শ্রীনিবাসদাসের 'পরীক্ষাগুরু'কে হিন্দী ভাষার প্রথম উপন্যাস বলে চিহ্নিত করা হয়, যার আখ্যানবস্তু হলো ভারতীয় ও পশ্চিমি সংস্কৃতির পরিঘাত। কিন্তু এই সমুচিত প্রবর্তনা সত্ত্বেও হিন্দী উপন্যাসের গতিধারাকে আমরা দেবকীনন্দন খত্রীর ভিত্তিহীন কল্পনাকাহিনী এবং কিশোরীলাল গোস্বামীর ঐতিহাসিক-সামাজিক উপন্যাসের ক্রমঢালে বাঁক নিতে দেখি। খত্রীজীর উপন্যাসগুলি যেমন বাস্তবের ধরাছোঁয়ার বাইরে, গোস্বামীজীর উপন্যাসসমূহে তেমনি বাস্তবের নামে প্রাকৃতবাদের উৎকট প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে এ-যুগে হিন্দীতে উপন্যাস-প্রকরণের বাঞ্ছনীয়তা নিয়েই তুমুল বিবাদ খাড়া হয়েছিল। সেই বিতর্ক যথেষ্ট রোচক ছিল যদি-বা, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, যে-সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফলসমষ্টিতে হিন্দী উপন্যাসের গোড়াপত্তন ঘটেছিল, তাতে যৎকিঞ্চিৎ কক্ষচ্যুতি অবশ্যই ঘটেছে।

অতএব হিন্দী উপন্যাসের প্রথম যথার্থ ও বয়স্ক সৃজনমূলক বিস্ফোরণ চোখে পড়ে প্রেমচন্দে, যে-কারণে 1918 খৃষ্টাব্দে 'সেবাসদন'-এর প্রকাশ থেকে শুরু করে 1936 খৃষ্টাব্দে 'গোদান'-এর প্রকাশনা পর্যন্ত কালখণ্ডটি প্রেমচন্দ-যুগ নামে অভিহিত। প্রেমচন্দের আদর্শমুখী বাস্তববাদ একাধারে খত্রীজীর বাস্তব-বিমুখতা এবং কিশোরীলাল গোস্বামীর প্রাকৃতবাদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ সর্জনাত্মক বিদ্রোহ। 'গোদানে' এসে প্রেমচন্দের আদর্শবাদ আরও বেশি সৃষ্টিধর্মী হয়ে ওঠে এবং অতঃপর তা কোনো ঘোষিত উদ্দেশ্য গোছের নয়, বরং কৃতির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গ্রন্থিত হয়ে পড়ে। এই উপন্যাসটিতে এক ধরনের ক্লাসিক্যাল দৃষ্টির বিকাশের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। বলা যায়, প্রায় কুড়ি বছরের স্বল্প ব্যবধানে হিন্দী উপন্যাস-সাহিত্য এক শতাব্দীর বিকাশ-যাত্রা পূর্ণ করেছে। এ-যুগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক

জয়শংকর প্রসাদ। যিনি মূলত এক ছায়াবাদী কবি ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মূর্তরূপ প্রদানকারী নাট্যকার হলেও, উপন্যাস রচনায়— বিশেষত 'কঙ্কালে' তাঁর সমগ্র দৃষ্টি সামাজিক যাথার্থ্যের প্রতিই নিবদ্ধ।

হিন্দী কথাসাহিত্যের অগ্রগতির ধারায় প্রেমচন্দোত্তর যুগটি চিহ্নিত হয়ে আছে জৈনেন্দ্র-অজ্ঞেয় যুগ নামে। জৈনেন্দ্রর 'ত্যাগপত্র' এবং অজ্ঞেয়র 'শেখর ঃ এক জীবনী'র মতো উপন্যাস গুলির উল্লেখযোগ্যতা কেবলমাত্র তাদের গাঠনিক পরিণাহের গুণেই নয়, অধিকিন্তু সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তে সেগুলিতে মানবমনের অন্তর্বিরোধ, জটিলতা ও চিত্তবৃত্তি অপেক্ষাকৃত সুচিত্রিত হয়েছে। কাজে-কাজেই, যা স্বাভাবিক, হিন্দী ভাষারও একটা নতুন সৃজ্যমান পরিকর্ষ ইত্যকার কথাশিল্পীর হাতে সম্ভবপর হয়েছে। কেননা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বকে অভিব্যক্ত করার মতো ভাষার প্রয়োজন অনদ্যতন হিন্দী উপন্যাসে দেখা দেয়নি। খুব সম্ভবত ছায়াবাদী কবিতায় সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশকারী যে সমর্থ ভাষাটির ততদিনে বিকাশ ঘটেছিল, তাকেই অধিশ্রয় করে এই সব ঔপন্যাসিকরা একটি উপযুক্ত গদ্যভাষা আবিষ্কার করেন, যার আরেকটি নতুন রূপ সামান্য কালাত্যয়ে হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্ট কী আত্মকথা' প্রভৃতি আখ্যানসমূহে দৃষ্টিগোচর হয়। এই উপন্যাসটিও 'শেখর ঃ এক জীবনী'র আদলে একটি গাঠনিক পরীক্ষা, যাতে ভারতীয় আখ্যান-পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি সার্থক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। প্রেমচন্দীয় ধারাও এ-যুগে সক্রিয় থেকেছে এবং সেই ধারার কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে স্বতোসিদ্ধ যশপালকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হয়, যিনি তাঁর 'ঝুঠা অওর সচ' উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক যাথার্থ্যকে এক বৃহত্তর ক্যানভাসে চিত্রার্পিত করেছেন। তাঁর সমীপকালীন লেখকদের মধ্যে ভগবতীচরণ বর্মা ও অমৃতলাল নাগরের কৃতিত্বও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত ভগবতীচরণ বর্মার 'ভুলে-বিসরে চিত্র' আর নাগরজীর 'বুন্দ অওর সমুদ্র' হিন্দী কথাসাহিত্যে দুটি অনবদ্য সংযোজনা।

উত্তর জৈনেন্দ্র-অজ্ঞেয় যুগে হিন্দী উপন্যাসজগতে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নাম ফণীশ্বরনাথ রেণু, যাঁর 'মৈলা আঁচল' আর 'পরতী-পরিকথা' হিন্দী কথাসাহিত্যের আঞ্চলিক প্রামাণিকতাকে নতুন স্বরূপ ও আয়তন প্রদান করেছে। এ-যুগের উপন্যাসকারদের মধ্যে নরেশ মেহতা (য়্যহ পথ বন্ধু থা), কৃষ্ণবলদেব বৈদ (উসকা বচপন), শিবপ্রসাদ সিংহ (অলগ-অলগ বৈতরণী), নির্মল বর্মা (ওয়ে দিল), লক্ষ্মীকান্ত বর্মা (খালী কুর্সী কী আত্মা), শ্রীলাল শুক্ল (রাগ-দরবারী), রাহী মাসুম রেজা (আধা গাঁও), শানী (কালাজল) এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন বিশেষ উল্লেখ্য। বিগতদিনে বীরেন্দ্রকুমার জৈন, গিরিরাজ কিশোর, কৃষ্ণা সোবতী, রমেশচন্দ্র শাহ, মনোহরশ্যাম জোশী, অমৃতলাল নাগর, পঙ্কজ বিষ্ট, সুরেন্দ্র বর্মা, মহেন্দ্র ভল্লা, কৃষ্ণবলদেব বৈদ, শিবপ্রসাদ সিংহ, নির্মল বর্মা, মঞ্জুর এহতেশাম,

রাজী সেঠ, জ্যোৎস্না মিলন প্রমুখ বেশ-কিছু নবীন-প্রবীণ কথাসাহিত্যিকের কৃতিত্ব হিন্দী পাঠকদের মনোযোগ স্বাভিমুখে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাগুক্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র শাহ এবং বিশেষ করে তাঁর 'কিস্‌সা গুলাম' উপন্যাসটি অপরাপর বৈশিষ্ট-সহ এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক নিজেকে সেই মূল সমস্যাটির সঙ্গে সংসৃষ্ট করেছেন যা থেকে হিন্দী উপন্যাসের উৎপত্তি ধরা হয়েছে। ভারতীয় ও পশ্চিমি সংস্কৃতির সংঘাতের প্রথম ঔপন্যাসিক প্রতিফলন 'পরীক্ষাগুরু'তে পরিলক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটি একটি জাত্য ভাবনা হয়ে থেকেছে বটে, কিন্তু একমাত্র অজ্ঞেয়র 'অপনে-অপনে অজনবী' ব্যতিরেকে অন্য কোনো আখ্যানিক কৃতির মুখ্য উপজীব্য রূপে তা প্রতিফলিত হয়নি। 'অপনে-অপনে অজনবী'তে অজ্ঞেয় মৃত্যু-ব্যাপারে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির ঘাত-প্রতিঘাতের অছিলায় এই সমস্যাটিকে দার্শনিক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র শাহ তাঁর 'কিস্‌সা গুলাম'-এ আজকের নব্য-ভারতীয়দের এই সাংস্কৃতিক প্রতিদারণকে আবেগময় আত্মসংঘর্ষের স্তরে নিয়ে গিয়েছেন। শাহর প্রচেষ্টা চরিতার্থতা লাভ করেছে এই কারণে যেহেতু তিনি দুটি জীবনদৃষ্টির এই সংস্ফোটকে অথবা নিজের অবস্থানকে কোনো সহজসাধ্য সমাধানের মতো করে প্রতিস্থাপন করেন নি। অধিসংখ্যক হিন্দী উপন্যাসকারকে প্রেমচন্দীয় ধারার অনুগামিতার নামে ভারতীয় সমাজের অন্তর্বেদনা ও অন্তর্বিরোধকে নিছক অর্থনৈতিক সন্দর্ভের বেদিতে রাখতে দেখা যায়। শাহর উপন্যাসের প্রতি আমরা এই কারণেও এক দুর্লভ আকর্ষণ অনুভব করি কেননা তা ভারতীয় সমাজের মতিপ্রকর্ষগত ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে তার সমগ্র জটিলতা-সহ অনুধ্যান করার চেষ্টা করে। অধিকিন্তু, নিজস্ব ঐতিহ্য এবং তাতে অনুপ্রবিষ্ট ঐতিহাসিক বিকারগুলি সহ পশ্চিমের সর্বগ্রাহী চ্যালেঞ্জ থেকে উদ্ভুত বিপর্যয় সম্পর্কেও আমাদেরকে পরিজ্ঞাত করে।

সুতরাং 'কিস্‌সা গুলাম' আমাদেরকে কোনো রাজনৈতিক-আর্থিক দাসত্বের কাহিনী শোনায় না, উপরন্তু আমাদের মানসিক দাসত্বের সেই পরতগুলিকে অপাবৃত করে যেগুলির দরুণ আমাদের সমাজ একদিকে নিজস্ব অস্মিতায় অনুপ্রবিষ্ট ঐতিহাসিক বিকৃতিসমূহের দাসত্ব স্বীকার করে এবং অন্যদিকে সেই বিকৃতিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার মিথ্যা কুহকে পশ্চিমি বিমৃশ্যকারিতা স্বীকার করে যা তাকে স্বীয় সমাজের বিকারগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে অনুপ্রাণিত তো করেই না, উপরন্তু তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং অন্য এক ধরণের দাসত্বের বেড়াজালে বন্দী করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুন্দনের একজন দলিত জাতির ছাত্র থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদে উত্তরণ বস্তুত এক দাসস্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ভ্রান্তিতে আরেক দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ার এক দীর্ঘ পরিক্রমা। বাল্যজীবনের শোকাবহ দুর্গতি কুন্দনকে সমাজের প্রতি বিদ্রাহী করে তোলে। তার

পিতার প্রতি বিদ্রোহও সেই সামাজিক বিদ্রোহেরই দ্বিতীয় পর্যায়। কেননা তার পিতা নারায়ণরাম সেই সমাজের মূল দৃষ্টি ও ঔজস্যের প্রতীক যিনি স্বীয় সমাজকে স্বকীয় দৃষ্টিতে বুঝতে ও পরিষ্কৃত করায় বিশ্বাসী। এই সংক্ষুব্ধির চরম পরিণতি ঘটেছে তার জার্মান গুরুর কন্যা এলিসের সঙ্গে বিবাহে, যে-বিবাহের অস্থায়িত্ব সম্পর্কে নারায়ণরামই শুধু নয়, স্বয়ং এলিসের বাবাও তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি এলিসের মনে কোনো প্রতীতি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষে আসার পর থেরে সে ক্রমশ ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং জনৈক খৃষ্টান পাদ্রির সংস্পর্শে আসার পর সে যে একজন সনাতন খৃষ্টানের মতো আচরণ করা শুরু করে, তাই নয়, উপরন্তু কুন্দনের সঙ্গে তার মতবিরোধও প্রবলতর রূপ ধারণ করে এবং পরিশেষে একদিন সে তাকে পরিত্যাগ করে নিজের দেশে ফিরে যায়। এই ঘটনায় কুন্দনের মোহভঙ্গ ঘটে, যা তাকে পুনরায় নিজের সমাজের প্রতি উন্মুখ করে তোলে। প্রায় একই সময়ে সংঘটিত তার বাবার মৃত্যুও তাকে আত্মাবলোকনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে—গোটা উপন্যাসটি এই আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষা প্রক্রিয়ার এক অসাধারণ দলিল, যার পরিসমাপ্তি ঘটার আগেই কুন্দনের মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা ধরা পড়ার কিছু-কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসের পরিকাঠামোয় কেন্দ্রমূলে রয়েছে কুন্দনই, কিন্তু বাস্তবত লেখকের সৈদ্ধান্তিক বক্তব্য পরিস্ফুট হয়েছে তার পিতা নারায়ণরাম টাম্‌টার মাধ্যমে। কেননা উপন্যাসের সমাপ্তির দিকে দেখা যাচ্ছে কুন্দন তার বাবার দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। নারায়ণরাম নিজের দেশ ও সমাজের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ এক জনসেবক। তিনিও প্রবর্তমান ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্ণ হওয়ার জ্বালার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁর মতে এই রোগের নিদান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ধর্ম-পরিবর্তন নয়—বরং তিনি সমাজে বাস করে, সামাজিক মূল্যগুলিকে যথাযথ শনাক্ত করে সেই ঐতিহাসিক বিকৃতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে অপেক্ষাকৃত সাহসের কাজ বলে মনে করেন। 'সিডিউল কাস্টে'র মতো নয়, বরং সমাজের মুখ্যধারার অন্যতম সদস্য হয়ে বাঁচতে চান। এই কারণে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবাপন্ন নিজের আধুনিকতাবাদী শ্বশুরবাড়িকে তাঁর পছন্দ নয় এবং ঠিক একই কারণে জয়ের যাবতীয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নিছক 'তফসিলে'র মতো নির্বাচনে প্রার্থী হতে তিনি অস্বীকার করে দেন।

কুন্দন তাঁর ব্রাহ্মণ সুহৃদ রমদার মেয়ে ভাগীরথীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাবার কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু নারায়ণরামের তাতে ঘোর আপত্তি। তাঁর সনাতনী চোখে ভাগীরথী কুন্দনের বোনের মতো। কিন্তু তাঁর এই অসম্মতিকে কুন্দন দেখে সন্দেহের চোখে। সে মনে করে জাতিচিন্তাই এই অসম্মতির প্রধান কারণ। সুতরাং তার মন বাবার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু নারায়ণরাম প্রকৃতপক্ষে জাতপাতের বন্ধনকে স্বীকার করেন না, বরং এক শূদ্র

যুবক এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করলে যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে তিনিই রুখে দাঁড়ান এবং বিয়েটা যাতে আইনী আর সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে, তার জন্যে চেষ্টা করেন।

যদিও উপন্যাসটির স্বীকৃতি ঘটেছে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতি দিয়ে, তবু লেখকের সচেতনতার প্রশংসা না করে উপায় নেই যে তিনি ঐতিহ্য-ব্যাপারে কোনোরকম আত্মশ্লাঘার শিকার হয়ে পড়েন নি, যা সচরাচর ঐতিহ্যপন্থী লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। শাহর নায়ক উপন্যাসের শেষদিকে এসে আত্মগ্লানির অতিরেক থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবীক্ষণের দিকে ঝুঁকেছে দেখতে পাই। একটা সুস্থ আর সামঞ্জস্যযুক্ত আত্মসমীক্ষার প্রবণতা ক্রমে-ক্রমে কুন্দনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, যা তার বাবার চরিত্রে গোড়া থেকেই বিদ্যমান। এই কারণেই তার আত্মবিশ্বাসহীন চরিত্রে ক্রমশ স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস জেগে উঠতে দেখা যায়। যা তার নিজের সামাজিক অবস্থানের পরিজ্ঞান-সঞ্জাত।

লেখক এই মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেবলমাত্র সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন নি, তৎসহ এই অন্তর্বিরোধকে তিনি ভাষা, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং এইভাবে তাঁর এই আখ্যান-প্রচেষ্টা নিছক জাতপাত-সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুমুখী জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। শাহ এই উপন্যাসে যুগপৎ দুটি শৈলী ব্যবহার করেছেন। কুন্দনের কৈশোর ও তারুণ্যের বর্ণনা গল্পাকারে করা হয়েছে, আবার তার মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রধান শৈলীতে। এভাবে কুন্দনের গোড়ার দিককার জীবনের বর্ণনায় এক ধরনের অনুভূতিমিশেল প্রামাণিকতা রয়েছে যা পরবর্তী বুদ্ধিপ্রধান বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্ককেও একটা অনুভূতিসঞ্জাত আধার ও আবেগ প্রদান করেছে, যার ফলে আখ্যানের বুদ্ধিজীবীসুলভ বিতর্কসমূহও এক বিশেষ ধরনের ভাবাবেগ লাভ করেছে। রমেশচন্দ্র শাহ প্রাজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাগুলিকেও বিশ্লেষণ করেন গভীর অনুভূতির উপাদান মিশিয়ে এবং আখ্যানিক পরিবেশ চিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি বেশ নির্লিপ্ত, যা স্পৃহহীন। এইজন্যে উপন্যাসটির ভাষায় আগাগোড়া বুদ্ধি ও আবেগের তত্ত্ব বাঞ্ছনীয়ভাবে সমন্বিত হয়েছে, যা তাকে ঔপন্যাসিক গরিমা প্রদান করার সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত পাঠদেয়তাও প্রদান করেছে। সামাজিক সংসক্তিগুলিকে নির্জীব বস্তুর মতো করে তিনি উদ্বহন করেন নি, যেটি অধিকাংশ লেখক করে থাকেন। 'কিস্‌সা গুলামে'র গুরুত্ব এই কারণেই বেশি, যেহেতু তা এই আসক্তিসমূহকে একটা বুদ্ধিযুক্ত চ্যালেঞ্জের মতো উপস্থাপন করে এবং নিজের আবেগবিজড়িত ভাষার মাধ্যমে সেগুলিকে ভাব-শক্তির দ্বারা এমনভাবে সন্দীপিত করে তোলে যাতে সেগুলি আমাদের কাছে স্বীয় অস্তিত্বের প্রশ্ন বলে মনে হয়।

নন্দকিশোর আচার্য

প্রথম পর্ব

অজ্ঞাতবাস

হুজুরের জয় হোক

হুজুরের জয় হোক। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, দরজা খোলার জন্যে। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। শুনুন, কী হলো আপনার? শরীর ঠিক আছে তো? আপনি ঘুমিয়ে রয়েছেন, না জেগে—কিছুই বোঝা যায় না। আমি তো বাতি জ্বলছে দেখে চলে এসেছিলাম। ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যেস নেই তো আপনার? একটু আমার দিকে তাকান।...এমন তো নয় যে, আমিই ঢুকে পড়েছি আপনার ঘুমের মধ্যে? আপনি আবার ঘুমিয়ে পড়ুন স্যার, তাতে কিছু এসে যায় না আমার। আমি তো ঘুমের মধ্যেও আপনাকে যথাযথ সঙ্গদান করতে পারবো।... এত রাতে একজন উটকো লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছেন, এটুকু কৃপাই বা কে করে?... আরে! দরজা খুললো কে—আপনিই যদি না খুলে থাকেন, তবে খুললোটা কে? যাক্, ছাড়ুন, আমি কিন্তু সত্যিসত্যি জানি না কী-এমন অপরাধ করেছি আমি। সত্যি বলতে কি, এটা জানার জন্যেই আপনার শরণে এসেছি। কিন্তু আপনাকে তো দেখে মনে হচ্ছে স্যার, সত্যিসত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। এর চেয়ে শুভ আর কি হতে পারে।... এহেন দেবতাসুলভ চেহারা প্রত্যেকে পায় না... এ আমার সৌভাগ্য যে, কোনোরকম অসমঞ্জস ছাড়াই আমি আপনাকে লাগাতার দেখে যেতে পারবো। এখনও দেখছি আপনার মুখে সেই প্রমোহ বিস্ময় যথাবৎ ফুটে রয়েছেঃ 'তুমি কে? কেন এসেছো?'... বলছি হুজুর, বলছি। আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলছি। কিন্তু সব কথা বলার জন্যে একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে। আর সমস্ত কথা শোনার জন্যেও...

আপনার কথা স্যার, আলাদা। কিন্তু এর মানে তো আর এই নয় যে আপনার চৈতন্যহীনতা আর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে আমি আমার যাবতীয় অপরাধ থেকে নিজেকে একেবারে মুক্ত করে নেবো। আর, আমি তো অপরাধীই, বরং তার চেয়েও খারাপ কিছু। নইলে, আপনিই বলুন, আমার স্ত্রী হঠাৎ এভাবে আমাকে ছেড়ে চলে যায়—ঐ শয়তান পাদ্রিটা থাকা সত্ত্বেও, যে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের ব্যাপারে মিছিমিছি নাক গলিয়ে আসছিল? আরে, চুলোয় যাক সেই পাদ্রি। আপনি কখনও বিশ্বাস করতে পারেন যে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো পাদ্রি স্বয়ং সর্বশক্তিমান পোপও একজন পরিপূর্ণ নারীর কাছ থেকে তার পরিপূর্ণ

নারীত্বকে এভাবে ছিনিয়ে নিতে পারেন? আপনি যাই বলুন স্যার, আমি কিন্তু এর জন্যে ঐ ব্যাটা পাদ্রির গলায় জয়মালা পরাতে প্রস্তুত নই। সেটা ছিল ভূমিকম্প, মশাই, ভূমিকম্প। তাও একটা নয়, দুটো নয়, তিন-তিনটে ঝটকাঅলা ভূমিকম্প। সবগুলোর জন্যে কি একা সেই পাদ্রিই দায়ী? আমি নিজেই বা কোনো পাদ্রির চেয়ে কম নাকি? গত জন্মে ভগীরথী আর আমার মাঝখানেও কোনো পাদ্রি প্রকট হয়েছিল কি? আমার অবস্থা দেখুন স্যার! এই কাল-পরশুর ঘটনাগুলোকেও আমার পূর্বজন্মের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে! ভূমিকম্প আর বলবেন কাকে?... আরে মশাই, ছোটখাটো ঝড়ঝাপটা তো প্রত্যেকের জীবনে আসেই, আমি সেটা বলতে চাইছি না।...যাক্-গে...

স্ত্রীর কথা না-হয় বাদ দিলাম, কিন্তু আমার সেই বন্ধুটিকে কী বলবেন, এরকম সময়ে আমাকে একরকম ধোঁকা দিয়ে পৃথিবী ছেড়েই চলে গেল যে! আপনিই বলুন স্যার, যেতে যখন হবেই, সে জানতো, তখন আমাকে এভাবে ডেকে পাঠানোর মানে? এতগুলো বছর সম্পর্কটা যেমন ভাঙা ছিল, তেমনিই থাকতো। আর, চিঠি লেখার অভ্যেস কস্মিনকালে তার ছিল না যে, তা আমি জানি। এমন লোকও তো থাকে, থাকেই, যাদের লেখালেখি ব্যাপারটায় দারুণ ভয়। শব্দ, নিছক শব্দের সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্কে। কিন্তু কাজের বেলায় যাদেরকে একমুহূর্ত এমুড়ো-ওমুড়ো ভাবতে হয় না। আমার বন্ধুটিও কি তাদেরই দলে ছিল না?... আপনার মন বলছে না কি যে আমাকে শায়েস্তা করতেই সে ঠিক এই সময়টাকেই মরণের জন্যে বেছে নিল? স্যার, মরে তো সবাই, আগে বা পরে। মুশকিলটা হলো আমার মতো লোকেদের, যারা না মরতে পারে, না ঠিকমতো বেঁচেই থাকতে পারে। আমার বাবাও কি গেল-বছর ঠিক এই সময়ে আমার বিরুদ্ধে অবিকল এইরকমই একটা ঘুঁটি চালেন নি?... কেন, বলুন, যখন সারাজীবনের সমস্ত কচকচি ভুলে গিয়ে সত্যিসত্যি আমি আবার সম্পর্কটাকে জোড়া লাগাবার কথা ভাবছি, ঠিক তখুনি, সেই মুহূর্তটাকেই নিজের মরার জন্যে উনি বেছে নিলেন কেন? আর-একটু সময় কি দিতে পারতেন না আমাকে? আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা প্রাণঘাতী শতরঞ্চ পাতা ছিল যেন, আর আমার পরবর্তী চাল কী হতে পারে সেটা অনুমান করেই সম্ভবত, আমাকে চিরতরে ভূপাতিত করার অভীপ্সায় চেলেছিলেন শেষ চালটা।

কিন্তু, তাই যদি হয়, তবে কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ ওভাবে দৃশ্যমান হওয়ায় এমন কী দায় পড়েছিল তাঁর? হুজুর, আপনিই আমার সাক্ষী, এই ধন্দটার একটু বিহিত করুন দেখি। স্বপ্নের মধ্যেও যদি ঐ-অবস্থায় তাঁকে দেখতাম তিতিক্ষায় বিগলিত হয়ে পড়তাম দ্ব্যর্থহীনভাবে, অথচ... অথচ... স্যার, এ কী দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার বলুন তো, ঠিক ঐ বেশভূষা নিয়েই আমার সামনে আবির্ভূত হলেন তিনি—ভূমিদাসের

বেশে,—আমার সঙ্গে কথা বললেন—একতরফা—আর আমাকে সামলে ওঠার—আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ মাত্র না দিয়ে হুস্ করে গায়েব হয়ে গেলেন! আমার তো মনে হয় না উনি আর আসবেন। তাহলে আমি কাকে কি বলি? এ কি একতরফা নিষ্পত্তি নয়?... এমনিতেও আমার সঙ্গে তাঁর দ্বিরালাপের সুযোগই-বা কখন ঘটেছে। ছোটবেলার ঐ ক'টা দিন বাদে—যখন আমি এই আজকের আমি ছিলাম না।... কী আলফাল বকছি স্যার! সত্যিই কি আমি এখন অন্য কেউ? আমি আর আমার মাঝখানে এই হাঁ-মুখ ফাটল বোজানোর কেউই কি নেই?

আমার বরাতজোর দেখুন স্যার, আমার গেরস্থালি পুরোপুরি ছারখার হবার আগেই বাবা চলে গেলেন। আপনি যাই বলুন স্যার, আমি এটা মানতে রাজি নই যে তিনি সবদিক থেকে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন। আর কারো সঙ্গে না হোক, আমার সঙ্গে—আমার মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে একটা সাযুজ্য রক্ষা করে আসছিলেন এবং বীতকামী হবার ব্যাপারেও স্বাধীন ছিলেন, যেহেতু আমার ওপর তাঁর ভরসা ছিল। অন্তত এটুকু তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন যে আমি এখনও জীবনের মুখোমুখি খাড়া দাঁড়িয়ে আছি, মনিবের মতো, ভৃত্যের মতো নয়। এটাই তো আমি তাঁকে জানাতে চেয়েছিলাম, এই সান্ত্বনাই দিতে চেয়েছিলাম তাঁকে, যে, তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরিত হবে আমার মাধ্যমে এবং এমন কিছুই করবো না যার জন্যে তাঁকে পিতৃলোকে লজ্জা বা কষ্ট পেতে হবে।... আপনি আবার হাসছেন দেখছি! হুজুর, আপনার কথা তো আমি ফেলছি না। আমার ওপর তাঁর যখন এতখানি ভরসা ছিল তখন সান্ত্বনার কথা আসে কোত্থেকে—এই বলতে চাইছেন তো আপনি?... হায়, ব্যাপারটা যদি এতটাই সহজ হতো! আমার মনে যেমন তাঁর সম্পর্কে একশো একটা বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণা ছিল, ঠিক তেমনি আমাকে নিয়েও তাঁর বিভ্রান্তি ছিল না কি? বিভ্রান্তিই বা বলি কেন? আর কাছে কাছে আসার অর্থই বা কী, যে কখনো দূরত্বই দেখেনি? মানুষের সমস্ত সম্পর্কই এক-একটি সমপাতন নয় কি? এক-একটি আরোপিত সমপাতন? যাকে ঋত্-সম্পর্কে বদলানোর দায়িত্ব আপনার নিজের? অবভাসিত সম্পর্কে নয়, স্বার্জিত সম্পর্কে!

যতই প্রগল্‌ভ হোন, যতই বেপরোয়া হোন, তার মানে এই নয় যে আমার কৃতকর্মের প্রতি কোনোরকম আসক্তি তাঁর ছিল না। আপনার ওপর যার এতখানি ভরসা, তাকে ধোঁকা দেওয়া একদিক থেকে যত সহজ, অন্যদিক থেকে ততটাই হন্তারক। ঐ বিরাট আস্থাকে আপনি এমনি-এমনি ঝেঁপে দিতে পারেন না। তার দাম দিতে-দিতে আপনার সারাটা জীবন ফুরিয়ে যাবে, তবু হরদম মনে হবে ন্যায়ত আপনি সেই ভরসার যোগ্য নন। আপনার তথাকথিত স্বাধীনতার পর-পর দশবছর উৎসব উদযাপন করতে পারেন আপনি, বিশ বছরও করে ফেলুন। ফাঁসটা যখন গলায় এঁটে বসবে তখুনি ধরা পড়বে এই স্বাধীনতার আসল অর্থ। তারপরই আপনি

নিজের এই সৌভাগ্যে গদগদ হওয়া ছেড়ে দেবেন। সেই প্রথম তাদের প্রতি আপনার মনে ঈর্ষা জাগবে ক্রীতদাসের চেয়েও হীন আর নিকৃষ্ট মনে করতেন যাদেরকে। শিক্ষিত হওয়াটা, নিঃসন্দেহে, একটা বিরাট প্রাপ্তি। বিশেষত, আপনি যখন চারদিক থেকে মূর্খ-পরিবৃত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু মূর্খদের ভিড়ে বুদ্ধিমান হওয়াটা যে কতো বড়ো শাস্তি তা আপনার পক্ষে বোঝা শক্ত নয়। মূর্খদের ভালোবাসা সহজ নয়, আর তাদেরকে ঘেন্না করতে-করতে আপনি একদিন আবিষ্কার করবেন যে আপনার নিজের বুদ্ধিই ঘৃণিত হয়ে পড়েছে। আপনি তখন কী করবেন শুনি? ততদিনে ঢের দেরি হয়ে যাবে না কি? নতুন করে বুদ্ধিমান আর নতুন করে মূর্খ হওয়ার পক্ষে?... স্যার, আপনি হয়তো ভাবছেন ব্যাপারটাকে আমি অযথা ঘোরালো করে তুলছি। কিন্তু আপনার জায়গায় আমার সেই বন্ধুটি যদি থাকতো, সে অবাক হতো দেখে যে এত সহজ আর সত্যি কথা আমি বলছি কি করে! শুধু সেই কেন, আপনার জায়গায় সেই বুড়োটাই যদি থাকতেন, যিনি ছিলেন আমার বাবা, তিনিও আমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক ধরে ফেলতেন—অবশ্যি, তাঁর ক্ষেত্রে, জানি না ঠিক কোন্ ভাষায় কথা বলতে হতো আমাকে। এ-ভাষা তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষা ছিল অন্য, যাকে যথাযথ বুঝতে পারাটা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার এবং যে-ভাষার প্রতি আমি একসময় দারুণ, দারুণই ক্ষুব্ধ থেকেছি। এতদিনে ধাতস্ত হতে পেরেছি। কিন্তু এখন ধাতস্ত হয়েই বা কী করতে পারি?... তাঁর সঙ্গে এলিসের খুব-যে-একটা বনাবন্তি ছিল, তা নয়। এলিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ব্যাপ্তিই বা কতটুকু ছিল,—খুব-জোর এক-আধ সপ্তাহ সে ওখানে ছিল। কিন্তু সে, নিঃসন্দেহে আমার মনে কষ্ট দিতেই, তাঁর কথা বলতো। বলতো, 'তোমার বাবা তোমার চেয়ে বেশি জলি, আর তোমার চেয়ে অনেক বেশি স্ট্রং।' ওর কথা শুনে প্রথমটায় দারুণ ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতদিনে বুঝেছি এলিস কেন বাবাকে পছন্দ করতো। আমার নিজের কথা যদি বলতে হয়, বলবো, আমার চোখে ওরা দুজনেই একই ধরনের খুনি সাব্যস্ত হয়েছে। সম্ভবত এই একটি ব্যাপারে ওরা ছিল অভিন্ন।

...ঠিক ধরেছেন স্যার! আপনি অত্যন্ত ভালো শ্রোতা, যথেষ্ট সংবেদনশীল। ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার যদি এই হাল হয়, তাহলে জেগে উঠলে কী হবে? আমি তো আর শুধুশুধু আপনার ওপর ভরসা করিনি। এখন আমার এভাবে জবরদস্তি ঢুকে পড়াটাকে আপনি শরণই বলুন, আর বরণ বলুন, সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার, আমার ওতে কিছু এসে যায় না। আসলে, এই একটা সম্পর্কই তো বেঁচেবর্তে আছে, যেটায় সন্দেহ চলে না। যা সন্দেহের উর্দ্ধে। এই একটি সম্পর্ক, স্বার্থের ছায়া গ্রাস করে না যাকে।... কী বললেন? কোইন্সিডেন্স? আমি কিন্তু তা মনে করি না। কোইন্সিডেন্স বা যোগসূত্রতা দিয়ে বন্ধুত্ব গড়া সম্ভব, মা বাপ ভাই বোন স্ত্রী প্রেমিকা সবই কোনো-না-কোনো যোগসূত্রের ফল,... কিন্তু আপনার-আমার

সম্পর্কটা, স্যার, যোগসূত্র কিছুতেই নয়। আপনি স্বীকার করুন আর নাই করুন, এ সম্পূর্ণ অনন্য সম্পর্ক। অন্য কোনো সম্পর্কের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। সম্পর্কই যদি সব হতো, তবে কি এই কচকচি আপনাকে শুনতে হতো?... হ্যাঁ, তা, কী-যেন বলছিলাম আপনাকে!...

...আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি ঠিক আমার মায়ের মতো ছিলেন না, যিনি মিছিমিছি নিজের জেদ আঁকড়ে পড়ে থাকতেন। তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল যে প্রতিশোধ তোলার আরও নানাবিধ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর টেকনিক রয়েছে। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি তো বোকাদের কাজ। কিংবা ঐসব বুদ্ধিমানদের, যারা নিজেদেরকে নিজের মুরোদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু ঐ যে বললাম, তাঁর নিজস্ব টেকনিক ছিল—নিজের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারগুলোকে নিষ্পাদন করার জন্যে। আসলে, আমার সঙ্গে তখন তাঁর সম্পর্কটাই বা কী! সেই আমার সঙ্গে, একদিন যে ছিল তাঁর সবচেয়ে কাছের জন, তাঁর আত্মার অভিন্ন হয়ে।... আপনার হাসি পাচ্ছে মশাই? সত্যি, হাসির কথাই বটে। আমার কিন্তু এতে রাগ হচ্ছে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার মতে, তাঁর মৃত্যু-সংবাদটি যখন পেলাম, আমার তখন কী করা উচিত ছিল বলুন তো? বড়ো ছেলে হওয়ার সুবাদে তাঁর শেষকৃত্যটি আমার নিজের হাতেই সারা উচিত ছিল না কি? না মশাই, না। নাই-বা গেলাম আমি। এখন হয়তো আপনি জানতে চাইবেন, কেন, তুমি গেলে না কেন? কেন যাবো বলুন? বেঁচে থাকতেই যখন কোনো সম্পর্ক থাকেনি, তখন মরার পর ঐ ভাঁড়ামির মধ্যে না গেলেই নয়? আমার আশা-ভরসা উনি যখন ছেড়েই দিয়েছিলেন, তখন আমিই বা নিজের তরফ থেকে একটা মিথ্যায় শরীক হই কি করে? কিন্তু...তাঁর তো মনে-মনে আমার ওপর বিশ্বাস ছিলই। আমার হাতে মুখাগ্নি-মাত্র ঘটলে তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যাপারটা যদি সহজ হয়ে যায় তাতে আমার কী বিগড়ে যেত? আর আমি যা ভেবেছি, সেটাই যদি ঠিক, সে-ক্ষেত্রে আক্ষেপের কী আছে? তাঁকে আগুন দিইনি বলে? নাকি বেঁচে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে পারিনি বলে?

যাই হোক, সেইদিন থেকে অদ্যাবধি, আন্তর্যামীই জানেন, কী এক অন্তর্দাহে জ্বলে-পুড়ে মরেছি আমি! ভস্মের আগুনে। আমার স্ত্রী তখন আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট রাখেনি। আমার যন্ত্রণা বোঝার সামান্যতম চেষ্টাও সে করেনি, শুধু তাই নয়, উপরন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আরেকটা আপদ সে টেনে আনে, যেন ঐ টুকুতে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যদি হঠাৎ-করে ওই পাগলামি ঢুকে না পড়তো ওর মাথায়, তাহলে হয়তো আমার মাথাটা এত খারাপ হতো না আর ধীরে-ধীরে তা থেকে নিস্তারও পেয়ে যেতাম হয়তো। আমার মতো লোকের এসব ঝামেলার মধ্যে পড়ার ফুরসৎই-বা কোথায়? এটা স্যার অমূলক ছিল না

যে আমি গল্প-কাহিনী রচনার বদলে নৃতাত্ত্বিক হওয়াই পছন্দ করেছিলাম। নিজের দুর্বলচিত্ততার ওপর গর্ববোধ করিনি কখনও...। আপনি দেখছি আবার হাসতে শুরু করেছেন,... ব্যাস, আপনার এই ব্যাপারটাই আমাকে গলিয়ে দেয়। আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। তবে বোঝাই কি করে যে লাগামটা হাত থেকে খসলো কি করে আর নিজের অজান্তেই কিভাবে গিয়ে পড়লাম ঐ খালে। ব্যাস, এটুকু মাত্র বলতে পারি, এলিস যেন তক্কে-তক্কেই ছিল, আমার দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো সে। ওর জন্যেই বন্ধুটির সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করতে হয়েছিল আমাকে। কোনো ব্যাপারেই তো আমাদের মতের মিল ছিল না। ব্যাস্, তারপর থেকে তো আমার চাবিকাঠি ওর হাতেই চলে গিয়েছিল। কোন্‌খান থেকে আঘাত হেনে আমাকে কাবু করা যাবে, সেটা সে ভালভাবেই জানতো। এইজন্যেই তো ঝক্কি শুরু করলো এমন সময়ে যখন নিজেই অর্ধমৃত।... স্যার, এখন তো সব শেষ, তবু আপনাকে জিজ্ঞেস করি, এ সবের পেছনে এলিসের ভূমিকাটি কি সত্যিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যতটা আমি ভাবছি? এমন তো নয় যে এলিসও ঐ বিরাট ষড়যন্ত্রে অন্যতম অংশভাক ছিল যার সূচনা ঘটিয়েছিলেন আমার বাবা আর পূর্ণাহূতি দিয়েছিল আমার সেই বন্ধুটি?

...কী অদ্ভুত নিস্তব্ধতা! আমার ধারণা নিজের বাড়িটাকে কখনও ভুতুড়ে বলে মনে হয়নি আপনার। আমারও মনে হয় না, অবশ্যি তখন মনে হতো, বেশ সরগরম ছিল যখন।... এ এক অদ্ভুত ক্ষণভঙ্গুর মুহূর্ত! কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই! কিন্তু সূর্যটাও নিজের অধিষ্ঠান কত সহজে চেনে! আর কিছুক্ষণ পর সে ঠিক ঐ জায়গাটা থেকেই ফুঁড়ে বের হবে। তারাগুলোও নিজেদের জায়গা কী অবলীলায় চেনে! ওরাও এখন বিদায়ের অপেক্ষায়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন হয়তো, সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে ওঠে।... আমি খুব ছোটো বয়েস থেকে এটা লক্ষ্য করে আসছি...। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোটবেলায় খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস ছিল আমার। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে অন্ধকারের এই ঘনীভূত হয়ে-ওঠার ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতাম। বয়ঃপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত এ ছিল আমার নিত্যদিনের অভ্যেস। তারপর আপনাআপনি অভ্যেসটা কেটে যায়---হস্টেলে ভরতি হওয়ার পর-পরই। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জনৈক ফরাসী লেখক ভারতের 'মর্নিং উইসডমে'র উল্লেখ করেছিলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক এই শব্দ দুটিকেই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। জনৈক জার্মান কবির একটা কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তিনি আবার আমাদের মুল্লুকটাকে একটা 'নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমার এই গ্রন্থানুরাগের জন্যে ক্ষমা করবেন স্যার। একজন অধ্যাপককে কাহাঁতক এ-রোগ থেকে রক্ষা করবেন? কিন্তু আপনিও তো স্যার, পেটের দায়ে একটা কিছু তো করেনই। এবার আপনার নিজের কথা

একটু-আধটু বলুন। আপনি কে মশাই?... এর আগে তো কখনও দেখিনি আপনাকে! তবু, কেন জানি না, যাদের সঙ্গে আমি দিনরাত ওঠাবসা করি—যারা আমাকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রাখে—তাদের চেয়েও—আপনাকে আমি বেশি চিনি বলে মনে হচ্ছে। তারা যে এক একটা মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই, ভালো-মন্দ, চটপটে-অলস, প্রেমিক-বিদ্রোহী নানা ধরনের মানুষ।... কিন্তু একুনে ওরা মানুষই, তার বেশি কিছু নয়। তাদের কাছেও আমার অপদার্থতার সাওয়াই নেই। দেখুন স্যার, আমাকে ভুল বুঝবেন না—তাদেরকে আমি দোষ দিই না। গণ্ডগোল যা, আমার নিজের মধ্যেই রয়েছে, এটা আশা করি এতক্ষণ আপনি বুঝে ফেলেছেন। আমি পঁয়তাল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। ক'দিন আগে আমার এক বন্ধু চলে গেল। তার সঙ্গে আমার অনেক-কিছুই চলে গেল না কি? সেগুলো আমাকে ফেরৎ দেবে কে?... প্রতিদিন, প্রত্যেকটি দিন এক একটা ভারজ মেয়াদ বলে মনে হয়। আগামীকাল সকালে হয়তো আমিই থাকবো না। সুস্থ-সবল মানুষ হুট্ করে চলে যায় কেমন! একজন আপনার চেয়ে প্রাণোচ্ছল আর আপনার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি উৎকৃষ্ট মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, অথচ আপনি মরবার নাম পর্যন্ত করছেন না!... কেন, বলুন কেন? স্যার মৃত্যু চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে, জানি। কিন্তু একজন খাঁটি বন্ধুর মৃত্যুকে---একটা অকারণ, বলগাহীন মৃত্যুকে—নিছক খেলো ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আপনি তা থেকে সহজে অব্যাহতি পেতে পারেন না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমাদের ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মৃত্যু পূর্ণবিরাম তো নয়ই, এ অর্দ্ধবিরামের সামর্থ্যও রাখে না।...আপনি কি স্যার মনে করেন না যে মানুষ যেহেতু মৃত্যুকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করে না, সুতরাং জীবনটাকেও কখনও সিরিয়াসলি নিতে পারে না? আরে, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখেই যারা আতঙ্কিত হয় না, তারা কিসে আতঙ্কিত হবে! তাদের আর পরোয়া কিসের? এইজন্যেই তো কোনো জিনিসের প্রতি যত্ন নিতে শিখিনি আমি; শুধু তাই নয়, যে-কাজটা যত জরুরী, তাকে ততই এড়িয়ে চলি।...আমি স্যাব ভুল বলছি কিছু? ভুলচুক হলে আপনি টোকা মারবেন কিন্তু!

সত্যি কি আমি আবার প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি?... আমার তো মনে হয় না। আপনার সঙ্গে যা চুক্তি হয়েছিল, আমি সেটুকু পালন করছি মাত্র। গোড়াতেই কি আমি জানিয়ে দিই নি যে আমি সম্পূর্ণ বেকার আর আপনার কাছে এসেছি কাজের সন্ধানে? ঐ চুক্তিনামা আপনি ভুলে গেলেন? আপনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা ভাবছেন নাকি? আপনার প্রতি এই দাতব্য সেবা আমাকে করতেই হবে। আর সেটা আপনাকে নিতেও হবে। কমপক্ষে দুটো হপ্তা তো গেলই আপনার। আমি কী করতে পারি স্যার, আমার বিড়ম্বনা বোঝবার চেষ্টা করুন। পঁয়তাল্লিশ বছর

বয়েসটা ভীষণ সাংঘাতিক। পঁয়তাল্লিশে মানুষ হঠাৎ টেসিয়ে যায়, আর যারা মরতে পারে না, রিক্ত স্ব-গৃহে প্রেতের মতো বাস করে তারা।...

আপনি প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু স্যার, আমাদের গোটা জীবনটাই কি মূল বিষয়বস্তু থেকে এক নিরবচ্ছিন্ন পলায়নের ইতিবৃত্ত নয়? ঐ মূল বিষয়বস্তুটি যে ঠিক কী, তাকে না আপনি জানেন, না আমি। কিন্তু এটা তো আমরা লক্ষ্য করতেই পারি যে, যেটুকু জীবন আমরা যাপন করে এসেছি, তা এই মূল বিষয়বস্তু থেকে নিরন্তর বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ার এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খলা বই কিছু নয়। না স্যার, না, আমি এটা মানতে প্রস্তুত নই যে জীবন সম্পর্কে আমার এই উপলব্ধি আমার সেই বন্ধুটির হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর জন্মেছে।...হাঁ, খবরটা যেদিন পেলাম, সেদিনের রাতটা আমার কাছে অসাধারণ অবশ্যই ছিল কেন না সেদিনই প্রথম জানতে পারি রাত্রি-জাগরণ ব্যাপারটা কী আর যামের পর যাম অনিষুপ্ত থেকে নিজেরই উন্নিদ্র চোখে অরুণোদয় দেখা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা!

আর্থার ঃ এক কিংবদন্তী

বিতর্কের মাঝখানে আপনাকে একলা ফেলে উঠে পড়েছিলাম বলে নিদারুণ লজ্জিত। আমার আরও দু-দিনের অনুপস্থিতি মঞ্জুর করতে হবে আপনাকে। জোসেফের কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই আবার হাজির হবো আপনার খিদমতে। আপনি চাইলে দেখা করতে পারেন ওর সঙ্গে, লোকটা খারাপ নয়, কাজের লোকও নয় যদি-বা। ও আমার সহকর্মী, একই বিভাগে রয়েছি। আমাদের মধ্যে রেষারেষিও কম নয়। প্রফেশন্যাল রাইভাল বলতে যা বোঝায় আর-কি। অন্যথায়, আর কেউ কি ঘুণাক্ষরেও টের পেতে পারতো যে আমি এখানে ঘাপচি মেরে বসে আছি! আরও দিন-পনেরো ছুটি হাতে, গোটা কলোনি ফাঁকা। তবু, কী কুক্ষণে জেনে ফেলেছে! আমি তো একরকম ধরেই নিয়েছিলাম যে সত্যিসত্যিই পাতালে আছি, হাজার চেষ্টা করেও কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে। অথচ জোসেফ কিম্পোট্‌টা, মাথায় বাজ পড়ুক ঐ গোয়েন্দা-প্রবরের, আমাকে খুঁড়ে বার করলোই। সান্ত্বনা শুধু এই যে, দিন-তিনেকের বেশি কাটাবে না এখানে। পাঁঠাটা এসেছে কাশ্মীর থেকে, আর এখন গোয়া চললো। ব্যস, তিন দিন সবুর করুন। অবশ্য, মাঝেমাঝে আমি নক করে যাবো আপনাকে।...

সাতসকালে ওর হাঁকাহাঁকি শুনে কানে ভুল শুনছি বলে মনে হয়েছিল প্রথমটায়। ঐ সময় আপনার সঙ্গেই মশগুল ছিলাম কিনা। ঐ হট্টগোল ছিন্ন করে দিল সমস্ত সংযোগ। ও প্রথমে নিচে দাঁড়িয়েই আমার নাম ধরে চেঁচায়। তারপর ওপরে উঠে

এসে বন্ধ কপাটের সামনে চিৎকার জুড়ে দেয়। আপনিই বলুন, আধ কিলো তালা আর দু-দুটো বন্ধ জানালাও যখন বোকা বানাতে পারেনি ওকে, তখন আমি ওকে এড়াই কি করে?

'তোমাকে তো পাক্কা মমির মতো দেখাচ্ছে হে!' আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ও বললো, 'তোমার বাড়িটাও পিরামিডের চেয়ে কম নয় দেখছি।' আমার ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগে, লাগারই কথা। কিন্তু জোসেফ কিস্পোট্টার সামনে বেশিক্ষণ নিরপেক্ষ থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। ও আপনার মুখ খুলিয়েই ছাড়বে। ঐ সময় না-হয় কোনো উপায়ে ছাড়ান পেয়ে যাই, কিন্তু বিকেলের দিকে ও সস্ত্রীক এসে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম যে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়েছি এক দীর্ঘ বিতর্কে। নিজেকে মুক্ত করতে গলগঘর্ম হয়ে পড়ি। বাড়ি ফিরেছি বটে, কিন্তু স্বাভাবিক কি হতে পেরেছি? ওর ঐ রসিকতা এখনও কানে লেগে রয়েছে। মনে হয়, খৃষ্টানদের সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। ওদের হাত থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই। ওরা আমাকে পাতাল থেকে খুঁড়ে বার করতে পারে। কোন্ অলৌকিক উপায়ে, খোদায় মালুম।...মার্জনা চাইছি স্যার, আজ একটু বেশিই পেটে পড়েছে। আপনি হয়তো জানেন না, গত দেড় মাসে এক ফোঁটা মদও আমি খাইনি। আমি হলাম তাদের দলে, এক পেগ পেটে পড়লেই যারা কাৎ হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় পেগের দরকার হয় না। আসলে আমি আদৌ মদখোর নই। কিন্তু জোসেফের মতো লোক যদি ড্রিঙ্ক সার্ভ করে আর মার্গারেটের মতো মহিলা যদি খাবার সার্ভ করে, বুঝতেই পারছেন, কেসটা অন্যরকম হতে বাধ্য। আর, বিশেষত, অফার করনেওয়ালা যদি আপনার কোনো গোপন ক্ষতে হাত দিয়ে ফেলে, শুধু হাত কেন, যদি পা দিয়ে ফেলে, তবে তো আর কথাই নেই।

বেচারি জোসেফের আর দোষ কী বলুন! আর্থার নেই, এই খবরটা সে যখন দিচ্ছে, সে কি আর জানে যে একটা বাসি খবর দিচ্ছে? অর্থবহতার দিক থেকেও যে খবরটা ওর কাছে একরকম, আর আমার কাছে আরেকরকম, সেটাই বা ও জানবে কেমন করে! সত্যি, কতো গুটিয়ে পড়েছে পৃথিবী! এক প্রান্তের মানুষ আরেক প্রান্তে এসে কী অদ্ভুত অকল্পনীয় ভাবে মিশে যায়! আসলে, সত্য যা, তা তো কল্পনারও উর্দ্ধে!

'...ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ্ এনাফ...' আর্থার প্রায়ই বলতো, আমাকে। একই কলেজে পড়তাম আমরা। সে-যেন এক জন্ম আগের ব্যাপার, যদিও মাত্র দশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন সবে চাকরি ধরেছি। আর্থার আগেই ঢুকেছিল। বড়োজোর এক বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম আমরা। ও ছিল ইংরেজির অধ্যাপক। স্টাডি লিভ নিয়ে বিলেত গিয়েছিল ডি এইচ লরেন্সের ওপর রিসার্চ করতে—

ডক্টরেট তো জুটলই না, তিন-তিনটে বছর পণ্ড করে ফিরে এলো এক মেমকে সঙ্গে নিয়ে। বেশ-কিছু মুখরোচক গল্প চাউর হয়েছিল ওদেরকে নিয়ে। স্টাফ রুমে আর্থারের অনুপস্থিতিতে চলতো সেইসব গল্প। এই যেমন, বাড়িতে সারাক্ষণ বউয়ের ধ্যাতানি খেতে হয় বলে আর্থার কলেজ থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরে।... আর্থার নিজের চাকরি আর বেতন সম্পর্কে ভুজংভাজং দিয়ে রেখেছিল, এখন ফাঁস হয়ে পড়ায় বউ বাড়ি ছাড়ার হুমকি দিয়েছে। ...বউটি ছিল নার্স, মাইনেপত্তর ভালোই পেতো, আর্থার ওকে তেমনি একটা চাকরি জুটিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।...ওর বউ সকাল-সন্ধে ওকে 'ইউ লায়ার' 'ইউ স্কাউন্ড্রেল' বলে গালাগাল দেয়।...হাতাহাতি আর বাসন ছোঁড়াছুঁড়ি হবার উপক্রম হয়, দফায়-দফায় ওদের চিৎকার শুনতে পায় লোকে।...বউটি নাকি পাড়ায় এটা-ওটা চেয়ে বেড়ায়...। ওদের মধ্যে নাকি রফা হয়েছে যে একজন টাকা-পয়সা ধার নেবে, আর একজন আটা, চিনি, দুধ এইসব। ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি আর্থারের প্রতিবেশী ছিলাম না, সুতরাং এইসব জনশ্রুতির পেছনে ধাওয়া করে কোনো উপসংহারে পৌঁছানোর তাগিদও আমার ছিল না। হ্যাঁ, একটা প্রমাণ আমিও পেয়েছিলাম অবশ্য, সেটা হলো, ওর ধার করার প্রবৃত্তি। আমার পুরনো ডায়েরির কোথাও হয়তো টাকার একটা অঙ্ক আজও নথিবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, যেটা আর্থার আমার কাছ থেকে নিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। স্পষ্ট মনে আছে, আলাপ হওয়ার খানিক পরেই ওর বউ একান্তে ডেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল এই ব্যাপারে। আমার মাথা নাড়ানোয় ওর বিশ্বাস হয়নি।...'আসলে কি জানো কুন্দন, আমার স্বামী কয়েকটা ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ।' —ওর গলা ধরে এসেছিল, 'টাকা-পয়সার অভাব যে রয়েছে, তা নয়। স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে শুধু। কতোবার বুঝিয়েছি, দ্যাখো আর্থার, এসব কোরো না। এতে বদনাম হয়।...কিন্তু, দুটো-একটা টাকার জন্যে লোকের কাছে হাত পেতে কি যে মজা পায়! তোমাকে আর কী বলি, ওর এই অদ্ভুত অভ্যেসের জন্যে আমাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়। প্রত্যেকবার ও দিব্যি খায় আর কখনও চাইবো না, আর প্রত্যেক বারই ভুলে যায়। নিজের মুখেই স্বীকার করে যে অমুকের কাছ থেকে আজ দু-টাকা ধার করেছি। ব্যস, এই শেষ। আর কখনও হবে না, দেখো। কী বলবো তোমাকে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় আমার। প্রায়দিনই আমি গিয়ে লোকের দেনা শোধ করে আসি, আর লোকে মজা পায়। লোকের আর কী, বিনি পয়সার তামাশা চাই তাদের। কিন্তু আমার কথাটা ভাবো দেখিনি, আর্থারের এই ছেলেমানুষীর কতো গুণ চড়া দাম দিতে হয় আমাকে!'...

গ্রীটার চোখদুটো এই অবস্থায় প্রায়ই ছলছল করে উঠতো। যতক্ষণ কথা বলতো, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো আমার মুখের দিকে। তারপর একসময় হঠাৎ সচকিত

হয়ে পালিয়ে যেতো ভেতরে। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতো একমুখ সলজ্জ হাসি নিয়ে।... আর্থারের বার কয়েক পীড়াপীড়ির পর প্রথম যেদিন ওর বাড়ি যাই, সেদিন সত্যিসত্যি ওদের দুজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি চলছিল। আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসানোর পরেও ঝগড়ায় ছেদ পড়েনি। ঝগড়ার বিষয়বস্তুটা আজ আর আমার মনে নেই বটে, কিন্তু দুজনের হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গি, গলার ওঠনামা, মায় সেই ঘরটা, যেখানে ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল—সব অবিকল সেইভাবে চোখের সামনে ফুটে রয়েছে। অবাক হচ্ছিলাম এই দেখে যে আর্থার বেশ ভালো মুডেই ওর বউয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল, আর সেই আর্থারই ভেতরে ঢুকে একই টোনে ঝগড়া শুরু করে দিল—আর দুজনে নিজেদের মধ্যে এমন মশগুল হয়ে পড়লো, যেন আমি ওখানে বসে নেই, আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। দাম্পত্যের এহেন ক্লোজআপ আমি আগে কখনও দেখিনি, নাটকের মহড়া চলছে যেন! মিনিট পাঁচেক ধরে ঐ চললো। তারপর আমাকে সালিশ মেনে দুজনে দু'পাশে বসে আমার এক-একটা হাত ধরে স্ব-স্ব পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করলো। একজন থামে, তো আরেকজন শুরু করে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা হয় আমার। এমনিতে আমি তখন একটু বেশিই লাজুক ছিলাম, বয়েসও ছিল কম, ওর বউয়ের বলার ভঙ্গিটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আমি সেইসময় নিজের সামাজিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় ব্যস্ত, ভেতরে ভেতরে যতই নড়বড়ে হই না কেন, বাইরে থেকে আমাকে বেশ কঠোর মনে হতো। আর্থার আমাকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছিল। সুতরাং, ওর প্ররোচনায় আমি একটু উদ্ধত হয়ে উঠি এবং মধ্যস্থতার লোভ সংবরণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ফয়সালাই শুনিয়ে দিই—'আর্থার, আমার পক্ষে বোধহয় তোমার তরফদারি করা সম্ভব হবে না। তোমার পক্ষে তেমন জোর নেই। আমার তো মনে হয় গ্রীটাই ঠিক।'... ব্যস্, তারপর আর কী, অন্য এক নাটক শুরু হয়ে গেল। 'ইউ স্কাউড্রেল!' বলে চিৎকার করে, শূন্যে মুষ্টি ঘুরিয়ে আততায়ীর মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আর্থার, এবং অন্যদিকে শ্রীমতী আর্থার, অর্থাৎ গ্রীটা, হাততালি সহ 'হি ইজ এ ডার্লিং, হি ইজ এ ডার্লিং' গেয়ে উঠলো আর নাচানাচি শুরু করে দিল। সে এক বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড! 'ডার্লিং' শব্দটায় আমার চোখেমুখে লজ্জা ফুটে উঠেছিল নিশ্চয়ই, কেননা পরক্ষণে আর্থার যখন গ্রীটাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে অন্ধের মতো চুমো খেতে শুরু করলো, তখন গ্রীটা আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলো, 'আরে, ছাড়ো-ছাড়ো। দ্যাখো, আমাদের প্রিয় অতিথির কী নাকানিচোবানি অবস্থা! ও হয়তো ভাবছে এ কোন্ পাগলাখানায় এসে পড়লাম রে বাবা!'

'না-না, তেমন কিছু না।' আমি নিজের গয়ংগচ্ছভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। আর তাই দেখে দুজনে হেসে লুটোপুটি খায়। হাসতে-হাসতে আমার ওপরেই গড়িয়ে পড়লো। আমি তো অবাক, এতো হাসির কী হলো রে বাবা!

'গ্রীটা, কাল যে নতুন কেকটা বানালে, ওটা তোমার বন্ধুকে দাও। খেয়ে ভুলতে পারবে না কোনদিন।' আর্থার বললো।

'কেক কাকে বলছো? কোথায় কেক? স্বপ্ন দেখছো না তো?' গ্রীটা খিলখিল করে হেসে উঠলো। পরক্ষণে আমার কানের কাছে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, 'আর্থার মোটেই কেক পছন্দ করে না। বিস্কুট বানিয়েছি, খাবে?'

জলযোগের পর ফিরে আসছি, গ্রীটা কিছুটা এলো আমার সঙ্গে। হাঁটতে-হাঁটতে বললো, 'তোমার জন্যে এখানে অবারিত দ্বার, চলে এসো যখন-তখন। তুমি তো একা থাকো, বোর হয়ে পড়ো নিশ্চয়ই। আর্থার তো সব সময় তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এতো প্রশংসা অন্য কারও করে না।...কিন্তু...' একটু থেমে ও বললো, 'কিন্তু সকালের দিকে এসো না। বিকেলের দিকে এলে ভালো হয়।'

একটু অবাক হই। 'আমি...আমাকে আর্থার সকাল-সকাল আসার কথাই তো বলেছিল!'

'আরে, ও একটা গাধা। ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই। কিন্তু তুমি তো সমঝদার। কিছু মনে করলে না তো?'

'না-না, এতে মনে করার কি আছে?'—আমি বলি। আমার কেন-যেন মনে হলো, গ্রীটার কাছে আমি একটা হাস্যকর প্রাণী বৈ আর কিছু নয়। সপ্তাহ খানেক নিজেকে সামলে রাখি। রোজ বিকেল হলেই আর্থারের বাড়ির জন্যে মনটা ছুকছুক করতো। কিন্তু তবু ও-পথ মাড়াই না। তারপর এক-সন্ধ্যায় ওরা নিজেরাই আমার বাসায় এলো, একরাশ গালি বর্ষণ করতে-করতে আমাকে ঘষটে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। তারপর থেকে সম্ভবতঃ একটা সন্ধ্যাও আমাকে একা কাটাতে হয়নি। আসলে ঐ দিনগুলোতে এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি কাজ করতো আমার মধ্যে। এক দিকে আমার ভেতরে ছিল আকাশের চাঁদ পেড়ে আনবার ক্ষমতা, আর অন্যদিকে সেই শম্বুকপ্রায় স্পর্শকাতরতা আর নিরাপত্তাবোধের অভাব আমি অনুভব করতাম অনুক্ষণ। যেন, যে-কেউ সহজেই কুচলে ফেলতে পারে আমাকে। যা দেখলে ঘেন্না জাগে, ছুঁতে ঘেন্না হয়।—এই দুই মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমার অবস্থাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ত্রিশঙ্কুর মতো। এহেন অবস্থায় গ্রীটা আর আর্থারের সন্নিধি আমাকে মহাপ্রস্থানের পথ বাৎলে দেয়।

নিজের আত্মার গঠন সম্পর্কে এতদিন আমার একটু-আধটু ধারণা হয়েছে। আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন মানুষের আত্মবিশ্বাসের আসল উৎস কী? আমার বাবা প্রায়ই বলতেন, 'মানুষকে নিজের মুরোদ বুঝে চলা উচিত।' এর অর্থ কী? নিজের মুরোদ কতোখানি তা আমরা বুঝবো কেমন করে? আপনিই বলুন স্যার। আমার মুরোদ কতখানি সেটা সব সময় অন্যের কাছ থেকেই জানতে পারি না কি আমি? আর সেই অন্যজন তো আমার আত্মা নয়, আমার নিজের কেউ নয়। হওয়া সম্ভবও

নয়। আমার আত্মার সঙ্গে অন্যের কী সম্পর্ক? কতো ভয়ংকর কথা দেখুন! আমার বাবা ছিলেন পাক্কা গান্ধীবাদী। একটা ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে আমার। মনে পড়লেই, বৃশ্চিকের হুল বেঁধে বুকে। ঘটনাটা আজও ভুলতে পারিনি। ঐ সময় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ নিয়ে আন্দোলন চলছিল, আর এক ধর্মনেতা, কী-যেন নাম, করপাত্রী—? হ্যাঁ, করপাত্রী বলেছিলেন, 'হরিজনরা মন্দিরে ঢুকে কী করবে? শাস্ত্রে আছে, একজন উঁচুবর্ণের মানুষ গর্ভগৃহে দেবতার দর্শন লাভ করে যে-পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় করে, একজন শূদ্র বাইরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের চূড়োমাত্র দর্শন করে সেই সমপরিমাণ পুণ্য লাভ করতে পারে। গান্ধীজী কি এটুকুও জানেন না? তবে এই অবান্তর জেদ কেন ওঁর?'

কথাটা শুনে, স্যার, আমার বিশুদ্ধ গান্ধীপন্থী বাপ কী বললেন জানেন? শুনে তো আমি থ। বললেন, 'এ চিন্তাধারার ব্যাপার। করপাত্রী মশাই নিজের ক্ষেত্রে ঠিক।' তার মানে? গান্ধীও ঠিক, আবার করপাত্রী মশায়ও ঠিক! তবে বেঠিক কে? আমার দাদু পুরনো দিনের এম এল সি—জেলার হরিজন-নেতা। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর একেবারেই পটে না। বাবা নিজে তো কখনও সেখানে যেতেন না, আমাদের যাওয়াও পছন্দ করতেন না। একদিকে এমন জেদ, এমন আত্মাভিমান যে ছেলেরা না খেয়ে মরে মরুক, কিন্তু মামাবাড়ি গিয়ে খেতে পারবে না। আর অন্যদিকে এই একগুঁয়েমিপনা, যে, গান্ধীজীও ঠিক আবার করপাত্রীজীও ঠিক। আর সেই 'মানুষকে নিজের মুরোদ বুঝে চলা উচিত।'—সেই মুরোদ, যা আপনার জন্মের আগে থেকেই নির্দ্ধারিত, নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন তাঁরা যাঁরা আপনাকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না। হুজুর, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, ইসলামের দাক্ষিণ্যে যেমন দশ কোটি মুসলমান এ-দেশে গিজগিজ করছে, তেমনি, খৃষ্টধর্মের দোয়ায় দশ কোটি মানুষ খৃষ্টান ব'নে গেলেই বা কী এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত? শূদ্র হয়ে বেঁচে থাকার এই গঞ্জনা তো আর ভোগ করতে হতো না। নিচুবর্ণের সমস্ত লোক এক ঝট্‌কায় খৃষ্টান বলে যেত যদি, আজকের এই তামাশা দেখতে হতো কি? হরিজনদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার, বলাৎকার আর লুঠতরাজের তামাশা। সরাসরি তিনটে ভাগ থাকতো—হিন্দু, মুসলমান আর খৃষ্টান। এই তরাই-জঙ্গলও থাকতো না। এখন জঙ্গলই বা কোথায়? সব বেমালুম দঙ্গল, মানে আখাড়ায় পরিণত। এক-একটা অপমানকর, অর্থহীন ও কর্দমাক্ত আখাড়া। স্যার, এই হলো মুরোদ বুঝে চলা, বুঝেছেন? আমি সজোরে চিৎকার করে বলতে চাই, এতো জোরে যাতে স্বর্গ বা নরক যেখানেই বসে থাকুন আমার বাবা, তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছতে পারে এই চিৎকার, বলতে চাই—চুলোয় যাক সমস্ত, চুলোয় যাক এই দেশ।...আরে, দেশটাকে চুলোয় দিয়েই তো যা করবার আমরা করেছি!... স্যার, আপনি হয়তো ভাবছেন, একটু বেশিই নেশা চড়েছে আমার? জানেন তো স্যার,

দেড় মাসে একফোঁটাও চোখে দেখেনি, জোসেফ এসে আমাকে ওর বাসায় নিয়ে গেল বলেই...

জানি না, কতটা পড়েছে পেটে! জোসেফ জয়পুর হয়ে এখানে এসেছে কিনা। ওখানকার স্পেশাল মাল নিয়ে এসেছে সঙ্গে।—কী-যেন নাম... কেশর কস্তুরী! শুনেছি, রাজ-ঘরানার খাস আবিষ্কার। বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জোগাড় করতে। বলেছিল, ভদকার চেয়ে এক কাঠি ওপরে। দেখছি, মিথ্যে বলেনি। সত্যি, এ না কেশর, না কস্তুরী! শুদ্ধু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই! কোথায় কস্তুরী আর কোথায়-বা কেশর! সেটা শুধু কথার কথা। আজ আরেকটু হলেই ওদের সামনে আমার প্রেস্টিজ পাংচার হয়েছিল আর কি!... মার্গারেট মানা করেছিল বেশ কয়েকবার...কিন্তু জোসেফ! বেচারি জোসেফ!... ওকেও আস্ত-একখানা নাটক দেখতে হলো। আর্থারের প্রসঙ্গ উঠতেই, ভকভক করে বমি করে ফেলেছিলাম সব। নেশাটা সত্যিসত্যিই একটু বেশি ধরেছিল। যদিও এখন আমি সবকিছু মনে করতে পারছি।...টেপ হয়ে ভেতরে বেজে চলেছে সমস্ত।...স্যার, নেশায় একদিকে যেমন মনের ঢাকনি সরে যায়, আবার আলফাল বকারও একটা আড়াল মেলে—আমরা যা মনের একেবারে তলানি থেকে বলতে চাই অথচ বলতে পারি না। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা হারামি, সবাই উল্টোপাল্টা বলতে চাই, কিন্তু ঘুরে বেড়াই ঢাকনিটা এঁটে। এখন আমি জোসেফকে মুখ দেখাবো কেমন করে? মার্গারেটের মুখোমুখি দাঁড়াবো কি করে?...নেশার ঘোরে ওকে আমার গ্রীটা বলে মনে হয়েছিল, ছি-ছি! কী-সব বলে ফেলেছি ওকে!... হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক মনে করতে পারছি।...দু-একবার ওকে গ্রীটা বলে ডেকেও উঠেছিলাম। ছি-ছি, কী ভেবেছে ও। মার্গারেট! আমি জোসেফের জন্যে নয়, তোমার জন্যেই বলতে চাইছিলাম—তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই মেলে কখন? তুমি গ্রীটা নও, যে আমাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতো—কেশরের মতো।...এলিসের মতোও নও, যে আমাকে অতৃপ্ত-তৃষিত রাখতো অনুক্ষণ—কস্তুরীর মতো। মার্গারেট, তুমি শুধু তুমিই। নিজস্ব পৃথিবী রয়েছে তোমার, যেখানে কাউকে কোনোদিন প্রবেশ করতে দেবে না বলে পণ করে বসে আছো, কাউকে না—তোমার জোসেফকেও না?... তীব্র নেশাচ্ছন্ন অবস্থাতেও তোমাকে দেখেছি, নিজের বদান্যতা তুমি ঢাকতে পারো নি মার্গারেট। এবং এটাও টের পেয়েছি যে কারও ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ তোমার নেই। এরকম মেয়েমানুষের সামনে কার না মন চায় মার্গারেট! এমন নারী, যে শান্তি দেয়!... তুমি হয়তো নিজেই জানো না মার্গারেট যে এরকম মহিলা আজকালকার দিনে কতো দুর্লভ!...

আর জোসেফ! প্রিয় জোসেফ! আমাকে যে নিজের হাতে সামলে-সুমলে আমার বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেলে তুমি, খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেলে—এমন গতিক আসেই বা কেন বন্ধু? আমাকে ঐ অবস্থায় এখানে পৌঁছে না দিয়ে নিজের

ড্রইংরুমের এক কোণে পড়ে থাকতে দিতে যদি, কী এমন স্ক্যাণ্ডেল হতো বলো তো?... আমি তোমার পুরনো সহকর্মী আর প্রতিবেশী নই কি? আমরা একসঙ্গে একাধিকবার আদিবাসী-এলাকায় ঘুরিনি? এক রাত্তির. মাত্র এক রাত্তির তোমার বাড়িতে পড়ে থাকলে কী-এমন ক্ষতি হতো তোমার. জোসেফ? আমি খুব ভালো করেই চিনি নিজেকে, প্রিয়. তুমি যতটা ভাবছো. ততটা ধূর্ত আমি কোনো কালেই ছিলাম না. এখনও নই। তুমি শালা কম সেয়ানা নও. নিজে টানবে না, অন্যকে গলা অব্দি গিলিয়ে দেবে। এতেই মজা পাও তুমি. তাই না? তোমাকেও আমি ভালো করে চিনি জোসেফ. তোমার সম্পর্কে মার্গারেটের ধারণা ভুল হলেও হতে পারে, সে তোমার বউ কিনা. কিন্তু আমার মনে কোনো ভ্রম আগেও ছিল না. এখনও নেই। তুমি কতদূর চিন্তা করতে পারো. তা আমার অজানা নয়। আর, তোমার মনের থই-ও পেয়ে গেছি আমি : তোমার মন আর মস্তিষ্ক দুটোই একরকম। জোসেফ, তুমি যে কনজিসটেন্সির বুলি কপচে বেড়াও, সেটা অমূলক নয়। তুমি নিঃসন্দেহে কনসিসটেন্ট—বুঝেছো মিস্টার কিস্পোটটা? তুমি এতটা কনসিসটেণ্ট. এমন অবিচল. যে, কখনও গচ্চা খেতে পারো না. কখনও কোনো ব্যাপারে সামান্য অবাক হওয়াও তোমার পক্ষে বেমানান। অবশ্যি এটা ভেবো না যে আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে, আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বেমালুম কেটে পড়বে তুমি আর আমি বেহুঁশ পড়ে থাকবো। তুমি যে আমাকে অত বকবক করিয়ে মেরেছো. ঐ কচকচানি মনে আছে তোমার? আমি আমার প্রতিটি বাক্যের সাক্ষী, আমিই দায়ী, ...তুমি আমাকে ভেবেছোটা কী জোসেফ! নেশার ঘোরে আমি সেই কথাগুলোই বলেছি, যা তোমাকে শোনাতে চেয়েছি। তোমাকে আর তোমার মার্গারেটকে. বুঝেছো? তোমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমি ওকেই তো শোনাতে চেয়েছিলাম, আর সব কথা ও শুনেছে বোধহয়, সব বুঝেছে। তুমি ছাই বুঝবে! এ কোনো হারামজাদা সেমিনার ছিল, নাকি ক্লাস? তুমি আমাকে মদের সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখো, তবু আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না—আমার নাম কুন্দন—প্রিয়. গোল্ড। বুঝেছো? তুমি শালা কী বুঝবে! কতো ক্যাজুয়াল ভাবে কথাগুলো বলেছিলে তুমি, যেন খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছো, যে, আরে, আর্থারও বিদায় নিল! তুমি কি ভেবেছিলে খবরটা আমি জানতাম না? কিন্তু তোমারই বা কী দোষ! নিছক কাকতালীয় ঘটনা ছিল যে লখনউ ইউনিভার্সিটিতে তোমরা দু-বছর একসঙ্গে পড়েছিলে। গভীর বন্ধুত্ব তো আর ছিল না। সে-তো গতবছর খাজুরাহোতে হঠাৎ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় আর কথায়-কথায় ওর কথা চলে আসায়. ওর চেহারার বর্ণনা শুনে তুমি বলে উঠলে, 'আরে অর্থার! ও তো আমার ক্লাসফেলো ছিল!' এ-বাদে আর কোনদিনও অর্থারের কথা আমাদের মাঝে উত্থাপন হয়নি। আমি কেমন যেন অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে তুমিও আর্থারকে চেনো। কিন্তু

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার আদৌ ছিল কি? পৃথিবীটা কতো ছোটো হয়ে এসেছে জোসেফ! ভাবতে বসলে এই দেশ আর কাল—সব ফালতু মনে হয়। আসলে আমরা সবাই পরস্পরকে ভালোভাবে চিনি, আমরা একে-অপরের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে সম্পর্কযুক্ত, কখনও-না-কখনও আমাদের মোলাকাৎ ঘটেছে। ব্যস্, স্পর্শের অপেক্ষা, তারে ঝংকার দেওয়ার অপেক্ষা, আর বিদ্যুতের একটা প্রবাহ এখান থেকে ওখানে হাজার মাইল দূরে ছুটে গিয়ে হঠাৎ আছড়ে পড়ে ঝলকে দেবে সমস্ত। কিন্তু ওর এই আকস্মিক মৃত্যু সত্যিই কি তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি জোসেফ?—তুমি মানুষ না কী! আর্থারের কোনো স্মৃতি তোমার কাছে নেই, এ-তথ্য আমার কাছে এমন অবিশ্বাস্য, এমন ভয়াবহ ঠেকছে কেন জোসেফ? আমি ওর কথা বলছিলাম— বলতে-বলতে না-জানি কতো কী করছিলাম, তুমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলে শুধু। নিজের তরফ থেকে আর্থার সম্পর্কে তুমি একটাও শব্দ বলো নি। আমি কিন্তু জানতে চাইছিলাম, তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাইছিলাম, আর্থার ঐ দিনগুলোতে কিভাবে থাকতো, কেমন দেখতে ছিল ও, ওর সেই বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করার স্বভাব তখুনি গড়ে উঠেছিল কিনা, স-অব। ও কি তখনও গল্প লিখতো? তখনও প্রেম করতো? কে ছিল, কেমন ছিল ওর প্রেমিকা? ...লেখাপড়ায় কেমন ছিল ও? ক্লাস ছেড়ে পালাতো কি? ...এসব তুমি ছাড়া কে আর জানাতে পারে! কিন্তু তুমি মানুষ না অন্যকিছু? ...মেশিনের মতো দোদুল্যমান ঐ মাথাটাকে যদি ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখনও বুঝি এইভাবেই দুলতে থাকবে, তাই না? এমন কি ফারাক ঘটবে? কোনো কিছুতেই যখন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তোমার, যখন তুমি নিজেরই স্মৃতিকে এভাবে কেটে বাদ দিতে পারো যে একফোঁটা রক্তও ওর কপালে জোটে না অথচ তবু সে খচ্চরের মতো বয়ে চলে তোমার যতোসব নিষ্প্রাণ ধারণা ও প্রমীত তথ্যসমূহকে, তখন মাথার জায়গায় ধড় আর ধড়ের জায়গায় মাথা রেখে দিলেই বা কী এমন তারতম্য ঘটবে? এতে এটাই বোঝায় না কি যে, পুরুষ হোক কিংবা নারী, উভয়ক্ষেত্রেই তুমি নিষ্ক্রিয় থাকতে ভালোবাসো? মস্তিষ্কের বদলে একটা কমপিউটার বসানো রয়েছে তোমার মাথায়, আর হৃৎপিণ্ডের বদলে ক্যালকুলেটার। আমি কী-সব বাজে কথা শুনিয়ে মরছি তোমাকে! এতো ভালো খাবার খাওয়ালে তুমি, এতো দামি মদ খাওয়ালে, বিনিময়ে আমি কী দিচ্ছি তোমাকে? না, আমি কৃতঘ্ন নই জোসেফ। ঠিক সময়েই এসে পড়েছো তুমি। দুঃসংবাদ নিয়েই এসেছো না হয়, কিন্তু এসেছো একেবারে মোক্ষম সময়ে। তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল না, সে-কথাই বা বলি কেমন করে! সেটা মিথ্যে বলা হবে। তুমি আমার পরিত্রাতার মতো এসেছো, আর পরিত্রাতার মতোই ফিরে যাবে পরশুদিন—এর চেয়ে বড়ো উপকার আর কী? ...এবং তুমি যে মার্গারেটের মতো মহিলার স্বামী। ...সত্যি

বলতে কি, এই মুহূর্তে তোমার মতো লোকের সঙ্গই আমার কাম্য ছিল—তাই তো অকারণে হঠাৎ এভাবে এসে পড়লে তুমি! প্রচণ্ড উষ্ণপ্রবাহে বারি পতনের মতো। ...ঈশ্বর-প্রেরিত দূতের মতো...। তুমি...তোমার কি দরকার ছিল আমাকে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়ার, এভাবে আপ্যায়ন করার, সত্যি যদি আমার সঙ্গে তোমার মানসিক যোগ না থাকতো! না জোসেফ, তুমি লোকটাও খুব ভালো—একেবারে নিজের ধাঁচে তৈরি তুমি। মাফ কোরো জোসেফ, ভালো মানুষ না হলে তুমি আমাকে দিয়ে এতসব বলিয়ে নিতে পারতে? ...কী করে বলালে এত কথা, আমাকে দিয়ে? ...বিশেষত, দেড় মাস ধরে যখন ঠোঁট সেলাই করে বসেছিলাম? তোমার সঙ্গে এ আমার প্রথম মদ্যপান তো আর নয়, কিন্তু আগে কখনও এভাবে নিজেকে উলঙ্গ করেছি, তোমার সামনে?

আরও-একটিবার বলো জোসেফ—'ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ্ এনাফ...' কেন জানি না তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে-পড়া এই একটি বাক্য সেই কখন থেকে আমার মস্তিষ্কের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে! ...এটা তো আর্থারের কথা, ঠিক এই কথাটাই আর্থার বলেছিল আমাকে। আর যে-টোনে, যে-ক্ষেত্রে, যে-প্রসঙ্গে যেমনভাবে বলেছিল তার প্রতিটি ডিটেল মনে আছে আমার। তুমি তো আর্থার নও জোসেফ! আর্থারের নখের যোগ্য মাত্র নও, অথচ... কী করে বলে বসলে কথাটা? আর্থারের মতো তুমিও আমার আত্মার রহস্যভেদী নাকি? ...এমন মৌলিক আর নির্বিকল্প কথা অন্তত তোমার মুখে শুনতে অভ্যস্ত নই আমি।...

'ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ্ এনাফ'—কথাটা প্রথম কোথায় যেন শুনেছিলাম? কখন শুনেছিলাম? ও, মনে পড়েছে...। সেই কলেজ স্টাফরুমের ঘটনা। অঙ্কের সেই লেকচারারটা, শর্মা, আমাকে হেস্তনেস্ত করছিল। ...আলোচ্য বিষয় ছিল সেক্স। ...সে দারুণ উপভোগ করছিল, আর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিল। ...আমি ঐ সময় গ্রন্থিমুক্তি ব্যাপারে কয়েকটি আশ্চর্যজনক টোটকা শিখেছিলাম। আশ্চর্যজনক, কিন্তু উজবুকি নয়। আমার সঙ্গে একজনের ফষ্টিনষ্টিও চলছিল এবং ঐ ব্যাপারে আর্থার হয়ে উঠেছিল আমার স্বনিযুক্ত পরামর্শদাতা। এসব ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে একধরনের আড়ষ্টতাযুক্ত জুগুপ্সা রয়েছে, যে ভণ্ডামি রয়েছে, আমি তাকে আঘাত করতে চেয়েছিলাম। এতে এক অদ্ভুত তৃপ্তি লাভ করতাম আমি। এক বিচিত্র আত্মপ্রত্যয়ও। আর্থার আমাকে খুঁচিয়ে চলেছিল আর আমি এক-এক করে ওর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। ...এমনসময় তুমি ক্লাস সেরে এসে ঢুকলে, আমার পাশটিতে বসে পড়লে। আমার ভোল পাল্টে গেল। আর তাই দেখে আর্থার গেল ক্ষেপে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে, 'চুপ মেরে গেলে কেন মিস্টার? দিব্যি তো চালিয়ে যাচ্ছিলে, চালাও না। জানি, সিনিয়ারের সামনে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়। ...নিজেকে তুমি কী ভাবো বলো তো? তোমার লজ্জা করে না এভাবে

নিজের ওঁচলা খুলে দেখাতে? প্রত্যেককে নিজের মতো ভাবো?...' আমি তো হতভম্ব, অবাক চোখে ওকে দেখি। বেশ তো মজা লুটছিল, হঠাৎ কী হলো? শুরু তো আমি করিনি, সে নিজেই করেছিল। ...এবং এভাবে আমাকে পদদলিত করে এবং আমাকে মাটিতে মিশিয়ে দেবার পর সে সদর্পে তাকায় তোমার দিকে। ...তুমি এক ঝলক ওর মুখের দিকে চেয়ে ঝটিতে উঠে দাঁড়ালে...'স্টপ ইট শর্মা!' তুমি ধমকের সুরে বললে, 'আমি কুন্দনকে তোমার চাইতে ভালো চিনি। তুমি ওর জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য নও, বুঝেছো!' এটুকু বলে তুমি আমার হাত ধরে আমাকে স্টাফরুমের বাইরে নিয়ে গেলে। বেরিয়ে যেতে-যেতে ওকে শুনিয়ে আমাকে বকুনি দেওয়ার মতো করে বলেছিলে, 'যে-কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলো কেন? পাত্র-অপাত্র বিবেচনা করবে তো। প্রত্যেকে আর্থার নয়। নিজের সম্মান নিজে করবে না তো কে করবে?'

বাইরে বেরিয়ে তুমি আবার সেই কথাটা রিপিট করলে, 'ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ্ এনাফ'...।

হ্যাঁ, আমার বেশ মনে আছে আর্থার, এ-ছিল আমাদের পরিচয়ের সূচনালগ্নের ঘটনা। সেই থেকে তুমি স্বেচ্ছায় আমার বড়ো দাদার ভূমিকা গ্রহণ করলে, এবং ক'দিনের মধ্যেই তুমি একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠলে আমার কাছে। আমার বোধবুদ্ধির ওপর আমার চাইতে তোমারই ভরসা ছিল বেশি, যদিও তোমার গল্পকার হওয়ার সাধও আমার ওপর এই অতিরিক্ত ভরসার কারণেই ঘুচে গিয়েছিল। তাই না? শুধু তুমি কেন, আমাকে উসকে দেওয়ার ব্যাপারে তোমার গ্রীটাও কম যেতো না। জীবনের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, আমার ছোট বেলার পর ঐ একটি পর্বই সামান্য উজ্জ্বলতর, যা কেটেছিল তোমাদের দুজনের সঙ্গে। এ এক অভাবিত ব্যাপার যে গোটা দশ-দশটা বছর আমি তোমাদের সঙ্গে ছিন্ন থেকেছি। কতো সহজে ভুলে গেলাম তোমাকে! কেন? এই মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গেই এরকমটা ঘটে কেন বলো তো? যে উপকারীর উপকার বেমালুম ভুলে যেতে পারে! বিশেষত সেই উপকারীর, যে তার গড়ে ওঠার প্রাথমিক বছরগুলোতে, তার জীবনের সবচেয়ে কাঁচা সময়ে সত্যিকারের সাক্ষী ছিল!

সে আরও-এক বিচিত্র যোগাযোগ, দশ বছর পর তোমাদের দু'জনের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হওয়া। তাও এমন এক জায়গায়, যেখানে তোমাকে পাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারিনি। আমি এলিসকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা খাজুরাহো পৌঁছই। ওখানে, কাঁদারিয়া মহাদেবের পরিক্রম করার সময় হঠাৎ চোখে পড়লো গ্রীটা আর তুমি এগিয়ে আসছো। তোমার তো অজ্ঞান হবার জোগাড়! মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিলে তুমি। নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস হচ্ছিল না তোমার। আমিও সহাস্যবদনে থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তুমি একবার

আমাকে দেখো, একবার এলিসকে। আর বারবার চোখ কচলে তাকাও। আর গ্রীটা, রঙ্গ করার ব্যাপারে সেও তোমার চেয়ে কিছু কম যায় না। ব্রেক কষতে না পেরে, ছুটে এসে সটান আমার গলা ধরেই ঝুলে পড়েছিল সে...'ও মাই বয়, মাই ডার্লিং!' কিছুতেই ছাড়তে চায় না, আমি তো লজ্জায় জুবুথুবু : না-জানি এলিস কী ভাবছে! আমরা ওখানে বাঁধানো চত্বরের ওপর বসে পড়েছিলাম। আর হামেশার মতো গ্রীটা তোমার বিরুদ্ধে খুলে বসেছিল ফরিয়াদের পুটলি। আর তুমিও সেই আগের মতোই দোষ স্খালনের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলে। ...তবে কি তোমাদের কাছে সময় অনড় হয়ে থেকে গিয়েছিল? তোমাদের দু'জনের মাঝখানে আমি ছিলাম একক সেতু হয়ে। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল, অথচ দেখে অবাক হলাম যে সামান্য একটু নালিশ ভিন্ন আমার বিরুদ্ধে সেরকম কোনো গুরুতর অভিযোগ নেই তোমাদের! চাক্ষুষ প্রমাণ মিললো যে তোমরা আমাকে বিন্দুমাত্র ভোলো নি, আর মিনিট কয়েকের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে এমনসব গল্প জুড়ে দিলে যেন কিছুই বদলায়নি। অথচ আমি নিজের মধ্যে এক দারুণ পরিবর্তন অনুভব করছিলাম। তোমরা ঠিক আগের মতোই শিশুসুলভ ঝগড়া করে চলেছো, আগের মতোই আমার ওপর অধিকার ফলাচ্ছো—এটা দেখে একদিকে যেমন ভালো লাগছিল, অন্যদিকে তেমনি একটু অসমঞ্জসও ঠেকছিল। ছি-ছি, এলিস কী ভাবছে! তুমি অত্যুৎসাহে প্রস্তাব রাখলে আরও অন্তত একটা দিন তোমাদের সঙ্গে কাটাতে হবে আমাদেরকে, আর আমি তাতে রাজিও হয়ে গেলাম। এমনিতে খাজুরাহা মোটেই ভালো লাগছিল না এলিসের। তুমি রসিকতা করে বলেওছিলে ওকে, 'তোমার স্বামী তোমাকে একেবারে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে। আমিও বিয়ের পর গ্রীটাকে নিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম এই খাজুরাহো। আমাদের দাম্পত্যজীবনে শুভ প্রমাণিত হয়েছিল সেটা। আশা করি তোমরাও সুফল পাবে। সবাই পায়...' জানি-না আর্থার তুমি খেয়াল করেছিলে কিনা, ইয়ার্কিটা এলিসের ভালো লাগেনি। তখুনি মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু পরে সে যা জাহির করলো, বোঝা গেল, তোমার ব্যক্তিত্ব ওর কাছে ভীষণ ভালগার ঠেকেছে। হ্যাঁ, ভালগার। আশ্চর্য, এলিসের চোখে আমার প্রতিটি বন্ধুই ভালগার ঠেকেছে। তোমাকে দিয়ে সেই তালিকার সূচনা ঘটেছিল মাত্র। গ্রীটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছিল, ও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। মেয়েরাই মেয়েদেরকে বুঝতে পারে বেশি।

এলিসের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন থেকে যাই আমরা। পরদিন আমরা ধরি আগ্রার ট্রেন, আর তোমরা রওনা দাও বেনারসের উদ্দেশ্যে। তুমি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে, আমি যেন সম্পর্ক রক্ষা করি আর দেওয়ালির ছুটিও কাটাই তোমাদের সঙ্গে। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করার সুযোগ যে আর মিলবে না, এ আমি তখুনি বুঝেছিলাম। এখন তুমি পরলোকে আর আমিও এই মর্ত্যালোকে পরলোক রচনা

করে বসে আছি। আমার ধারণা, এবার আমাদের মধ্যে চিঠি চালাচালিটা আরও ভালো হবে। গ্রীটা এখন কোথায় জানি না। তুমি তো শালা মরে বাঁচলে, ও-বেচারিকে কোথায় ফেলে রাখলে? ওকে চাকরিও করতে দাওনি তুমি। কতো ভালো হতো যদি তুমিও আমার মতো একজন অক্ষম স্বামী প্রমাণিত হতে আর গ্রীটা তোমাকে ছেড়ে ডাবলিন চলে যেতো! যেখানে সে নার্সের চাকরি করতো। তুমিই জানিয়েছিলে, তোমাদের কোর্টশিপ ডাবলিনের এক হাসপাতালের রোগশয্যাতেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। মরলে তুমি কোনখানে গিয়ে? শুনেছি, গণটোকাটুকি রুখতে গিয়ে ছেলেদের হাতে পিটুনি খেয়েছিলে তুমি। সত্যি নাকি? ঐ পিটুনিই তোমাকে খতম করে ফেললো না তো? এদেশের বর্তমান ইতিহাসে এর চেয়ে গৌরবময় মৃত্যু আর কি হতে পারে? তুমি বীরগতি লাভ করেছো বন্ধু! তোমার নাম শহীদের তালিকায় গণ্য করা হবে। 'অ্যামং দ্য সেণ্টস্ অ্যাণ্ড মর্টার্স।' বুঝেছো? ...বিদায় বন্ধু, আমার প্রিয় আর্থার, যে এক কিংবদন্তীর মতো আমার জীবনে এসেছিল, এক কিংবদন্তীর মতোই বেঁচে থেকেছে আর মারা গেছে...বিদায়!

আর্থার, গ্রীটা এবং এলিস

জোসেফ যদি আরও ক'টা দিন না আসতো, এমন কী বিগড়ে যেত ওর? গোনাগুনতি ক'টা দিনেরই তো ব্যাপার ছিল। ও যে আমার কাজে কী-ভীষণ ব্যাঘাত ঘটালো, তা আর ও নিজে বুঝবে কি করে! আবদার দেখুন, বলে কিনা, সকাল-সন্ধে দুবেলা আমি যেন ওর বাড়িতে গিয়েই খাওয়া-দাওয়া করি। আমি আবার মুখের ওপর না বলতে পারি না। কী যে হয়েছে আমার! ওদের দু'জনেরই বা কী হয়েছে কে জানে! আগে তো কখনও আমার ওপর এতটা জোর ফলাতো না? হঠাৎ ওদের হলোটা কী? আমাকে গোয়া নিয়ে যাবে বলে জেদ ধরেছে। মার্গারেট সম্ভবতঃ ভয় পাচ্ছে যে ওরা চলে গেলে না-জানি আমি কিছু করে বসবো হয়তো। জোসেফের হাবভাবও অনেকটা সেইরকম। আশ্চর্য! সত্যি কি আমি অতটা হতাশ আর ভয়ংকর ঠেকছি? এ আমার আত্মহনন, অথবা নিছক অসংবৃতি? জোসেফ, যে নিজের উগ্র আত্মপ্রীতির দায়ে কুখ্যাত এবং যেটায় আমার ভারি অপছন্দ, সেও ভয়ে এমন কাঁচুমাচু হয়ে রয়েছে যে দেখলে হাসি পায়। কিন্তু আমার যতই হাসি পাক, ওদের হাসতে মানা। আমি নিজেকে যত হাসিখুশি দেখাতে চাই, ওরা ততই সিরিয়াস হয়ে ওঠে। মহা ফ্যাসাদ!... অবশ্যি, নিজেকে দেখেও আমি কম অবাক নই। এই দু'জন খামোকা আমার অযাচিত অভিভাবক ব'নে বসেছে, আর তা দেখে ভীষণ মজা পাচ্ছি আমি। জোসেফকে দেখছি যে আর্থার রূপে, আর মার্গারেটকে মনে

হচ্ছে গ্রীটা। একি মানসিক সুস্থতার লক্ষণ? ...বিক্ষিপ্ত বা অসংবৃতি আর বলে কাকে?

গরমের ছুটি কাটাতে আমি এই শ্মশানটিকে বেছে নিলাম কেন, সেটা জোসেফের মাথায় ঢোকা সহজ নয়। ইতিমধ্যে বেশ ক'বারই জানতে চেয়েছে, আর প্রথমবার শুনে তো মানতেই চায়নি যে দেড় মাস ধরে আমি এখানে পড়ে রয়েছি। ও যেন ধরেই নিয়েছিল যে আমি কোথাও লুকিয়ে বসে দারুণ জমকালো একখানা থিসিস-টিসিস লিখে ফেলেছি, আর গোটা পৃথিবীটা রয়েছে সেই আলোড়নের অপেক্ষায়। কিন্তু কাল থেকে ওর মুখেও দেখছি কথাটি নেই।

কাল চলে যাবে জোসেফ। আজকের সন্ধেটা ওর বাসায় খুব ভালো কাটলো। বাচ্চাগুলো ক্লান্ত হয়ে শুয়ে না-পড়া অব্দি আমি ওদেরকে নিয়েই মশগুল ছিলাম। বেশ ভালো লাগছিল। ওরা হয়তো ভাবছে ছুটি কাটিয়ে ওরা যখন এখানে ফিরে আসবে, আমাকে দেখতে পাবে। ভগবান করুন, তাই যেন হয়।

জোসেফ উদগ্র আত্মপরায়ণ হলে কি হবে, যথেষ্ট বিচক্ষণ। ও আর ওর বউ যতাসম্ভব সতর্ক থাকে যাতে ঘৃণাক্ষরেও এলিসের প্রসঙ্গ আমার সামনে না ওঠে। ওদের এই রং চড়ানো সতর্কতার আতিশয্য দেখে অবাকও হই, আবার হাসিও পায়। আমি জানি, ওরা মনে-মনে এলিসের প্রতি যতটা সহানুভূতিসম্পন্ন, আমার প্রতি ততটা নয়। তবু, সুখের কথা, ওরা কখনও এ-ব্যাপারে নাক-গলানোর চেষ্টা করেনি, আমাকে ঘাঁটায়নি কখনও। মনের মধ্যে কৌতূহল যতই থাক, বাইরে প্রকাশ করেনি। অন্যের মনের কদর এতটাই বা আজকাল কে করে! অন্তত এই একটি ব্যাপারে খৃষ্টানদেরকে হিন্দুদের চেয়ে বেশি সমঝদার মনে হয়েছে আমার। এমনিতে, আহুজাও মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু আহুজার মুখের ভাষা পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পারি কী বলতে চাইছেন। একমাত্র মিসেস আহুজার আচরণই, আমার সঙ্গে—এলিস যখন ছিল তখন থেকেই—এমন স্নিগ্ধ ও সাংকেতিক হয়ে উঠেছিল যে মনে হতো গোটা কলোনির মেয়েছেলেদের মধ্যে আমার পক্ষে গণমত গঠনের চেষ্টা কেউ যদি করে থাকে, একা উনিই করেছেন। ওঁর 'দাদা' সম্বোধনের মধ্যে অনুকম্পার একটা আলাদা মিশেল বরাবর টের পেয়ে এসেছি আমি। এলিসের সঙ্গে ওঁর আগে যতখানি ঢলাঢলি ছিল, শেষের দিকে সম্পর্কটা ততখানিই তেঁতো হয়ে গিয়েছিল। আর, আমি জানি, মেয়েদের বৈরিতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি টেঁকসই। ওদের সাপত্নও শেষদিন পর্যন্ত টিকেছিল। অবশ্যি, খুব-সম্ভবত 'দাদা'র মুখ চেয়েই উনি এক-আধবার নিজের তরফ থেকে বরফ গলানোর যৎসামান্য তদ্বিরও করেছিলেন। কিন্তু এলিসের তরফ থেকে উপযুক্ত রেসপন্স না পাওয়ায় উনি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যান। আমি জানি, ওঁর চোখে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ আর এলিস ষোলো আনাই অপরাধী। আর মার্গারেটের চোখে? এলিসকে জড়িয়ে

আমার সম্পর্কে মার্গারেট কী ভাবছে? সেটা জানার জন্যে আমার বুভুৎসার অন্ত নেই। ঔৎসুক্য আগে তেমন ছিল না, অথচ এখন সেটা বাড়ছে বই কমছে না। কেন? মিসেস আহুজার সহানুভূতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না কি?

এই দু'জনের সঙ্গে এলিসের, কেন জানি না, মাখামাখি বিষে-একটা ছিল না। অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার পক্ষে খৃষ্টান হওয়াটা পর্যাপ্ত ছিল না বলেই হয়তো। ওর যা-কিছুই প্রত্যাশিত থাক না কেন, জোসেফ আর ওর সমধিক সহজ-সরল বউয়ের মধ্যে তার পূরণ আশা করেনি। গোড়ার দিকে জোসেফ বেশ ক'বারই নিজের বউকে আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছিল, আমরাও গেছি ওদের বাসায়। কিন্তু পরে হয় আমি একা ওদের বাসায় গেছি, কিংবা জোসেফ একা এসেছে আমাদের বাসায়। আর এটা দু'তরফ থেকেই সহজে মেনে নেওয়া হয়েছিল। খারাপ মনে করার বদলে জোসেফ মোটামুটি হামেশাই এলিসের তরফদারি করে এসেছে। বলতো, 'এলিসের মতো অনুভূতিসম্পন্ন আর আচারনিষ্ঠ মেয়ের পক্ষে আমাদের এই ভোঁতা পরিবেশে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। তুমি কি এটা মনে করো না?' আমি কোনো জবাব দিতাম না। ওর কথা শুনে প্রায়ই মনে হতো ও আমার ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এলিসের সামনে বসে থাকতে ওর খুব ভালো লাগতো। এলিসের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ও সব সময় মুখিয়ে থাকতো আর ওকে প্রভাবিত করার নানারকম উপায় খুঁজতো। ওর বেশিরভাগ কৌশলই ভেস্তে যেতো, সে ভিন্ন কথা। রোমান্টিক না-হওয়াটাও এক ভয়ংকর বিড়ম্বনা। জোসেফ হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এলিস ওকে কতটা 'ভালগার' মনে করে আর ওর আচরণ কতটা খারাপ লাগে ওর। ও যতক্ষণ বসে থাকতো, এলিসের মুখের ওপর থেকে চোখ সরতো না। গোড়ার দিকে আমারও কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল এই আদেখলামি! পরে, যা হোক, ব্যাপারটা ধাতে সয়ে গিয়েছিল। আর সেটা চোখেও পড়তো না।

জোসেফের বাড়ির রান্না বেশ ভালো লাগে আমার। ওর স্ত্রী একজন সুগৃহিনী তো বটেই, যথেষ্ট মিতভাষী আর হামেশা স্বামীর অনুবর্তিনী হয়ে থাকার গুণ রয়েছে ওর মধ্যে। পুরুষকে আকৃষ্ট করার মতো কোনও গুণ এমনিতে ওর মধ্যে নেই। তবু কেন জানি না, জোসেফের ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি। হয়তো আমি এরকম কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে সুখী হতাম যে আমার ওপর চড়ে বসবে না, আমার ওপর অগাধ ভরসা থাকবে যার, এবং যে কথায়-কথায় জেদ ধরবে না। মার্গারেটের মনে হয়তো কখনও আসেই নি যে, জোসেফ যতখানি ভালোবাসা ওকে দিতে পারতো, তার অর্দ্ধেকও ও পায় না। সেই আধখানা ভালোবাসা নিয়েই ও খুশি থাকতে চায়। এই মহিলার যে কোনো ক্ষোভ, কোনো জ্বালা বা অভিযোগ থাকতে পারে, তা ওকে দেখলে বোঝা যায় না। এক একজনকে দেখে মনে হয় যে কোনো অবস্থাতেই এর পক্ষে সুখী আর নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব নয়,

আর নিজের লোককেও ওভাবেই রাখতে পারে। মার্গারেটকে খুব শান্ত আর স্বাভাবিক মনে হয়। ওর সম্পর্কে জোসেফের ধরণাও মোটামুটি এই, আর এ নিয়ে ওর কুণ্ঠার অন্ত নেই ; ফলত এলিসকে দেখে ওর জিব এক হাত লম্বা হয়ে ঝুলে পড়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। ওর নির্ঘাৎ মনে হয়েছিল যে ওর চেয়ে অভাগা বুঝি ইহসংসারে দ্বিতীয়টি নেই, ওর নিজের বউটি তো ওর নখের যোগ্যও নয়। কিন্তু আমার চোখে এটা ব্যক্তিত্বহীনতা নয়। যদি হয়, তাতে আমার কিছু এসে-যায় না। মার্গারেটকে আমার এই কারণেই বেশি পছন্দ। নারীর অর্থ—অন্তরের সেই শক্তি, যা সেহেন নারীর মধ্যেই থাকা সম্ভব যার মনে নারীত্বের কোনো অহংকার থাকে না, আর যে রোমাণ্টিক প্রেমের কীটাণুসমূহ থেকে সাত হাত দূরে থাকে। আমি সবিশেষ জানি যে জোসেফকে নিয়ে মার্গারেটের কোনো দুর্ভাবনা নেই, কেননা মার্গারেট ওকে চেনে। কেননা জোসেফ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সেই শান্তি ও নিরাপত্তার, যা ওকে একমাত্র মার্গারেটই দিতে পারে। জোশেফ মুখে স্বীকার না-ই বা করল, বোঝে যে, মার্গারেট ওর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আসলে যেসব জিনিস মানুষ অনায়াসে ও অযাচিতভাবে পেয়ে যায়, সেগুলোকে নিজস্ব বলেই ধরে নেয় সে। এমনিতে জোসেফ মেয়েদেরকে সিরিয়াসলি নেয়ও না। সেটা এমন কি দোষের? আমিই বা নারীকে সিরিয়াসলি নিয়ে কোন্ পুণ্যটা অর্জন করেছি?

ওর বাড়ি গেলেই মনের মধ্যে কেন-জানি একটাই কথা চাগিয়ে ওঠে যে, মার্গারেটের মতো বউ আমার হওয়া উচিত ছিল, জোশেফের নয়। এ আবার তেমনি ব্যাপার নয় তো, যেমনটা আর্থার আমাকে বলতো, 'অন্যের জিনিসই তোমার মনে ধরে বেশি। এমন নয় যে জিনিসটির বিশেষ কোনো গুণ বা মূল্য রয়েছে, শুধু এই কারণে যেহেতু সেটি অন্যের জিনিস। অন্যের জিনিস মনে লাগার ব্যাপারে তুমি অভিশপ্ত। তোমার কাছে যে-জিনিসটা আছে, তাকে নিজের বলে মনেই করো না তুমি। এর মানে, হয় তুমি আত্মমর্যাদাশূন্য, নয় তো তোমার মধ্যে বেশ বড়সড়ো মৌলিক গণ্ডগোল রয়েছে।'

তবে কি আর্থারই সঠিক ছিল, তার ঐ দ্বৈত নিদানে? একটা তো সেই 'ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ্ এনাফ' ; আর দ্বিতীয়টি হলো, 'দেয়ার ইজ সামথিং ফাণ্ডামেণ্টালি রং উইথ ইউ...'। আমার ধারণা, প্রথমটি, অর্থাৎ আত্মসম্ভ্রমহীনতার তহমতটা আমার ক্ষেত্রে এখন আর প্রযোজ্য নয়। আর্থার শুধু নিদান বাৎলেই ক্ষান্ত হয়নি, নিরাময়েরও খাসা তদ্বির চালিয়েছিল। আর্থার এবং তার গ্রীটা। আমি আজ সকাল থেকেই তার লেখা চিঠিগুলো পড়ছি। প্রবাসবাসের প্রথম এক-আধ বছর তার সঙ্গে খুব চিঠি চালাচালি হয়। তারপর আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। আমরা যেমন জীবনের অনেক ঘটনা, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ভুলে যাই, তেমনি নিজের পথের সঙ্গীকেও ক্রমশ ভুলে যেতে থাকি। এটা অবশ্য স্বাভাবিক ব্যাপার

এবং এতে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। খাজুরাহো বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ ওভাবে মুখোমুখি হয়ে না পড়লে তার সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রশ্নই ছিল না। আমরা একে-অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নই থেকে যেতাম। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন বুঝি অন্যরকম ছিল। এর চেয়ে ভালো হতো যদি সাক্ষাৎই না ঘটতো। কিন্তু বিধি যা, তা বাম। নিয়তি যদি আমার সুবিধে অসুবিধে খেয়াল করে চলবে, তবে তাকে নিয়তিই বা বলা হবে কেন? ...আজ সকাল থেকেই আর্থারের চিঠিগুলো পড়ছি। চিঠিগুলো বলতে, গোণাগুণতি সাত-আটখানা মাত্র, যা সে গত দু-তিন বছরে লিখেছিল। সে জানাচ্ছে, দশ বছরের ছাড়াছাড়ির পর আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার আগের সেই ধারণাটি একেবারে পাল্টে গেছে আর একটা নতুন বা প্রায় বিপরীত ধারণা গড়ে উঠেছে তার মনে। তার নিজের ভাষায়, সে একজন 'শাশ্বত কিশোর', আর শাশ্বত হয়েই থাকতে চায় বাকি জীবনটা। অন্যদিকে আমাকে দেখে তার যেটা সুখপ্রদ বিস্ময় জেগেছে, সেটা হলো, আমি নাকি পুরোপুরি সাবালক আর চালাকচতুর হয়ে উঠেছি। প্রথম চিঠিতেই আর্থারের এ-মন্তব্য পড়ে, বলা বেশি, আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল এই মূল্যায়ণ না-মানার কোনো কারণ নেই। এমনিতেও আমি নিজের পিঠ নিজে মিছিমিছি চাপড়াই না। আবেশ ও ঐসাস্যে ভরা একটি চিঠিতে সে লিখেছে, 'এক সময় তোমাকে রক্ষা করার জন্যে সবসময় সন্ত্রস্ত থাকতে হতো আমাকে। এখন বলতে দ্বিধা নেই, ভূমিকাটা পরস্পর বদলে যেতে পারে। এখন তুমিই আমার অভিভাবক হতে পারো। আর, কবুল করতে দ্বিধা নেই যে এখন তুমি নও, আমিই তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।'

এহবাহ্য। কিন্তু এ তো সেই 'ইউ ডোণ্ট রেসপেক্ট ইওরসেলফ এনাফ' গোছেরই কথা হলো। আর্থারের দেওয়া সেই দ্বিতীয় নিদানটির হাল কী? সেটা তো যেমনকার তেমনি অনড় হয়েই থেকে গেছে। সেই-যে, 'তোমার মধ্যে অনেক মৌলিক গণ্ডগোল রয়েছে'—? নিঃসন্দেহে, আর্থারের কাছ থেকেই আমি আত্মসম্ভ্রমবোধ আয়ত্ব করেছি। নিজের অধিকারের জন্যে লড়াই করার শিক্ষাটাও তার কাছ থেকে পাওয়া। সে-ই আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও শাণিত করে তুলেছিল। কিন্তু কী সেই মৌলিক গণ্ডগোল, কোথায়, তা সে বাৎলাতে পারেনি, নিজেও শনাক্ত করতে পারিনি আমি। এত বছর পরেও। বরং বলতে হবে, অন্যান্য ভুলভ্রান্তিগুলোর সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই সেই মৌলিক ভ্রান্তিটিকে বা ভ্রান্তিগুলোকে গুলিয়ে ফেলেছি আমি। কিন্তু গুলিয়ে ফেললে বা ভুলে থাকলেই কি রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়? ...তাই যদি হতো, আমি ফিরেই বা আসতাম কেন?...

আর...মার্গারেটকে দেখে আমি এই কারণেই প্রভাবিত, যেহেতু সে অপরের জিনিস? আর অপরের জিনিসই আমার কাছে বরাবর প্রিয়তর ঠেকে বলে? ...এর চেয়ে বড়ো মিথ্যে আর অন্যায় আর কী? আমার নিজের প্রতি এবং স্বয়ং মার্গারেটের

প্রতিও। মার্গারেট কি একটা জিনিস মাত্র? অপরের জিনিস? ...না, আর্থার না। এ ক্ষেত্রে তুমি একেবারে ভুল। তোমাকে কি করে বোঝাই আর্থার যে,...মার্গারেট আমার কাছে বেঁচে থাকার স্টাইল মাত্র। বাঁচার স্টাইল, অর্থাৎ জীবনের দর্শন? হ্যাঁ, আর্থার, সত্যি তাই।

আমি আর্থারকে এলিসের কথা—এলিস আর আমার মধ্যেকার ক্রমবর্দ্ধমান সম্পর্কহীনতার কথা—কখনও কিছু লিখিনি। কেন লিখিনি? গ্রীটাকেও লিখিনি। কেন? গ্রীটা ছাড়া আর কে বুঝতো আমাকে? একা ওরই সহানুভূতি তো আমার ভাগ্যে জুটেছিল। ...ছোটবেলা থেকেই আমি সহানুভূতির ভীষণ কাঙাল। এই খিদের কাছে আমি অসহায় হয়ে পড়ি। গ্রীটা আর আর্থারের সঙ্গে ওভাবে হঠাৎ খাজুরাহে দেখা হওয়ায় কী যে আনন্দ হয়েছিল আমার! প্রথম কিছুদিন তো আমাদের মধ্যে চিঠিপত্রের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। অতীতের দিনগুলো সত্যিসত্যি ফিরে এসেছে যেন! আর, নিজেকে তেমন প্রবোধ দিতেও ছাড়িনি। অতীত কি ফিরে আসে কখনও? অতীত ফিরে আসে না। আসতো যদি, জার্মানি যাওয়ার পর আর্থারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অমন শিথিল হয়ে পড়েছিল কেন? দশ বছর পর আবার যোগাযোগ ঘটলো আমাদের, কিন্তু সেই ভাঙা সম্পর্কটা আবার আগের মতো জোড়া লাগলো কি? আমরা আমাদের পুরনো সম্পর্কের নিজ-নিজ অবস্থায় ফিরতে পারলাম কি? এটাও অকারণ নয়। এমনিতে আমরা চেয়েছিলাম সেটাই। নিজেদের তরফ থেকে চেষ্টার খামতিও রাখিনি। কিন্তু এ বুঝি ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ মনে করি আমরা। পুরনো সেই দিনগুলোতে একই কলেজে পড়াতাম আমরা। ইচ্ছে করলেই হুট করে ওর বাড়ি চলে যেতাম, সেও হুট করে চলে আসতো আমার বাসায়। আমি ছিলাম একজন সরল, মফস্বলের সাদাসিধে ছেলে, আর আর্থার দেশ-দুনিয়া দেখা একজন মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ়। ঐ সময় আমার মানসিকতা, আমার প্রয়োজনসমূহের স্বরূপও ছিল অনেকটা আলাদা। আর এখন আমাদের মাঝখানে শুধু ভৌগোলিক নয়, মানসিক দিক থেকেও সহস্র মাইলের ব্যবধান ঘটে গেছে, যাকে নিছক স্মৃতির বলে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। পুরনো সম্পর্কই বা তাকে বলি কেমন করে! নিজেকে দিতে থাকলে, অভিজ্ঞতাগুলোকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করলে তবেই না ধারাবাহিকতা গড়ে ওঠা সম্ভব। তাছাড়া সম্পর্ক বজায় থাকবে কি করে? আর, সেই ধারাবাহিকতা একবার ছিন্ন হয়ে পড়লে, তাকে নতুন করে খাড়া করা খুব কঠিন—বিশেষত তখন, যখন একজন থেকে গেছে আগের মতোই আর অন্যজনের মধ্যে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। প্রায়শই নিজের মধ্যে সংঘটিত এই পরিবর্তনকে শনাক্ত করতে পারি না আমরা। তাকে মেনেও নিতে পারি না। কিন্তু তাকে শনাক্ত করতে না-পারলেও, তাকে অস্বীকার করলেও, বাস্তব যা, তা মুছে যায় না।

না, আর্থারের মতো চাপল্য আমার স্বভাবে নেই। মনে আছে, ওর প্রথম চিঠিটা

পড়ে যতটা উত্তেজিত হয়েছিলাম, পরের চিঠিগুলো পড়ে তেমন-কিছু হয়নি। আমার কাছে ক্রমশ এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, আর্থার চিঠিগুলো লিখেছে যে-কুন্দনকে, সেই কুন্দন এখন আর নেই। উভয়ে একই শহরে বাস করলে না-হয় কিছুটা সম্ভাবনা থাকতো, কিন্তু নিছক চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই মানসিক দূরত্বটাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বেদনাজনক দুরাগ্রহ মাত্র। এবং শিগ্‌গির আমি আবিষ্কার করলাম যে ঃ আমাকে দেবার মতো আর্থারের কাছে আর কিছুই নেই, এবং সেই একই হাল আমারও।

যে-ধরনের সমস্যা আমার ছিল, তাতে সে কাজেই বা লাগতো কতটুকু! ...কিন্তু দূরত্ব যাই হোক, পুরনো অভ্যেস অত তাড়াতাড়ি বদলে যায় না। পুরনো সম্পর্ক, যতই অসংসক্তি ঘটুক তাতে বিপদের সময় তাকেই স্মরণ করি আমরা। এতক্ষণে আমার মনে পড়লো, একটা চিঠিতে আমি ওকে আমার দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে দু-চার কথা লিখেছিলাম। অবশ্যি, চিঠিটা পোস্ট করার পর, স্পষ্ট মনে আছে, একটা গ্লানিবোধ ছেঁকে ধরেছিল আমাকে। কষ্ট, বিশেষত এহেন মানসিক কষ্ট মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। একরকমভাবে, স্বার্থপরও। আমরা আমাদের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ছটফট করতে থাকি, অন্যের ওপর নিজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে চাই। শুধু তাই নয়, সেই অন্যজনের প্রতি, যে আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফ নয়, আমাদের মন-মস্তিষ্কের জটিলতা সম্পর্কে যে অজ্ঞ, সেই অন্যজনের প্রতি আমাদের প্রত্যাশা থাকে যে, আমাদের দুঃখ বুঝবে, তা দূর করার উপায়ও খুঁজে বের করবে। স্বয়ং তার বর্তমান অবস্থাটি কী, তা ভেবে দেখার কথা মনেও আসে না আমাদের। ...যাই হোক, আর্থারের জবাব পেলাম—দারুণ লম্বা-চওড়া একখানা চিঠি—আর, একটা চিঠি সে এলিসের নামেও পাঠিয়েছিল, আমি সেটা নিজের কাছেই রেখে দিই। ওকে দিয়ে ফেললে এক-নম্বরের বোকামি হতো সেটা। এবং, এরপর সমস্যাটা দাঁড়ালো, এ-চিঠির জবাবে আমি কী লিখি? সুতরাং চিঠির জবাব দিলাম না। ওর একতরফা চিঠি জমা হতে থাকলো। সে অবাক হচ্ছিল এই ভেবে যে আমি ওকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিলাম কেন? ওর চিঠি আমার মনে আঘাত দিয়ে ফেলে নি তো? ...না। আঘাত দেওয়ার মতো কোনো কথা সে লেখে নি। যা ওর পক্ষে লেখা স্বাভাবিক ছিল, তাই লিখেছিল। একজন সরল হৃদয় মানুষ পাল্টাবেই বা কতটুকু? তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়ার আশা করাটাই বোকামি ছিল। আমি ওকে উত্তর দিলাম ঠিকই, কিন্তু আগেকার সেই টোনে নয়। আমি ওকে মিথ্যে লিখলাম। কয়েকটা সম্পর্ক এমন হয়, কিংবা বলতে পারেন, এমন হয়ে ওঠে—যেখানে সত্যি কথা বলে চালানো যায় না। খাদ না মিশিয়ে, মিথ্যের প্রলেপ না চড়িয়ে আপনি পারেন না। আর্থারের স্বভাব আমার অজানা ছিল না। যে-চিঠিটা সে এলিসকে লিখেছিল, সেটা যদি আমি এলিসের হাতে তুলে দিতাম আর সেটা পড়ে এলিসের যে প্রতিক্রিয়া

ঘটতো, তার হুবহু বর্ণনা আর্থারকে লিখে পাঠালে, সে হয়তো সশরীরে 'এখানে এসে হাজির হতো, আর তাতে পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতো। অন্তত সমাধানের কোনো আশাই তখন আর বেঁচেবর্তে থাকতো না। আমার সমস্যা তার নিজের সমস্যা ছিল না, এবং সে সেভাবেই তাকে দেখেছিল। আমরা একে-অপরের ভেতরে ঢুকেই বা যাই কি করে? আমরা কি অন্তর্যামী, নাকি সর্বব্যাপী? আমরা তো স্ব-স্ব খাঁচায় বন্দী এক-একটা প্রাণী। উপলব্ধি আর সহানুভূতিরও তো একটা সীমা থাকে, নাকি?

আমি আর্থারকে লিখলাম...'তোমার চিঠি পড়ে অনেকখানি স্বস্তি পেলাম। তোমার পরামর্শ আমার কাছে খুবই উপযোগী এবং আমি অবশ্যই তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবো। তোমার চিঠিটা এলিসকে এখুনি পড়তে দিই নি। কেননা, আমার আশঙ্কা, তোমাকে যে আমি মাঝখানে ডেকেছি, এতে সে অসন্তুষ্ট হতে পারে। আর তাতে পরিস্থিতি বিগড়াবে বই ভালো হবে না। তোমাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করে সে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা একটু অন্যরকম। আমি সুযোগ বুঝে সেটা তাকে পড়তে দেবো। আপাতত গ্রীটাকেও এই ব্যাপারে তুমি কিছু জানিও না। আমি আগেও তোমাকে বারণ করেছিলাম। আমি তোমার পরামর্শ অনুযায়ীই চলছি, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের, কিছুদিন এ সম্পর্কে কিছু লিখো না। তাতে ভুলবোঝাবুঝি বাড়বে, লাভ কিছুই হবে না। এখন এলিসের মনের বা অবস্থা তাতে আমার চিঠিও খুলে পড়ে ফেলতে পারে। ব্যাপারটা কিছুটা লাঘব হলেই আমি তোমাকে খবর দেবো। ততদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে কোনো চিঠি পাঠিও না। ব্যাপারটা কি জানো আর্থার, এখনও পর্যন্ত অন্ধকারেই বাস করছি আমরা। কতগুলো যে গেরো-ফাঁসগেরো রয়েছে তা আমার পক্ষে লিখে বয়ান করা সম্ভব নয়। সাক্ষাতেই সমস্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু সেটা এ-অবস্থায় সম্ভবপর নয়। দ্যাখো, গরমের ছুটিতে তোমার কাছে আসার চেষ্টা করবো। এলিস যেতে চাইলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। কানাইয়ের অভয়ারণ্য তোমার বাড়ির কাছেই রয়েছে। ওই টোপ গেলাতে পারবো বলে মনে হয়। আপাতত সেটা দিবাস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। প্রিয় আর্থার, এ তোমার আমর্শ আশাবাদিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমি আর্থার নই, এলিসও গ্রীটা নয়। না আমি ডি এইচ লরেন্সের শিষ্য, না তুমি একজন হিন্দু শূদ্র। ...তা সত্ত্বেও, তোমার তরফ থেকে যেটুকু ইমোশন্যাল সাপোর্ট আমি আশা করেছিলাম, তুমি নিঃসন্দেহে তা পূরণ করেছো, আর এরজন্যে আমি তোমার কাছে কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ সেটা লিখে বোঝাতে পারবো না। ব্যস্, তাহলে সবুর করো আমার প্রিয় বন্ধু, আর দ্যাখো তোমার প্রেসক্রিপশান কী জাদু ঘটায়! এ-চিঠির জবাব দেওয়ার দরকার নেই। আমার পরবর্তী চিঠির

জন্যে অপেক্ষা করো। কিন্তু এখন থেকেই নয়। কমপক্ষে মাস তিনেক তোমার চুপচাপ বসে থাকা উচিত।'...

স্যার,আপনি আবার এগুলোকে বানানো গালগল্প বলে মনে করছেন না তো? না। মোটেই না। যে-কথা আমি আগে বলেছি, কোনো রিলেশানের সত্যতাকে পচে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তাতে খানিকটা নুন-লঙ্কা মেশানো খুবই প্রয়োজনীয় আর এক্ষেত্রে আমি তাই করেছি। আর, ভালোই করেছি কি বলেন! আমার অনৃতভাষণে আর্থার এতো সন্তুষ্ট হলো যে সত্যিসত্যি সে আমার অনুরোধ রাখলো। পাক্কা তিনমাস সে চুপচাপ করে রইল, যা ওর মতো মুখহাবড়া লোকের পক্ষে অসম্ভব পরাক্রমই বলতে হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সে আমাকে একটা চিঠি পাঠালো—মাস চারেক বাদে—যাতে সে আমার সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুগ্রহপূর্বক নিমন্ত্রণ জানালো—গ্রীষ্মের ছুটিটা ওর সঙ্গে কাটানোর জন্যে। বলা বেশি, এটাই ছিল ওর শেষ চিঠি।

বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে, আর্থারের বদলে গ্রীটাই হয়তো আমার পক্ষে বেশি সহায়ক হতে পারে। কিন্তু আমার কখনও সাহসে কুলোয় নি। একবার তো ওর দোরগড়া পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। মন বলেছে, কোনো লাভ নেই। এতে বরং গ্রীটার সামনে আমি একেবারেই ভেঙে পড়বো। মিছিমিছি ওকেও কাঁদিয়ে ফেলবো। সাময়িক স্বস্তি পাওয়ার স্বার্থে ওকে আমার আর এলিসের মাঝখানে টেনে আনার পক্ষে আমি ছিলাম না। অবশ্যি, সত্যি বলতে, ওর সঙ্গে দেখা করার সুপ্ত কামনা নিয়েই এক্সকারশনের জন্যে আমি জেনেশুনে ঐ অঞ্চলটিকে বেছে নিয়েছিলাম। তখন কি আমি জানতাম যে, আর ক'টা মাস পরেই একটা দারুণ ওলটপালট ঘটে যাবে?

গ্রীটাকে নিজের ঝামেলায় জড়াতে না-চাওয়ার পেছনে আমার এই সংকোচবোধও কাজ করে থাকবে হয়তো যে, আমরা সেভাবে কখনও মিশিনি আর আমি নিজেও কখনও ওর কোনো কাজে লাগিনি। আজকাল নিজের লোকের একতরফা অনুগ্রহ নিতে চায় না মানুষ। কিন্তু এই একটি মাত্র কারণ হলেও না-হয় কথা ছিল। আসলে, দ্বিতীয় যে-কারণটি আরও বড়ো হয়ে উঠেছিল আমার কাছে, সেটি হলো, আমি এলিসকে ভয় পেতাম। গ্রীটাকে দু-চক্ষে দেখতে পরতো না সে। গ্রীটা মাত্র একবার, তাও একা কোনো কাজে এ-শহরে এসেছিল আর সোজা আমার বাসাতেই এসে উঠেছিল। দিন তিনেক ছিল ও আমাদের সঙ্গে। তখনই এলিসের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমার সঙ্গে গ্রীটার প্রভুত্বসুলভ ঘনিষ্ঠতাকে ও মেনে নিতে পারছে না। আসলে, এলিস এটাই মেনে নিতে রাজি ছিল না যে প্রাক্-বিবাহ জীবন বলেও আমার একটা নিজস্ব জীবন ছিল এবং তাতে এমন লোকও ছিল যাদের সঙ্গে আমার স্নেহ ও অধিকারের সম্পর্ক ছিল। স্নেহ আর অধিকারের যে অন্য রূপও

থাকতে পারে, সে যেন সেটাকেই নাকচ করতে চাইতো। নিজের এই মানসিকতার কারণেই ক্রমশ সকলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কেন জানি না, ওর মনে এই ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল যে আমি চারদিক থেকে অসম্বদ্ধ একাকী জীব একটা, ওর সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকে যে ওরই শর্তাধীন, বশংবদের মতো, যেখানে যেখানে ও আমাকে অনুমতি দেবে, সেখানে-সেখানে আমি সম্বদ্ধ হবো। আমি কি এলিসের সঙ্গে জোরাজুরি করেছি? ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ইতিহাসের কি সেই ভুলবোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না? আমি নিজেই কি ওকে বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরেও নিজের বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের সব ক'টি অঙ্গভঙ্গি জানিয়ে দিই নি? সবই কি তবে মিথ্যে ছিল? এও কি সত্যি নয় যে আমার যাবতীয় আচরণ এটাই জাহির করেছে যে ও আমার জীবনে আসার আগে আমি সব দিক থেকে অন্তরিত, অপূর্ণ ও বিকলেন্দ্রিয় ছিলাম আর ও আমার জীবনে প্রবেশ করে আমাকে সর্বাঙ্গ ও পূর্ণ করে তুলেছে?

কিন্তু সত্যিই তা যদি ঘটে থাকে, তবে তো ওকে খুশি হওয়া উচিত যে ওর সঙ্গে সংযুক্তির ফলেই আমার খণ্ডত্বে জোড়া লেগেছে আর রিক্ততায় সম্পূরণ ঘটেছে। নিজের এই টেকনিকে ওর নিজের সংলিপ্তি চোখে পড়েনি? তাহলে ও কী চেয়েছিল আমার কাছ থেকে? পূর্ণতার এ কোন্ সংজ্ঞা সে আরোপ করতে চেয়েছিল যাতে আমার অতীত, আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আমার সংস্কৃতি, আমার দেশ ইত্যাদির কোনো স্থানই ছিল না? তবে কি মাত্র আমার কুণ্ঠা আর অঙ্গবৈকল্য, আমার রিক্ততার প্রতিই অনুরক্ত ছিল সে? ওর আসক্তি ছিল শুধু আমার দাসত্বে, আর সেই হীন দাসত্বকেই নিজের মনের মতো আদলে গড়ে নিতে চেয়েছিল?

খাজুরাহে ওর প্রতিক্রিয়া দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। ছাড়া পাওয়ামাত্র যখন আমাকে বলেছিল, 'ইটস্ ডার্টি আর্ট অ্যাণ্ড ডার্টি রিলিজন!' ...প্রথম যখন কথাটা ওর মুখে শুনি, কেমন লেগেছিল আমার? ...সেই মুহূর্তে বিস্ময়ের তীব্র ঘোরে মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয়নি আমার। কেমন কাকতালীয় ঘটনা দেখুন, ঠিক সেই মুহূর্তেই আর্থার আর গ্রীটা আমাদের সামনে এসে আবির্ভূত হলো। রাতে খাওয়ার টেবিলে মজার ছলেই এলিসের মন্তব্যটা ওদের সামনে উল্লেখ করতেই, ওরা দু'জনে হাসাহাসি শুরু করে দিল। ফলে ব্যাপারটা আরও কেঁচিয়ে গেল। এলিসের মুখটা ভয়ানক শক্ত আর অস্বাভাবিক ঠেকছিল। গ্রীটা একজন আইরিশ মহিলা। আমার হামেশা অবাক ঠেকেছে যে আইরিশ আর ইংরেজরা স্বভাবের দিক থেকে কতখানি আলাদা! অথচ লণ্ডন আর ডাবলিনের মাজে ততখানি দূরত্বও নেই, হরিদ্বার থেকে বেনারস যতখানি। গ্রীটা আর আর্থার মিলে বেচারি

এলিসের দুর্গতির চূড়ান্ত করে তুলেছিল। আর্থার তো রীতিমত তর্কযুদ্ধে নেমে পড়েছিল...।

'বলো কি! ডি এইচ লরেন্স পড়েছো কখনও? ডার্টি কাকে বলে? রিলিজন কাকে বলে? এ তোমার পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের প্রতিই আড়ষ্ট তুমি। এ তোমার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হতেই পারে না, হেগেলের এঁটো খাচ্ছো তুমি।'

নিদারুণ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠেছিল এলিসের মুখটা। 'স্টপ ইট!'—চিৎকার করে উঠেছিল সে। একটা বিজেতার হাসি এক্সপ্রেস করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল আর্থার এবং অব্যাহত রেখেছিল সেই যুদ্ধ—'তুমি এখনও শিশুটি রয়ে গেছো এলিস। হয়তো তুমি এরকম শ'-শ' বই পড়েছো যা আমি পড়িনি। হতে পারে তোমার বুদ্ধির মান আমাদের সকলের চাইতে অনেক ওপরে। কিন্তু আর্ট আর রিলিজন বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার নেই, আর মডার্ন ইণ্টেলেক্ট তো একেবারেই নেই। লরেন্স এর নাম দিয়েছেন, নপুংসক প্রজ্ঞান। ক্লীব। বুঝেছো? সমস্তকিছুকে বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করো, প্রাক্-প্রত্যয় দিয়ে কোরো না। সেভাবে করলে কোনোকিছুই তোমার ভালো লাগবে না। শুধু খাজুরাহো কেন, ভারতবর্ষের সমস্ত শিল্প, যাবতীয় মন্দির, মায় গোটা ভারতবর্ষটাকেই ডার্টি বলে মনে হবে তোমার। তারপর, ভেবে দ্যাখো, আমাদের বেচারা কুন্দনের কী হাল হবে?'

উচ্চহাস্য করে উঠলো সে। গ্রীটা এবং আমিও। অবশ্য ভেতরে-ভেতরে আমি বেশ মাচকাফেরে পড়ে গিয়েছিলাম। এলিসের টিপ্পনী যতই বিস্মিত করে থাকুক আমাকে, আর্থারের শ্ববৃত্তিও আমার ভালো ঠেকেনি, দু-একবার আমি ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম। আসলে আমার আশঙ্কা ছিল, আর সেটা অমূলকও ছিল না যে আর্থার নিজে কখনও হেগেল পড়েনি অথচ এঁটো খাওয়ার কতাটা ফস্ করে বলে ফেললো কি করে? এ একেবারে জুলুমবাজি। এলিস সবচেয়ে বেশি আঘাত এই মন্তব্যেই পেয়েছে, সেটা বুঝে নিতে আমার অসুবিধে হয় না।

'কথাটা হলো আর্থার'—আমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বললাম, 'লরেন্সের হুমকি দিয়ে এলিসকে তুমি কাৎ করতে পারবে না। ওর কাছে লরেন্স ততটাই অপরিজ্ঞাত, যতটা তোমার কাছে হেগেল। তুমি এঁটো খাওয়ার কথা বলছো। আমাকে বলো, আজ পর্যন্ত কোন্ ভারতীয় পণ্ডিত হেগেলের অযৌক্তিক তত্ত্বকে ইউরোপের মাটিতে ধরাশায়ী করার মতো করে জোরালোভাবে খণ্ডাতে পেরেছেন? বলো।'

দাওয়াইটা কাজে লাগে। আর্থার হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। বিস্ফারিত নেত্রে সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রীটা সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'কুন্দন, তুমি যে একজন ভালো বন্ধু, সেটা জানা ছিল। কিন্তু যে তারচেয়েও ভালো স্বামী একজন, এটা ভাবিনি। কনগ্র্যাচুলেশন! সত্যিই চালাক তুমি, সাবাশ্, বৎস, সাবাশ্!'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো, এলিস বাদে। ওর মুখটা এখনও তেমনি কঠোর আর লাল হয়ে রয়েছে। আর্থার ওকে দ্রাবিত করার অভীপ্সায় আরেকটি তূণীর নিক্ষেপ করতে চইলো—'দ্যাখো এলিস, আমি স্কলার নই। ইন্টেলেকচুয়ালও নই। আমি...'

'সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।' এলিস মাঝপথেই ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'তবু, তবু এই আত্মজ্ঞান ডি এইচ লরেন্সের মালা জপা থেকে ক্ষান্ত করতে পারে না আপনাকে! তাই না? বলুন, কী বলতে চান আপনি? কিন্তু দোহাই ইশ্বরের, আপনার হিরোকে মাঝে টেনে আনবেন না, নিজের কথা বলুন। নিজের বহিরিন্দ্রিয় গুলোকে কাজে লাগান। প্রাক্-প্রত্যয় তো প্রাক্-প্রত্যয়ই, তা হেগেলের বেশেই আসুক আর লরেন্সের বেশেই আসুক...'

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে আর্থার মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে একটু টলে গেল। তারপর, নিজেকে সামলে, স্মিত হেসে বললো, 'বেশ, চলো। কিন্তু তুমি এটা তো স্বীকার করবে যে ইমোশন্যাল এডুকেশন বলেও একটা জিনিস আছে। আর সেটা ইন্টেলেকচুয়াল এডুকেশনের চেয়েও দামি আর দুর্লভ। আর, জেনে রাখো, শিল্পের প্রতি ন্যায় তারই পক্ষে করা সম্ভব, যে ইমোশন্যালি ম্যাচিওর।'

এলিস যুগপৎ তীক্ষ্ণ ও শীতল চাউনি তুলে ওর দিকে তাকায়,—'এই ইমোশন্যাল ম্যাচিউরিটি জিনিসটা কী, আমি জানি না। সেটা আপনি নিজের কাছেই রাখুন। আমি তো স্রেফ এটুকু বুঝি যে, যাই হোক না কেন, আপনার ছেলেমানুষী বুদ্ধির ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব নয়।

এ ছিল এক্কেবারে সরাসরি আর খাড়া আক্রমণ। আর্থারের প্রগলভতাই এহেন আক্রমণ হানার জন্যে প্ররোচিত করেছিল ওকে। এলিসের বলার ভঙ্গিটা আমার কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঠাণ্ডা আর ক্রুর মনে হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু আর্থারও, আমার সমঝদারি মোতবেক, একটু বেশিই তিড়িংবিড়িং করছিল।

'আমি এলিসের প্রতিক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র সম্মত নই।—' আমি বললাম, 'কিন্তু আর্থারের ফোঁকরদালালিও খুব-একটা সংগত মনে হচ্ছে না আমার। লরেন্সের ক্র্যাচে ভর রাখার, আমার মতে, কোনো প্রয়োজন নেই। মোদ্দা প্রশ্ন হলো, একটা সম্পূর্ণ সংস্কৃতিকে, একটা গোটা জীবন-দর্শনকে—যা পশ্চিমি সংস্কৃতি ও পশ্চিমি ধর্মদৃষ্টি থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, তাকে সততাপূর্বক ও সঠিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করা। তবেই তার সঙ্গে সংযুক্ত এই শিল্পের প্রতি ন্যায় করা সম্ভব। আমার মনে হয় না, পশ্চিম এটা করতে পেরেছে। মানুষের জ্ঞান আজ যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা লক্ষ্য করে বলতে পারি, সাংস্কৃতিক দম্ভ আজকের দিনে একেবারে অচল। আত্মরম্ভিতা মানুষের দৃষ্টিকে দূষিত করে তোলে। নিজেরই ধর্মকে, নিজেরই সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ-লীলার একমাত্র নির্ণায়ক বলে মনে করা নিছক

বুদ্ধি-বিরুদ্ধ গোঁয়ার্তুমি আর মানুষের এতদিনকার অর্জিত জ্ঞানসমূহের অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদেরকে এটাও মেনে নিতে হবে যে, আমরা ভারতীয়রাও নিজেদের যাবতীয়-কিছুকে এখনও পর্যন্ত ভালোভাবে জানতে পারিনি। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের নিদারুণ অভাব রয়েছে, আর, দু-একটি ব্যত্যয় ব্যতিরেকে আমাদের বুদ্ধিগত-আচরণকে খুব-একটা মৌলিক বলা চলে না। মানছি, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রের শিল্প অশ্লীল বা হীন নয়। তা কোনো ডার্টি রিলিজনেরও বাইপ্রোডাক্ট নয়, এলিস যেটা মনে করে। কিন্তু, আর্থার, এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে, সেটা আমাদের সংস্কৃতির সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন যুগের উৎকৃষ্টতম কৃতিত্বের নজিরও নয় মোটেই। এরচেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত, এরচেয়ে কয়েকগুণ বেশি সূক্ষ্ম শিল্প সাঁচী আর সারনাথ। কি বলো এলিস—?'

'আমি সাঁচীও দেখিনি, সারনাথও না। আমি আর কী বলতে পারি?—এলিসের কথায় সবাই হেসে উঠলো। আর্থার তৎক্ষণাৎ একটা টিপ্পনী ছুঁড়ে দিল, 'দেখেছো এলিস, তোমার স্বামী তোমার ভুলভাল কথাতেই কেমন প্রভাবিত হয়ে পড়ছে! এ ভালো লক্ষণ নয়, বুঝেছো?...সে আরও কিছু বলতে গেলে, গ্রীটা ওর মুখ চাপা দিয়ে বললো, 'থামো তো! তুমি পারলে সবাইকে নিজের মতো অযোগ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী বানিয়ে ফ্যালো। কম-সে-কম আমাদের প্রিয় কুন্দনকে তো মকুব করো।'... ওর বলার ভঙ্গিটা এমন নাটকীয় আর মজাদার ছিল যে আমরা না-হেসে পারিনি। মায়, এলিসও ঠোঁট চেপে হেসে উঠেছিল। সব কথা খাবার টেবিলেই চুকেবুকে গিয়েছিল।

কিন্তু, সত্যি কি তাই?... কথা শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আর ভাবনাটাই বা কী ছিল। সেটা নিজে তো শেষ হলোই না, উল্টে আমাদেরকেই শেষ করে দিল।

একটি অসম্পূর্ণ বিতর্ক

জোসেফ কাল সপরিবারে বিদায় নিয়েছে। ওকে ছাড়তে স্টেশনে গিয়েছিলাম। ট্রেন মাত্র চার ঘণ্টা লেট ছিল। মার্গারেট আর বাচ্চাগুলো ওয়েটিংরুমেই ঢলে পড়েছিল। আমি আর জোসেফ ঘণ্টা-তিনেক ওখানেই টহলদারি করি, ঐ প্লাটফর্মে, আর অনর্গল বকবক করি। জোসেফ বারবার বলছিল, ঢের রাত হয়েছে, এবার কেটে পড়ো। আমাকে তো জার্নি করতে হবে, তুমি কেন ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছো? আমার একদিকে ঘুম পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে ওর সঙ্গে কুঁজড়েমি করতেও দারুণ মজা পাচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন এক বিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটেছিল যা সাঙ্গ না-হওয়া-অব্দি অন্ততপক্ষে আমি রেয়াত পেতাম না। জোসেফও দারুণ মুডে

ছিল। এমন সুযোগ বারবার মেলে না। চার ঘণ্টা কিভাবে পেরিয়ে গেল জানতেও পারিনি। রাত আড়াইটা নাগাদ আমি যখন বাসায় ফিরি, মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছিল। আর ঘুমোতে পারিনি। সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঢোকে, এই ঐতিহাসিক মল্লযুদ্ধটাকে শূন্য কাগজের প্ল্যাটফর্মে আরও এক দফা প্রতিদারণ করে একটা চিরস্থায়ী স্মারক বানিয়ে ফেললে কেমন হয়! ফিরে এসে জোসেফ তাজ্জব ব'নে যাবে। ভুলচুক কিছু হয়ে থাকলে সেটারও রফা হয়ে যাবে, আবার এ-ধর্মযুদ্ধের কোনো ফয়সালা যদি হবার থাকে সেটাও পাঁচজনের সামনে হয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকবে।...

...স্যার, আপনি যখন আমার ডায়েরি পড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, আমি তখন অধ্যাহার্য হয়ে বসে থাকিনি। ঐ ফাঁকে স্থানীয় সংগ্রহশালায় গিয়ে দু-দুটো ব্যাখ্যান শুনে এসেছি। একটা ছিল 'সিন্ধু সভ্যতার লিপি', আর অন্যটা 'সাগরে নিমজ্জিত দ্বারকা' সংক্রান্ত। ...আমার ধারণা, পুরাতত্ত্ব-ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে। নেই? ...আরে, আপনি আবার কিরকম বিংশ শতাব্দীর মানুষ? আমি আপনাকে বলেছিলাম না পেশায় আমি একজন নৃতত্ত্ববিদ! তখন তো বেশ উৎসাহ আর কৌতূহল জাহির করেছিলেন। সেটা কি আমার ভ্রম ছিল? ...পুরাতত্ত্ব আর নৃতত্ত্বকে মাসতুতো-পিসতুতো ভাই মনে করতে পারেন। কিংবা, বলতে পারেন—মামা-ভাগ্নে। সামান্য ঐ যা-একটু উনিশ-বিশ আছে, অন্যথায় বর্তমানে উভয়েই যুবক। ফারাক যেটুকু তা হলো, মামা এখনও টেনেটুনে পাঁচ-ছ বছর চালিয়ে নেবে, কিন্তু ভাগনেটির ঠিকুজিতে অল্পায়ু-যোগ ক্ষণদ করা আছে। স্যার, আপনিই বলুন, আদিম প্রজাতির স্টক এখনও যেটুকু বেঁচেবর্তে রয়েছে তার অবলুপ্তি ঘটতে কতক্ষণ? গোণাগুণতি যে ক'টি বেঁচেবর্তে রয়েছে, সব তো আমাদের দেশে, তাও কদ্দিন টানবে? বস্তার, ঝাবুয়া আর ওড়িশা ঘুরে এসেছি। বার দুয়েক একা তিন-তিন মাস কাটিয়ে এসেছি। তৃতীয় আর চতুর্থ দফায় এলিসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম—ওর কাজ ছিল। পাঁচ বারের বার নিজের শ্যালককে নিয়ে গিয়েছিলাম, কোনো মতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরেছিলাম। বেশ কয়েকবার জার্মান, আর বার-কয়েক আলাদা আলাদা মার্কিন টিমের সঙ্গ দিয়েছি। আপনি বুঝলেন স্যার? ...বিদেশিদের সঙ্গে যাওয়া মানে লাভের অঙ্ক ডবল। এমন দিলদরিয়া মানুষ আপনি পাবেন কোথায় যারা মাস-খানেক সঙ্গ দানের বিনিময়ে আপনাকে ঘড়ি, টাইপরাইটার, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কার সব দান খয়রাত করে চলে যায়? ইদানিং অবশ্যি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি আমার রিসার্চ স্কলারদেরকেই পাঠিয়ে দিই।

এই দেশটাকে স্যার, নৃতত্ত্বের এক বিশাল খনি বলে মনে হয় আমার, যার দিকে গোটা পৃথিবী মুখিয়ে রয়েছে। কিন্তু কথাটা হলো, কোনো খনিই মহাপ্রলয়ের দিনটি পর্যন্ত চলতে পারে না। কয়লার খনিই চলে না, এ তো নিছক মানুষের

খনি। তাও একা নৃতত্ত্বশাস্ত্রীরা খোঁড়াখুঁড়ি করলেও না-হয় কথা ছিল। যেহেতু বিদ্যা. সুতরাং সবার কাজের জিনিস। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, এই নববিদ্যার প্রতিফল দেখে কতো লোকের চোখ খুলে গেছে, কতো লোকের অহংকার খর্ব করেছে এই বিদ্যা। আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে এ-লাইনে কাজ করছে এমন বহু লোককে জানি। তাঁদের মধ্যে আমার শ্বশুরমশাইও সামিল। যাঁর গোটা জীবনদর্শনটাই এই কাজের সূত্রে পাল্টে গেছে। এক বিচিত্র বস্তু মশাই! সে আপনার তামাম ধর্মকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, আর যাকে এদ্দিন মনুষ্যত্বের সেবাদাস আর প্রগতির মশালচি মনে করা হতো, সেই লোকটাকেই স্বার্থপর আর আততায়ী প্রমাণ করে দিতে পারে। সে একটি সম্পূর্ণ জাতিকে সামূহিক অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারে, আবার সেই সামূহিক দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত অনুসন্ধানের জন্যেও তাকে বাধ্য করতে পারে। সেই সামগ্রিক প্রায়শ্চিত্তটাকে আপনার কাছে কাজ চালানো গোছের, লাজ-বাঁচানো আর এক ধরনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে মনে হলে কী আর করা। আপনার কাছে আমারও সর্নির্বন্ধ অনুরোধ, তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন না যেন। বিদ্যার কীবা স্বার্থ, কী-বা পরমার্থ। দেখুন, ইংরেজরা তো আপনার কাছে হাঁটুর বয়সী। হাজার-হাজার বছর ধরে এ মুলুকে আপনারই শাসন অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু একবারও কি জানতে চেয়েছেন আপনার নিজের দেশের আদিবাসীদের কী হাল? ইংরেজরা আসামাত্র তাদেরকে আলিঙ্গনে বেঁধে নিল। এই হচ্ছে তফাত স্যার, একটা অনগ্রসর জাতি আর একটা উন্নত জাতির মধ্যে। শুধু জাতিই বা কেন, ধর্মেও, আপনি নিজেই দেখুন, থই মেলে কোথায়! একদিকে আপনি রয়েছেন, বলছেন, ধর্মরক্ষা করো, তবেই তোমাদের রক্ষা সম্ভব। কিন্তু একথাও বলতে ছাড়ছেন না যে ধর্মরক্ষার অর্থ প্রচার নয়। আমাদের ধর্ম অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায় আমাদের নয়। ...আর অন্যদিকে রয়েছে তারা, যাদের ধর্ম জ্ঞানের পথিকৃৎ। ধর্ম আসে আগে, জ্ঞান পেছুতে। ফৌজ আসে পরে, মিশনারি পৌঁছে যায় আগে। মশাই, তাদের ধর্মও প্রগতিশীল, তা আপনাআপনি চলে না। সত্যি. সাহসী আর ভীরুর মধ্যে তফাত এটাই।

সুতরাং আমি যে আপনাকে বলছিলাম, এই যে নৃবিজ্ঞানের খনি আমাদের দেশে রয়েছে, এটা খুব শিগ্‌গির নিঃশেষ হয়ে পড়বে। এমনি-এমনি বলিনি। আপনি কখনও অবুঝমাড়ে গিয়েছেন? জশপুর ঝাবুয়া পর্যন্ত গিয়েছেন নিশ্চয়ই। যান নি? তবে আপনি জানবেন কি করে আদিম উপজাতি কাদেরকে বলে? হাঁ, সে-সব ঠিক আছে, নাচ-গান কার না ভালো লাগে! সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাক, কিন্তু এই নাচ-গানের আচার তো বানিয়ে যাওয়াই যেতে পারে। তবে আর চিন্তা কিসের? আমাদের প্রত্যেকের বুক চিরে যদি দেখি, ওখানে এক-একজন আদিবাসীই তো বসে রয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে, এই যে আপনার কবিতা, এতেও এমন অনেককিছু থাকে

যা আমাদের অন্তর্মনে বসে-থাকা আদিবাসীটিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। কিংবা বলতে পারেন, এ-ভাবেই সে জাগে। ঠিক আছে মশাই, ঠিক আছে। এমনিতে ধর্মের মধ্যেও এমন অনেককিছু থাকে যা আমাদের আদিম চিন্তাভাবনাকেই নাড়া দেয় আর জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আপনি শুধু নিজের কথাই বলে যাবেন, অন্যের কথা শুনবেন না। তা কি হয়? আরে ধর্মও যে সন্তানের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগোয়। নয় কি? সেই তুকতাক আর প্রাকৃতিক ধর্ম দিয়েই কাজ যদি চলতো, তাহলে এই মাথা কুটে মরা কেন? সক্রেটিস, এরিস্টটল, অগাস্টিন, শংকর সবাই পণ্ডশ্রম করেছেন? মানুষকে চেতনা প্রদান করা হয়েছে কেন? আরে, মানুষের বুদ্ধিই যখন সবকিছুর শেকড় ধরে টান মারছে তখন ধর্ম আর কবিতাকে এমনিই ছেড়ে দেবে নাকি? সেই ধর্মেরই বা কী কাজ, চেতনার প্রথম বিস্ফোরণই কাঁপিয়ে দেয় যাকে? যুগের বাঘাবাঘা পণ্ডিতপ্রবররাই স্বীকার করেন না যাকে, সেই ধর্মের বাঁচা কি আর মরা কি? ঠিক তেমনি, এ তো নিছক কবিতা, কি লাভ এসব কবিতায়, পরম বুদ্ধিজীবীদের মাথায় চড়ার ক্ষমতা নেই যার! তাকে আপনি রক্ষা করেই বা কী করবেন?

অতএব মশাই, কথাটা হলো, মানুষ আজ যতদূর পৌঁছে গেছে, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার রয়েছে মাত্র দুটো উপায় ঃ হয় আপনি যেখানে যেমন যে-অবস্থায় রয়েছেন, তেমনি পড়ে থাকুন ; কারুর জীবনে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। সবাইকে স্ব-স্ব সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা ও সমঝদারি অনুযায়ী জীবনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে দিন। কিংবা, গোটা পৃথিবীটাকে দু'হাতে ধরে দুমড়ে-মুচড়ে এক করে দিন, সবাই চলে আসুক এক পতাকার নিচে। সবাই কবুল করুক একটাই ধর্ম। খিদে যখন আছে, সবারই খিদে পাবে, মৃত্যু যখন আছে, সবাই মরবে। সমস্ত সমস্যার আপনি এল-সি-এম বের করে দেখুন, এই পাবেন—ক্ষুধা আর মৃত্যু। চাইলে আপনি এতে সেক্সকেও জুড়ে দিতে পারেন, কিন্তু সেটা তো উভনিষ্ঠ, দুটোতেই রয়েছে, তাকে আলাদা করে ধরতে যাবেন কেন? এবার হয়তো আপনি বলবেন, কেন, অমরত্বও তো ক্ষুধা, তবে ক্ষুধা আর মৃত্যুকে আলাদা-আলাদা ধরছো কেন? রাখো শুধু ক্ষুধাকে। এতে সবার বুঝে নিতে সুবিধে হবে আর অহেতুক জটিলতাও থাকবে না। ...আপনার যুক্তিটা স্যার, আমাকে টানছে বটে, কিন্তু লাগসই মনে হচ্ছে না। আমি মরতে ভয় পাই, তাই খিদেও পায়—তাহলে শুধু মৃত্যুকে রাখবো না কেন? তাতে দুনিয়াকে এক করার ঝামেলাও থাকবে না—আর অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে না। উদরপূর্তি এমন-কিছু মুশকিল কাজ নয়, তবু মানুষ এত বিপদের ঝুঁকি নেয় কেন বলুন তো? কী সেটা, যার জন্যে মানুষ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়ে? সেটা প্রাণের চেয়েও প্রিয় আর দামি জিনিস নিশ্চয়ই। যা আমাদের ক্ষুধার উপশম ঘটায়, আর একই সঙ্গে দুটো অঙ্কুর জন্ম দেয়, সেটা

নিঃসন্দেহে আমাদের উপকৃত করে ; কিন্তু যে মৃত্যুভয়কে জয় করে আর আমাদের জন্যে তার পথ খুলে দেয়, সেও কি মানবজাতির উপকার করে না? মশাই, আমাদের খিদে পায় কেন? বেঁচে থাকার জন্যেই তো? কিন্তু আমরা বেঁচে আছি কেন? আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য আর অর্থ কী? আমি জন্মেছি আর জীবন যাপন করে এসেছি, এতে আমার কেরামতি কী? আমার পুরুষার্থ কী? আমি আগে জেনে নিই আমার বেঁচে থাকার অর্থ, তারপর অন্য কথা। তবে মশাই, সমস্ত ক্ষুধারই লক্ষ্য যদি এক, তবে এই বেঁচে থাকার অর্থ খোঁজার, তাকে জানার লক্ষ্য সেটাই হওয়া উচিত। তাই না? এখন আপনিই বলুন, যে-প্রয়োজন-সমূহের লক্ষ্য বিপরীতমুখী, সেগুলি সংখ্যার দিক থেকে দুটো হলো, না একটা? ঠিক এই কারণেই আমি ক্ষুধা আর মৃত্যুকে পৃথক-পৃথক রাখার সুপারিশ জানিয়েছি। এই যে ব্রত-উপবাস, রোজা এসব যদি ক্ষুধার দিক্‌পরিবর্তনের জন্যে না হয়, তবে কিসের জন্যে? আপনি বলতে পারেন, তাঁরা ছিলেন অগাচণ্ডী যাঁরা এসব বুজরুকি চালু করেছিলেন। কিন্তু সেইসমস্ত কোটি-কোটি অলবেড্ডেদের আপনি কী বলবেন যারা আমার আর আপনার মতো বুদ্ধিজীবীদের পশ্চাদানুসরণ না করে ঐ সব উজবুকদের পেছনে ছুটে মরছে? ঐসব মাথাপাগল লোকেরা এক পয়সার কারণে একুশ দিনের অনশন করে ফ্যালে আর সবার ঘুমের বারোটা বাজায়। আপনাকে আমি কারবালা নিয়ে যাচ্ছি না—বাইবেল বর্ণিত মরুস্থলে গিয়ে চল্লিশ দিন মালা জপতেও বলছি না একসময় বেশ কিছু মানুষ যা করেছিল শয়তানকে জয় করতে। আমি তো আপনাকে আপনারই যুগের রেফারেন্স দিচ্ছি। আপনি হিন্দু হোন বা খৃষ্টান, ইহুদি হোন বা মুসলমান, 'তপস্যা'র দ্বারা প্রভাবিত হবেন না তা হতেই পারে না। যা আমিও অনায়াসে করে ফেলতে পারি, সেটা অন্য কেউ করলে প্রভাবিত হবো কেন? যা আমি নিজে করতে পারি না, অথচ আমারই মতো হাড়মাংসের একটা লোক করে ফেলছে, সেই তো আমার শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে। সেটা আরও এই কারণে, যেহেতু সে কোনো ভুজুংভাজুং করছে না, শুধুমাত্র আমার ভেতর লুকিয়ে থাকা ধনভাণ্ডারের হদিশ দিচ্ছে, আমাকে আমারই ক্ষমতার হদিশ দিচ্ছে। আর মশাই, যে চৈতন্যের আপনি এত ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন, সেই চৈতন্য কি মানুষের তপস্যার ফল নয়? আপনার মতো সবাই যদি সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মাতো, এই মানুষের বাচ্চাটার দ্বারা একটা ইঁদুরকলও আবিষ্কার করা সম্ভব হতো কি? মশাই, হক কথাটা হলো, ক্ষুধা ও তার উপশমজনিত শান্তিও শেষপর্যন্ত তপস্যার দ্বারা যুক্ত হয়। অন্যথায় অন্ন আর আহার নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন? ধরে নিলাম এটা পাগলামি, কিন্তু অনশনক্লিষ্ট তপস্বীদের মধ্যেই এই পাগলামি বেশি করে চোখে পড়ে কেন?

আপাতত একদিকে রয়েছে এই বেঁচে থাকার লালসা আর অন্যদিকে এই অবুঝ বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তিলাভের লালসা। দুটিই লালসা, কিন্তু এদের

লক্ষ্য বিপরীতধর্মী। আপনি বলতে পারেন যে, বেঁচে থাকার লোভ তো সবার মধ্যেই থাকে। কিন্তু তা থেকে মুক্তিলাভের আকাঙক্ষা কেনো লালসা হলো? তা তো গোণাগুণতি কিছু ছিটিয়াল লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিতম কাল থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেক দেশে আর প্রত্যেক যুগে এহেন ছিটিয়াল লোকের জন্ম অব্যাহত থেকেছে কেন? আর সবচেয়ে বেশি বেঁচে থাকার লালসা যাদের মধ্যে রয়েছে, তারাই কি তাঁদেরকে সবচেয়ে বেশি পুজো করেনি?

কিন্তু আপনি বলছেন,...এখন আপনার কণ্ঠস্বরটা জোসেফ কিস্পোট্টার কণ্ঠস্বরের মতো লাগছে আমার,...যে, এ সবই অনগ্রসরতা আর অজ্ঞানতার পরিণাম। সবাই যখন এক-সমান লেখাপড়া শিখে ফেলবে, সেদিন এরকম মাথাপাগল লোকও থাকবে না, আর তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করার লোকেরও টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন কণ্টকাকীর্ণ রয়েছে, ভোগের সাধন সীমিত আর মুষ্টিমেয় মানুষের জন্যে সংরক্ষিত রয়েছে, ততদিন ভোগকে অস্বীকার করা সত্যিসত্যি সাহসের কাজ বলে মনে হবে আর সেই দুঃসাহসিক কাজটা ধনী-গরীব উভয়ের কাছেই চমকপ্রদ ঠেকবে। কিন্তু যেদিন জীবনের মজা সকলের কাছে সমান হয়ে যাবে, সবাই সবকিছু ভোগের সুযোগ পাবে, অন্ন-বস্ত্রের ভাগ-বাঁটোয়ারা সাঙ্গ হবে, সেদিন জীবনটাকে চমকপ্রদ বলে মনেই বা হবে কেন? কার কাছে মনে হবে? আর সেই জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পুরুষার্থ বা মোক্ষ বলে মনে হবে কেন? যখন পৃথিবীর সমস্ত দেশ আর সমস্ত সমুদায় এক হয়ে যাবে, প্রাকৃতিক সম্পত্তির ওপর সবার সমান অধিকার কায়েম হবে, মানুষ যখন অন্তরীক্ষকে নিজের বাড়ির উঠোন মনে করে পায়চারি করবে, শিশুরা যখন-তখন টেস্ট-টিউব বার করবে, ব্রহ্মাস্ত্রও ছুরিচাকুর মতো সবার পকেটে-পকেটে ঘুরবে—তখন ধর্ম আর আধ্যাত্মের করণীয়ই বা কী থাকবে? এগুলো একটা 'সামাজিক নৈতিকতা'র দোড়গড়া পর্যন্ত গিয়ে সংকুচিত হয়ে পড়বে না কি? কিন্তু সেখানেও এদের কী কাজ? মানুষকে নৈতিক-অনৈতিক তো প্রকৃতিই করে। আপনি দেখেন নি, ভুল বা খারাপ কাজ করার আগে বুদ্ধি কেমন ঔচিত্য-অনৌচিত্যের হিসেব কষে নেয়! এ যদি নৈতিকতা নয়, তবে কী? ধর্মচেতনা নয় তো কী? যে কাজটা করতে আমার এত লজ্জা, সেটা আমি করবই বা কেন? অতএব বুদ্ধিবলে যদি এসব কাজ হয়ে যায়, তবে এই ধর্ম-নিরপেক্ষ বুদ্ধির মাধ্যমে সেই সামাজিক নৈতিকতাও বেরিয়ে পড়বে, যা এইসমস্ত পরাক্রমের সুফল ভোগ করার উপযুক্ত করে তুলবে।

প্রশ্ন হলো স্যার, বুদ্ধিনৈতিক আচরণ করার জন্যে ধার্মিক আর আধ্যাত্মিক দর্শনের চোরাবালি মাড়ানোর প্রয়োজনই বা কী? একসময় হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন এতসব প্রগতির পর ওসবের কী কাজ? ওসব বড়জোর পুরাতাত্ত্বিক আর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হতে পারে, নয় কি? আপনি দেখতেই পাচ্ছেন,

অসহায়া প্রকৃতির ওপর এক-দেড়শো বছর শোষণ চালিয়ে আসার পরও স্বয়ং শোষকরাই আজ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। পরিবেশ সংরক্ষণের এই চিন্তাটাও নৃতত্ত্বের মতো একটা শাস্ত্র হয়ে উঠেছে না কি? ধর্ষণের মধ্যে থেকেও জ্ঞান জন্ম নিয়েছে। সেটা না-ই বা হলো আত্মজ্ঞান, জ্ঞান তো বটে। আত্মজ্ঞান আর অন্ধবিশ্বাসের মাঝখানের দাগটা এত সূক্ষ্ম যে আপনি শতশত বছর ও-দুটোকে একসঙ্গে গিলে আসছেন, তবু ফারকটা ধরতে পারেন নি। আপনি 'পর্বতের স্তনদায়িনী, সমুদ্রের বস্ত্রবাহিনী পৃথিবীর' পুজো করুন আর তার পায়ে পা দিয়ে ফেলেছেন বলে ক্ষমা চেয়ে মরুন তার কাছে। ...এতে হবেটা কি— এই তথাকথিত আত্মজ্ঞানে? এদিকে আপনি ক্ষমা ভিক্ষা করুন, আর ওদিকে সেই দ্বিগ্বিজয়ী জ্ঞান আপনার পায়ের তলায় পৃথিবীটাকেই দেবে না। মশাই, পৃথিবী হাজার ক্ষমা করুক, প্রশ্নটা তো ইতিহাসের। দিগ্বজয়ী ইতিহাসের। তার কাছে ক্ষমা চান, তার পুজো করুন, তারপর পৃথিবীকে তুষ্ট করার কথা ভাববেন। সংস্কৃতিকে উৎখাত করেই তো আমরা সংস্কৃতির আবিষ্কার আর বিস্তারের চিন্তা করতে পারি। প্রকৃতির সর্বনাশ করেই তো আমরা প্রকৃতির সঙ্গে বাস করা শিখতে পারি। ঠিক একই ভাবে এই সমাজ নামের জিনিসটাকেও বুঝুন—প্রথাগতভাবে বুঝুন, মিথ্যে আবেগে ঘুরপাক খাবেন না। শত-সহস্র বছর ধরে পৃথক-পৃথক ভাবে বেড়ে-ওঠা সমাজ যখন এই দিগ্বিজয়ী ইতিহাসের খাতিরেই হঠাৎ-হঠাৎই কাছাকাছি চলে আসবে, তখন বিস্ফোরণ তো একটা ঘটবেই, গণ্ডগোল তো বাধবেই। কিন্তু পাশাপাশি এটাও দেখুন যে তারা এভাবে পরস্পরের কাছাকাছি এলো কেন? তার পেছনে কোনো-না-কোনো যুক্তি তো অবশ্যই আছে। তাহলে সেই যুক্তিটাকে খুঁজে বের করুন আর বানিয়ে ফেলুন তারও একটা বিজ্ঞান। তারপর গোটা মানবসমাজ এক হতে কতক্ষণ! আপনার কাছে তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান আছে, তুলনামূলক কল্প-বিজ্ঞান আছে, কল্পনামূলক ধর্মবিজ্ঞান আছে আর এসবের চেয়েও বেশি, একটা অতুলনীয় অর্থশাস্ত্র আছে, যা এতদিনকার যাবতীয় বিজ্ঞানকে, সমস্ত জীবনদর্শনকে পঙ্গু বলে সপ্রমান করেছে। তবে দেরি কিসের? দ্বন্দ্ব কিসের?

স্যার, একটা জিনিস বড্ডো বেখাপ্পা লাগে যে মৃত্যু-সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত করতে পারেনি। এ-দৃশ্যও দারুণ বেদনাজনক আর অব্যক্ত-গোছের ঠেকে যে, একদিকে মানুষ অন্তরীক্ষে ঘোরাফেরা করছে আর অন্যদিকে ধর্মের নামে রকম-রকম সম্প্রদায় আর পন্থা খুঁজে বের করা হচ্ছে! ধর্মান্ধতায় দেশকে-দেশ দলকে-দল ভেসে যাচ্ছে। ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করার প্রয়াস এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, ঠিক সেখানেই বব্বর খালসা আর ভিণ্ডরওয়ালে, আর, আরো না-জানি কত-কী এই শতকের শেষ বছরগুলোতে জন্ম নিয়ে ফেলেছে!

মশাই, বাইবেলে লেখা আছে, পরমেশ্বরের ভয়ই চৈতন্যের সূচনা। কথাটা কতো সত্যি! মানেটা দাঁড়ালো এই যে সেটা সুচনাই, পরিসমাপ্তি নয়। এর মানে এটাই ধরে নেওয়া যায় না কি যে মানুষের চেতনা ক্রমশ যেভাবে বিকশিত হয়ে চলেছে, সেই ভয়ও তেমনি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে চলেছে? আর চেতনা যখন চরম অবস্থায় পৌঁছবে, সেই ভয় তো চিরতরে মুছে যাবেই, স্বয়ং পরমেশ্বরেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কথাটা কতো যুক্তিপূর্ণ ভেবে দেখুন! কিন্তু আমাদের জোসেফের বক্তব্য ঃ এ হলো অর্থের অনর্থ বের করা আর বাইবেলের উক্ত বচনটির অভিপ্রায় এ কদাপি নয়। কাল রাত্রে প্ল্যাটফর্মে আমাদের দু'জনের মধ্যে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল, তার শুরুটাই তো ছিল এই নিয়ে। আমি তো আপনাকে বলেছি যে প্রিয় জোসেফ কিভাবে আমার নির্জনবাস ভঙ্গ করে আর কিভাবে আমি এই বিঘ্নে ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে তিন-তিনটে দিন আর রাত আনন্দে মগ্ন থেকেছি। বিতর্কটা, যা আগেই বলেছি, বেশ রোচক আর জোরালো ছিল। নইলে ওর মধ্যে আমি নিজেকে মাখাতে যাবো কেন আর কেনই বা নিজের ঘুমের রফাদফা করে তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবো? ভেবে দেখুন, জোসেফ না-আসা অব্দি আমি কিভাবে ভুগর্ভে সমাধিমগ্ন হয়ে ছিলাম আর জেস্যেফ যেমনটা দেখলো, আমি ওকে দেখামাত্র এমনভাবে ধাঁ করে ছুটে গেলাম ওর দিকে, ক্ষুধার্ত কুকুর যেভাবে হাড়ের টুকরোর দিকে ছুটে যায়। আর বিশ্বাস করুন, জোসেফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও আমার নেই। সম্ভবত যে অসাধারণ আর অস্বাভাবিক পরিবেশে আমি বাস করছি—নিঃসন্দেহে স্বেচ্ছায়—সেই কারণেই, বরং সেই অসাধারণত্ব আর সেই অস্বাভাবিকতার উৎসবই আমি যাপন করছি এবং তা থেকে এই সংলাপ বা দ্বিরালাপ বা বাদানুবাদ, আপনি যা বলবেন, প্রসৃত হয়েছে। আমি যে এতক্ষণ ধরে নিজের অক্ষ ছেড়ে আপনার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে গোঁত্তা খেয়ে চলেছি, এখন আপনি বুঝেছেন নিশ্চয়ই, এর কারণ কী? এর কারণটা হলো ঐ জোসেফ কিস্পোট্টা, যে আমার যজ্ঞ পণ্ড করেছে, অথচ যার এতখানি অপকারের বিনিময়ে আমি তার প্রতি এতখানি কৃতজ্ঞ যে এই ঘরটা আমাকে কামড়ে খেতে উদ্যত। চোখের সামনে লট্‌কে থাকা ওর বাড়ির দরজাটা তালাটা নিজের মুখে আঁটা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার। ...চোখের সামনে অদ্ভুত কুয়াশার মতো ছেয়ে আসছে কিছু। এরকম অবস্থায় আপনাকে আমি সেই স্মারকটা দেখাই-বা কি করে? তাতে কষ্টটা বাড়বে বই কমনে না। আপশোস হচ্ছে বটে যে ওর সঙ্গে গোয়া চলে গেলাম না কেন! কিন্তু তাহলে এই এগ্রিমেণ্টের কী হতো, যেটা আপনার সঙ্গে করে রেখেছি? যাক-গে, আপনি খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিন,—আমিও সামান্য ঘুমিয়ে নিই, তারপর গল্প আগে বাড়ানোর চেষ্টা করবো। জয় হিন্দ!

বদান্য ঋক্ষের তরে

যাক, আপনি শেষ পর্যন্ত জাগলেন, কথা বললেন দেখে খুশি হলাম। সত্যি বলতে কি, আপনি যতক্ষণ নিঃসাড় হয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু আপনার নড়াচড়া শুরু হতেই, যে মুহূর্তে আপনি মুখ খুললেন, আমি ঘাবড়ে গেলাম...হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ হোঁচট লেগে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি যেভাবে।...আমাকে একমিনিট সামলে ওঠার সুযোগ দিন স্যার, আমি সব গুলিয়ে ফেলেছি। আপনার বিবিদিষার মোকাবিলা আমি করবো, আলবাৎ করবো, কিন্তু দোহাই আপনার, একটু ধৈর্য ধরুন। পুরো মাসটা তো আমি আপনার সঙ্গেই কাটাবো, তাড়াহুড়োর কি আছে! তাড়া যেটুকু, আমারই থাকার কথা। আপনি দিব্যি মেজাজে খাওয়া-দাওয়া করুন, ঘুমোন আর সব ভুলে যান। বান্দা আপনার খিদমতে সব সময় হাজির। বেশ তো! তাহলে চলুন...

'আমি কে?'—আপনি জানতে চেয়েছিলেন না? আমি হলাম স্যার, সেই লোকটি, যার হাতে রয়েছে মাত্র একত্রিশ দিনের মেয়াদ—এই রোমহর্ষক প্রশ্নটির নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্যে। আপনিও, কী কুক্ষণে, এই একই প্রশ্ন করে বসলেন স্যার! আরে, এই প্রশ্নটাই তো আমার সামনে খড়্গ হয়ে ঝুলছে। টলাবার কত চেষ্টা করছি, টলছেই না। ভোলানো-ফুসলানোর কত চেষ্টা করছি, তবু নড়বার নাম নেই। যেমনকার তেমনি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, জরিপ করছে যেন! এখন তো এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর রফা-দফা না-করা অব্দি আমার মরণ নেই।... আর, বেঁচে থাকার জন্যে আমার হাতে রয়েছে মাত্র একত্রিশ দিন।...মাত্র একত্রিশ দিন হুজুর!... আর, আজ থেকে ঠিক বত্রিশ দিনের মাথায় আমাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হবে।... আপনি এই হতভাগার হাত থেকে ছাড়া পাবেন কি করে স্যার, এই উদ্ভট দুনিয়ায় স্বয়ং ঈশ্বর মনে রাখেনি যাকে...নারী কর্তৃক পরিত্যক্ত যে...! কেন-জানি না, আজ নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে হঠাৎ দারুণ ভালো লাগছে আমার!...এ-কণ্ঠস্বর স্বয়ং আমার, নিজের অভিশপ্ত কণ্ঠস্বর, যা এই প্রথম শুনছি আমি। এসব প্রাত্যহিকের রেওয়াজি আর মেকি শব্দ নয়, যেগুলোর কোনো মানে থাকে না, নিছক ফাঁকা যে-সব শব্দ। ...আমি এখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ঐ শব্দরাজিকে আর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবো না। কিন্তু এই স্থিরতা বা নৈশ্চিত্য এলো কোত্থেকে? আমি তো বছরের পর বছর একটা খোঁড়লে পড়েছিলাম! এখন যা-কিছু ভাবছি, যা-কিছু করছি সেগুলো যে আমিই ভাবছি, আমিই করছি সেটা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ব্যাপারগুলো সমস্তই যেন আমার বাইরে ঘটে চলেছে, ভেতরটা এখনও তেমনি পক্ষাঘাতে নিথর হয়েই থেকে গেছে যেন! সমস্ত উপার্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটুকু অর্জন করেছিলাম, সবই বোধহয় জলে গেল।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবি সত্যিসত্যি কি এ আমার জীবন এতদিন ধরে আমি যাপন করেছি যা এবং অনর্থক করেছি? আপনাকে আর কি বলবো! ...মাস ফুরোতে চললো, আমি নিজেরই বাড়ির একটা কামরায় কয়েদ করে রেখেছি নিজেকে। কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই...; আপনি জেনে অবাক হবেন, গত এক মাসে একটা লোকেরও মুখ দেখিনি আমি। লোকে ভাবছে, আমি কাশ্মীর চলে গিয়েছি—যেখানে আমার জনা-কয়েক বন্ধু আর সহযোগী এখনও রয়েছে। ওদেরকে বলেছি, আমি একটা 'থিসিস' লিখছি, ওটা লেখা শেষ হলেই ওদের সঙ্গে দেখা করবো। কী সেই থিসিস? আমি নিজেই জানি না। আমার মাথায় ছিল শুধু, চটজল্দি কিছু-একটা করতে হবে, লইলে আমি মারা যাবো। আমি আসলে নিজের সঙ্গ পেতে চেয়েছিলাম—সত্যিকারের এবং সর্বাঙ্গীণ সঙ্গ। আপনি কখনও এভাবে নিজের সঙ্গে কাটিয়েছেন? কাটান নি তো? তাহলে নিন, আপনার সেবায়...

আমি একেবারে শুরু থেকে শুরু করছি। ...প্রথম ক'টা দিন দম বন্ধ হয়ে আসে। ক্বচিৎ নিজেকে দেখেই আঁৎকে উঠতে হয়। কিন্তু আস্তে-আস্তে একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। আপনি নিজেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে কত তাড়াতাড়ি আপনি এই অন্তরায়ণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আর সেটা আপনার ভালও লাগতে শুরু করেছে! তারপর আপনার মধ্যে অদ্ভুত-অদ্ভুত অনুভূতি জাগা শুরু হবে আর সেসব আপনার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আপনার প্রাত্যহিকের কামনা-বাসনা-লালসাগুলি ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়বে...বন্ধুবান্ধবের লালসা, বাজার বা পার্কে বেড়াবার লালসা, লোকের মুখ দেখতে চাওয়ার লালসা, বই বিতর্ক ভালো মদের নেশা...এসব ফালতু আর অসার বলে মনে হবে আপনার। লালাসামাত্রকেই তুচ্ছ আর লজ্জাকর বস্তু বলে মনে হবে আপনার। ...কিন্তু এই মোহমুক্তি, এই গভীর বৈরাগ্যানুভূতি সপ্তাহ খানেকের বেশি স্থায়ী হবে না। তারপর আবার সেই আততি, ছটফটানি ছেঁকে ধরবে আপনাকে। আপনার ভেতরে যে সাধারণ মানুষ রয়েছে সেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে আর নিজের খেল্ দেখানো শুরু করবে। ঝিমুনি মধ্যরাতে আপনি সন্তর্পণে নিজের ফোকর থেকে বেরোবেন আর শূন্য সড়কের মাঝবরাবর গিয়ে সটান শুয়ে পড়বেন। হঠাৎ-হঠাৎই আপনি ভ্রমমুক্ত হয়ে জানতে পারবেন যে আপনি নিজেকে যা ভেবেছিলেন, আপনি আদৌ তা নন। আপনি পৃথিবীর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নরপুঙ্গবটি নন, গোটা ব্রহ্মাণ্ড যাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়। ...এই যে তারকাখচিত আকাশটিকে আপনি দেখছেন, সেটা আসলে আপনার মাথার ওপরে নেই, আছে আপনার মাথার ভেতরে। ...সহসা আপনার চারপাশের প্রতি এবং আপনার নিজের প্রতিও অদ্ভুত এক মমতায় ভরে উঠবে আপনার মন। ভরে উঠবে শুধু নয়, ভরে উঠে উপচেও পড়বে। ক্বচিৎ আপনার অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়াতে পারে, যখন বাতাস আর গাছপালার মধ্যে

ফারাক করাটা আপনার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়বে। এমনকি ঘন অন্ধকারকেও উজ্জ্বল আলো বলে মনে হবে আপনার আর ভরদুপুরে আপনার চোখের সামনে ছেয়ে আসবে গভীর অন্ধকার। মাঝেমধ্যে আতঙ্ক জাগবে মনে, এভাবে আপনি পাগল হয়ে পড়ছেন না তো!

এবং এক প্রত্যূষে ঘুম ভেঙে উঠে সহসা আবিষ্কার করবেন, আপনি আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়ের জীবনেই ফিরে এসেছেন। অভিশঙ্কা ছেঁকে ধরবে আপনাকে। সমস্ত জিনিস সেই আগের মতই থেকে গেছে আর আপনিও নিছক সেই আপনি থেকে গেছেন! সেই মুহূর্তে আপনি জানতে পারবেন—গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা প্রহেলিকা মাত্র—আপনার ক্ষুধিত-তৃষিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা রচিত একটি ইন্দ্রজাল—যাতে কোথাও কোনো তত্ত্ব নেই। না, শুধু ইন্দ্রিয় বলছি কেন, আপনার বুদ্ধিরও তাতে যোগসাজশ ছিল—আপনার উপহাস করার অভীপ্সায়। আপনি আসলে একজন কাপুরুষ আর নপুংসক। হামেশা বাস্তবকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা আপনার। আপনার যাবতীয় জ্ঞান এঁটো, সকড়ি, আর গোটা জীবনটা একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রহসন। মিথ্যা আর আবিলতার পঙ্কে আপনি আপাদমস্তক নিমজ্জিত।...

এহেন দুরবস্থার পর, স্বভাবতই, আপনার মস্তিষ্কেও এর ভয়ানক কুপ্রভাব পড়বে। কিন্তু এতেও একটা লাভ রয়েছে। এই স্টেজে এসে আপনি যদি একেবারে টেঁসে না যান, ভেতরে-ভেতরে সজাগ আর সচেতন থাকতে পারেন, তাহলে টের পাবেন বহুকাল ধরে যে-জিনিসটা আপনার মধ্যে জীবন্মৃতের মতো বেহুঁশ শুয়ে ছিল, যা মাঝেমধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ক্ষণিকের জন্যে আপনার মধ্যে ছটফটানি এনে আবার নেতিয়ে পড়তো,—সেটা এখন, হঠাৎ জেগে উঠেছে আপনার মধ্যে, তার নড়াচড়া টের পাবেন আপনি। এমনিতে সেটা বিশেষ একটা-কিছু নয়, একটা আন্তর-গোছের উদ্রাব—একটা বিরস আর বিবর্ণ গোছের উতরোল, শোরগোল—যা প্রথমটায় আপনি নিজেই ঠিক ধরতে পারবেন না। কান পেতে শুনলে তবেই শোনা যাবে সেই মৃদু কোলাহল এবং তার পরপরই টের পাবেন যে আপনার ভেতরে একটা নাটকের জন্ম ঘটেছে। একটু থেমে ঐ বিড়ম্বনাটিকে লক্ষ্য করুন স্যার! যতদিন আপনি আপনার জীবনটাকে তোয়াজ করে এসেছেন, ওর যা-কিছু বায়নাক্কা সব সামাল দিয়েছেন, রাস্তায় পড়ে থাকা যা-কিছু ওকে দিয়েছেন সে লোভাতুর হাতে গ্রহণ করেছে সব—ততদিন পর্যন্ত আপনি জানতে পারেন নি ; আর যেইমাত্র এই গোক্ষুরি ছাড়লেন, পৃথিবীটাকে পাছা দেখিয়ে গিয়ে ঢুকলেন একটা চোরাঘরে, হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মতো জানতে পারলেন আপনি একজন উঁচুদরের অভিনেতা। এভাবে, আচম্বিতে নিজের একটা বিশেষ ক্ষমতা জেনে নেওয়ার পর জীবনটাকে আপনি আবার নতুন করে চিনতে শুরু করলেন আর বিক্ষিপ্ত-বিস্মৃত সূত্রগুলি আবার একে-একে জোড়া লাগতে সুরু করলো। এই প্রথম আপনি একটা আতিক্ত স্বাদ অনুভব করবেন যা ইতিপূর্বে অনুভব করেন নি। ব্যাপারটায় আপনি নিজেই তাজ্জব

বনে যাবেন। এরপর দেখবেন একটা নতুন মজা। এই নাটক ছেড়ে রোজকার সেই ম্যাদামারা জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছেই করবে না আপনার। উপরন্তু ফেরার চিন্তা মাথায় এলেই ভয়ে শিউরে উঠবেন আপনি। যেন এটাই আপনার আসল জীবন...আর যাকে জীবন মনে করে দারুণ আগ্রহ-সহকারে আর নির্লজ্জভাবে গত তিরিশ বছর ধরে যাপন করে এসেছেন, সেটা আসলে জীবনই নয়, সেটা মৃত্যু। সুতরাং আপনার মনে হতেই পারে, এই জীবনের মেয়াদ ফুরতে-না-ফুরতেই আপনাকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হবে। আর, আপনাকে শূলে চড়াবে কে? এই আপনার চির-পরিচিত নিত্য জগত আর নিত্যকার জীবন। এই জল্লাদের মনে, জনাবে-আলি, দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। সে ব্যাটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বধাস্ত্র-হাতে আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তার হাত থেকে আপনার নিস্তার নেই। নিস্তারের যে-ক'টা পথ খোলা ছিল, সব ক'টা তো আপনি নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এ এক এমন দ্বন্দ্বযুদ্ধ যা আপনার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এতে আপনার প্রাণাত্যয় সুনিশ্চিত। তাই তো, তার চিন্তা-মাত্র মাথায় এলে গভীর নিদ্রার মধ্যেও নেংটি ইঁদুরের মতো চিঁচি করে ওঠেন আপনি।

আপনি বেশ মজে গিয়েছেন। তাই না? এর চেয়ে মজাদার গল্প আর কী হতে পারে যে, একজন সুস্থ-সবল প্রফেসার পুরো-একটা মাস নিজেকে একটা ঘরে কয়েদ করে রেখেছে! ...আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুটির সময় আমাদের কলোনি একরকম উজাড় হয়ে যায়। ...ঘরে একটা মাত্র জানালা, সেটা পেছনের উঠোনের দিকে খোলে। সদর দরজায় তালা ঝোলানো রয়েছে। ছ-সাতদিন পরপর এক-আধবার গভীর রাতে আমি সন্তর্পণে বাথরুমের পথ দিয়ে বের হই আর এমন-সব রাস্তায় ঘুরে বেড়াই যেগুলোতে চেনাজানা লোকের মুখোমুখি হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। সপ্তার পর সপ্তা এভাবে অনবচ্ছিন্ন একাকীত্ব ভোগ! এর চেয়ে বেশি বিলাসিতা আর কী? আমাকে দেখে আপনার ঈর্ষা হয় না? ...হাসছেন! হাসুন, মশাই, হাসুন! আমার তাতে আর তফাত ঘটবে কি? ...কিন্তু তফাৎ যে ঘটবে, কেন ঘটবে না? আপনিই যে আমার ধর্মযাজক। আপনিই আমার ধর্মাবতার। আমার মামলার শুনানি তো আপনার ওপরই নির্ভর করছে। আর ঐ শুনানির ওপরই কি আমার যাবতীয় সংশয় নির্ভর করছে না? আমি আপনাকে হাসাতেও আসিনি, কাঁদাতেও আসিনি। আমি তো কেবল আপনার অন্তরিস্থ কল্পনাশক্তিকে প্ররোচিত করতে এসেছি। ...এই রসাতল থেকে আমার সমুদ্ধারের যদি কোনো সম্ভাবনা থেকে থাকে, তা বুঝি এভাবেই ঘটবে। আপনি বুঝলেন স্যার,—আমি আপনার কল্পনাশক্তির ওপর ভসরা করেই আপনার শরণে এসেছি। এই প্রত্যয় নিয়েই প্রথম দেখার পর আপনাকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করেছি আর নিজের নিঃশুল্ক সেবা অর্পণ করেছি। আর আপনিও কিন্তু আমাকে একেবারে খেদিয়ে দেন নি—এতেই কি আপনার ভালোমানুষী প্রকট হয়ে পড়েনি?

বাই দ্য ওয়ে, স্যার, কালকের খবরের কাগজটা আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই। আপনার চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই, প্রথম পাতাতেই একটা সচিত্র বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছে, পাঞ্জাবে একটা গোটা পরিবারকে ভূমিদাস করে রাখা হয়েছিল পনেরো বছর ধরে। একজন সংসদ-সদস্য তাদেরকে মুক্ত করিয়েছেন। নিছক একটা রিপোর্ট। কিন্তু যে -ছবিটি তার সঙ্গে ছাপা হয়েছে, সেটা চোখে পড়তেই আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছিল। ওদের মধ্যে একজনের চেহারা হু-ব-হু আমার বাবার চেহারা বলে মনে হয়েছে আমার। আপনাকে গোপন করে লাভ নেই। আমার গোটা শরীরটা একটা পাতার মতো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল, হৃদরোগে আক্রান্ত হলে যেমন হয়। সত্যিসত্যি কি আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম? ...জানি-না কী ঘটেছিল...আমার সেই মুহূর্তে বুদ্ধিলোপ পেয়েছিল। এরকমটা তো আগে কখনও ঘটেনি! অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর যখন সংবিৎ ফিরে পেলাম, নিজেকে আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। দেখি যে, আমি পাগলের মতো আপনার দরজার করাঘাত করে চলেছি। ...স্যার, আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি কে? তখন আমি জবাব দেবো কি, নিজেই জানি না কে আমি! এতক্ষণে জানতে পেরেছি, আমি কে? আমি স্যার একজন গোলাম, নিছক গোলাম। আর আপনার মতো আমিও এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে এই অতিসামান্য নিষ্কর্ষে পৌঁছতে আমার এতগুলো বছর লেগে গেল! ...আপনার এটুকু জানা আছে নিশ্চয়ই যে একজন গোলামের চেয়ে বেশি স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে না। এহেন গোলামের কাহিনীও আপনার ঢের পড়া আছে হয়তো, যারা এমন-এমন সব কামাল দেখিয়েছে যা তাদের মালিকরাও করতে পারতেন না। হনুমানের গল্পটা আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই, সমুদ্র-লঙ্ঘন করেছিল যে। ঐ দাসানুদাস গোলামটি অমন পরাক্রম দেখালো কেমন করে, সেটা জানেন? ...ও কিছু নয় স্যার, হনুমানের চমৎকারিত্বের নেপথ্যে ছিল এক বৃদ্ধ ঋক্ষ, যার নাম জামবন্ত। তারই প্ররোচনায়, তারই উসকানি পেয়ে হনুমানের স্নায়ুতে টান লাগে। তার আগে অব্দি হনুমান তার সঙ্গী বানরদের সঙ্গে মুখ লট্‌কেই বসে ছিল। যে-মুহূর্তে জামবন্ত তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তুমি কে, ঐ ক্ষুদ্র বানর ঝটিতে উঠে দাঁড়ালো আর এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে গেল। আপনি সার, মুখ বেঁকাচ্ছেন? ...আপনি কি এটা সম্ভব বলে মানতে পারছেন না যে, এই যে আপনার সেবক বসে আছে আপনার সামনে, তার ভেতরেও এমনি এক সরল সাদাসিধা বানরই হয়তো বসে আছে, যা ভেতরে-ভেতরে, না-জানি কতো বছর ধরে, সেই অজানা এক বদান্য ঋক্ষের তরে হাহুতাশ করে মরছে! ...আর মশাই, কে বলতে পারে, ঐ প্রতীক্ষা হয়তো সাঙ্গ হবার মুখে—আর, যাঁর তরে এই এষণা. সেই মহাত্মা মহানুভব ঋক্ষ ঠিক এই মুহূর্তে আমার সম্মুখেই উপবিষ্ট রয়েছেন হয়তো—হুজুরের বেশে! ...আপনি কি বলেন স্যার?

দ্বিতীয় পর্ব

সত্যনারায়ণ-কথা

টাম্‌টার নির্গলিতার্থ

ড. কে এল তামতা, ফেলো অব ইণ্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব অ্যানথ্রপলজিস্টস্...
ওরফে কুন্দন টাম্‌টা, পিতা নারায়ণলাল টাম্‌টা, তালুক ডুমৌড়া, অনন্তপুর...।

...নদী যেমন নিজের নাম ও আকৃতি পরিহার করে সাগরে বিলীন হয়, তেমনি, হ্যাঁ ঠিক তেমনি প্রাজ্ঞ-পুরুষ নাম-কলেবরের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যপুরুষে বিলীন হয়ে যান।

..নদীর দ্বারা নিরন্তর সম্পূরিত হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র যেমন সদা প্রশান্ত ও অচঞ্চল থাকে, ঠিক তেমনি যে-ব্যক্তির সমস্ত কামনা ও ভোগস্পৃহা তার নিজের মধ্যে লীন হয়ে যায়, সেই ব্যক্তিই শান্তির সন্ধান পায়, কামনাবাসনাময় মানুষ তা পায় না।...

...ঐ তত্ত্বের পর ও অপর, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় স্বরূপের জ্ঞানলাভের পরই হৃদগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং যাবতীয় কর্মের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে।...

... ...

'ঠ মানে ঠাঠেরা। মাস্টারমশাই, ঠাঠেরা মানে কী?'

'টাম্‌টা মানে জানিস? ...আরে, কেমন টাম্‌টা রে তুই, টাম্‌টা মানে জানিস না। বলে দে রে এই টাম্‌টাকে, টাম্‌টা মানে কি!'

'যারা তামার বাসন তৈরি করে, মাস্টারমশাই। তার মানে এরাও ঠাঠেরা?'

'ক মানে কুন্দন। ঠ মানে ঠাঠেরা।'

'মাস্টারমশাই, যারা সোনার কাজ করে তাদেরকে বলে সোনার, লোহার কাজ করে যারা তারা লোহার, তবে তামার কাজ করে যারা তাদেরকে তামার বলে না কেন?'

'বসে পড় গে যা। ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করিস না। এবার হয়তো জানতে চাইবি, তামার কাজ করে যারা তাদেরকে যখন টাম্‌টা বলা হয়, তখন চামড়ার কাজ করে যারা চাদেরকে চামচা বলে না কেন? ...গর্দভ কোথাকার! ...কার ছেলে রে তুই?'

'আজ্ঞে, আমার বাবা উকীল।'

'ও-হো! তাই তো বলি...তুইও গাধা, দেখছি, উকীল হবি। চল্, এবার ড-এ আয় দেখি। তুই আবার লিখতে শুরু করলি কি রে? ...দ্যাখা তো।'

ঠাঠেরা ওরফে কুন্দন উঠে দাঁড়ালো। স্লেটটা মাস্টারমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিল। স্লেট হাতে মাস্টারমশাই জোরে-জোরে পড়তে শুরু করলেন,...'ঠ মানে ঠাঠেরা মানে ঠগ মানে ঠাকুর মানে ঠাট্টা মানে ঠোক্কর মানে ঠাঁট মানে ঠনঠন মানে ঠাসাঠাসি মানে ঠ্যাঙা...আরে! সাব্বাশ! তোরা সব দেখেছিস! কুন্দন কতো শব্দ জানে! তোদের বাপেরাও বোধহয় পারবে না। কেন রে, তোকে এখন থেকেই লিখতে শিখিয়ে দিল কে?'

'বাবা।' কুন্দন বুক ফুলিয়ে ছেলেটির দিকে তাকায়, যে ওকে ঠাঠেরা বলেছিল। কিন্তু 'ঠ'-এর পর তো 'ড' এসে পড়ে, আর...? কাল এই ছেলেটাই ওকে 'ডোম' বলেছিল। ঝলমলে বাল্বের আলো হঠাৎ যেন নিভু-নিভু হয়ে আসে।

রামদত্ত মাস্টারের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ। ওর মুখটা ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। 'কী করেন রে তোর বাবা?'

'আমার বাবা পাটোয়ার ছিলেন। এখন ছেড়ে দিয়েছেন'...অনেক কষ্টে মাত্র এটুকু বলতে পারলো সে। সভয়ে চোখ তুলে দেখলো, মাস্টারমশাইয়ের মুখে এক মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ হাসি কিছু বলতে চায় যেন। 'আরে, তুই নারাণের ছেলে? তাই তো বলি...। তোর বাবাকে তো আমি চিনি। তোর বাবা পাটোয়ারির কাজটা ছাড়লো কেন, তুই জানিস? ...জানিস না তো? ...বাবাকেই জিজ্ঞেস করিস। যা, বসে পড়। এবার 'ড' বার কর। ড-এ ডমরু।'

কুন্দনের বুক দুরুদুরু করছে। ড-এ ডমরু এসে পড়লো যখন, ডোম আসতে কতক্ষণ? ইস্কুলে নাম লেখানোর পর এমন একটা দিনও কাটেনি যেদিন ওকে 'ডোম' বলে কেউ রাগায় নি। কুন্দন ভালো করেই জানে কীর্তিটা কার। বাবার কথা মনঃপুত হয় না ওর। বাবা বলেন, তুই রাগিস কেন? যে বলে তাকে বলতে দে। তুই হাত চালিয়ে তো দেখলি, উল্টে ওরাই তোকে মারধোর করলো, সবাই তোর খেলাপে গেল। তাতে কী লাভ হলো? ওরা এবার তোকে রোজ-রোজ রাগাবে। না-শোনার ভান করলে দেখতিস কেউ আর তোর পেছনে লাগছে না।

মাথা নিচু করে কুন্দন 'ড' পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করে। মাস্টারমশাই সেই কখন থেকে 'ড' নিয়ে পড়ে রয়েছেন। ভয়ের চোটে সে কিছু লিখতেও পারছে না, অথচ 'ড' দিয়ে কতো শব্দই না সে লিখে ফেলতে পারে! ডর, ডাণ্ডা, ডবলরুটি, ডাহ, ডংকা, ডাকাত...ডরপোক...

'মাস্টারমশাই, আমি বলবো?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো পূরণ পাণ্ডে। কুন্দনের বুক ধড়ফড় করে উঠলো।

'মাস্টারমশাই, ড মানে ডুমৌড়া'...

কুন্দনের চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রামদত্ত মাস্টারের গর্জন ভেসে আসে ওর কানে, 'ডুমৌড়া আবার কী রে?'

'ডুমৌড়া, যেখানে ডোম বাস করে।'

একটি চাপা-হাসির গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে ক্লাসে। এ আবার কেমন মাস্টার, ডুমৌড়ার মানে জিজ্ঞেস করছেন!

'মাস্টারমশাই, কুন্দন কাঁদছে।...

'কেন রে, তোর আবার কী হলো? রামদত্ত মাস্টার ওর মাথার সামনে এসে দাঁড়ান। কুন্দন বলবে কি করে যে ওর কী হয়েছে। ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

'আরে, বলবি তো, নাকি কেঁদেই এক-শা করবি?' রামদত্ত মাস্টার একটু রেগে যান। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পূরণ পাণ্ডের ওপর, ওকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন,—'ড-এ ডুমৌড়া বলবি আর? আমাকে ভাষা শেখাবি? থাকিস কোথায় তুই?'

'পাঁণ্ডেপুরায়...' পূরণ পাণ্ডে তোতলায়।

'হুঁঃ!' রামদত্ত মাস্টার কানটা ছেড়ে দিয়ে চটাস করে একটা থাপ্পড় কষে দেন ওর, গালে, 'বেরো, আমার ক্লাস থেকে বেরো—'

ক্লাসে নিস্তব্ধতা। কুন্দনের ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে শুধু। রামদত্ত মাস্টার আবার গর্জে উঠলেন, 'এবার তুই চুপ করবি?'

কান্না থামাতেই চাইছিল কুন্দন, কিন্তু ফোঁপানি আটকাতে পারছে না কিছুতেই। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল ওর। ঘণ্টা পড়লে প্রাণ বাঁচে। পড়ার সময়ও তো হয়ে এসেছে।

'আরে গাধা, তোর নাম কুন্দন না? নামটার অন্তত লাজ রাখ। কুন্দন মানে জানিস?'

কুন্দন আস্তে আস্তে মাথা তোলে, ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ে। 'কুন্দনের'ব মানেটা তো সে জানে না—কিন্তু খারাপ লাগে না নামটা, ভালোই লাগে। শুধু সঙ্গে জোড়া এই 'টাম্‌টা' ওর ঘোর অপছন্দ। কুন্দন যোশী বা কুন্দন সিং হলে কতো ভালো হতো!

'ধেৎ...এতো শব্দ জানিস অথচ নিজের নামের অর্থ জানিস না? উল্লুক কাঁহিকা! কুন্দন মানে সোনা, বুঝেছিস? খাঁটি সোনা। খাঁটি সোনা হয়ে তুই কাঁদিস? চুপ কর। ফের কখনও কাঁদিস যদি এমন ধোলাই লাগাবো, মনে থাকবে।'

ঘণ্টা পড়লো...ছেলেরা ছোটাছুটি করছে...কিন্তু কুন্দনের নড়ার নাম নেই। রামদত্ত মাস্টার বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওর পিঠে একটা ঘুঁষি মারেন, 'যা পালা এবার, বসে-বসে কী ভাবছিস?'

কুন্দন হয়তো বসে-বসে কিছুই ভাবছিল না। কিন্তু হাঁটতে-হাঁটতে কিছু নিশ্চয়ই চিন্তা করছিল। কী চিন্তা করছিল সে?

এমনিতে, কাল কী খেয়েছিল, কাল কী ঘটেছিল, এসব কিছুই মনে রাখতে পারে না সে। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা এখনও নিখুঁত মনে আছে ওর। যেন এইমাত্র ঘটলো। ড. কে এল তামতা, ফেলো ইণ্টারন্যাশন্যালের কসম কবুল করে বলে দিতে পারি, কুন্দন কী চিন্তা করছিল?

কুন্দন আলবাৎ ওর এই সদ্য-আবিষ্কৃত নাম-মাহাত্ম্য নিয়ে চিন্তা করছিল এবং টাম্‌টার লাঙ্গুল থেকে নিষ্কৃতি কীভাবে পাওয়া যায়, সেটা নিয়েও। সে চাইছিল, যে-করেই হোক ওর এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত নামের সঙ্গে জুড়ে থাকুক শুধু সোনাটা—কাঁচা সোনাটাই থাকুক লেগে, আর তামাটা পড়ুক খসে।

এবং সেই রাত্তিরেই মোটামুটি একটা সমাধানও মিলে গিয়েছিল ওর এই সমস্যার। বাবা জিন্দাবাদ! বাবাই ওকে বললেন, সোনার সঙ্গে খানিকটা তামা মিশলে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা খাদহীন সোনা কোনো কাজের নয়, তাতে কিঞ্চিৎ তামা মিশেল দিলে তবেই তা কাজে লাগে। স্বর্ণমুদ্রাই হোক, আর স্বর্ণালঙ্কার—তামার ভেজাল না দিলে গড়া সম্ভব নয়।

বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই এক-চিল্‌তে নিদানই বেশ মনঃপূত হয়েছিল ওর। কিন্তু তবু সে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বাবা, সোনা সোনাই থাকল, তাতে ক্ষতি কি? ওতে খাদ ঢেলে মোহর বানানোর কী দরকার? গয়না বানানোর কী দরকার?'

'দরকার আছে।' বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'সোনা নিয়ে লোকে গিলবে? এতো চিত্র-বিচিত্র মানুষ, এতো পশুপাখি, এইসমস্ত গাছপালা এসব এলো কোত্থেকে? ভগবান এসব গড়ে দিয়েছেন। এখন তুই যদি জানতে চাস, এতসব গড়ার কী প্রয়োজন ছিল, নিজের মাটি নিজের কাছেই থাকতে দিতেন। আরে, মাটি যখন রয়েছে, সেটা দিয়ে কিছু বানানোর জন্যেই তো। শুধু-শুধু ফেলে রাখবার জন্যে তো আর নয়।'

'কিন্তু বাবা, ভগবানকেও নিজের মাটিতে তামা ভেজাল দিতে হয় নাকি?'

'তা নয়তো কি? দেখছিস না কতো রকম-রকম মূর্তি গড়েছেন ভগবান! একই মায়ের পেটের ভাইরাও দেখতে একরকম হয় না।'

এ আবার কোনো কথা হলো? এতে ভেজালের প্রয়োজনটা তো ঠিক বোঝা গেল না!

'তবে, ভগবানকেও আলাদা-আলাদা জিনিস গড়ার জন্যে মাটিতে আলাদা-আলাদা জিনিস মেশাতে হয় নিশ্চয়ই! সবাইকে একই তামা দিয়ে গড়লে সবাই একরকম দেখতে হতো না?'

বাবা নিরুত্তর। বোঝা যায়, তিনি একটু ফাঁপরে পড়েছেন।

'তুই আমার মাথা খেলি দেখছি! প্রশ্ন এটা নয় যে কী মেশানো হচ্ছে। জিনিসটা তৈরি হলো কিনা, প্রশ্ন সেটাই। কাজের জিনিস হলো কিনা, সেটাই বড়ো কথা। কাজের জিনিস না হলে এক কড়িও মূল্য নেই। সোনা হলেই বা। মূল্য বোঝা যায় তখুনি, যখন কিছু হয়ে ওঠে, লোকের কাজে লাগে। বুঝলি?'

ও-হো, এই ব্যাপার! সোনা হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সোনাকে সোনা হতে হবে। আর, সোনা হওয়া মানে তাতে এমন-কিছু মেশানো যা তাকে কাজের করে তুলবে। মানে, শুধু চমক থাকলেই হলো না, তা কাজে লাগা চাই।

নিছক ছ'বছরের বালকের পক্ষে এতদূর এগোনো সম্ভব ছিল? প্রফেসার তামতা, যিনি একজন নৃতত্ত্ববিদ্, তিনি হয়তো এর জবাব দিতে পারেন। তাঁকে প্রশ্ন করুন, টাম্‌টা থেকে তামতা অব্দি পৌঁছতে ক'বছর লাগলো?

'তুমি পাটোয়ারির কাজটা ছাড়লে কেন?'

একটা নিস্তব্ধতা। না, নিস্তব্ধতা ঠিক নয়, একটা দুর্বলপ্রায় পরিশ্রান্ত কণ্ঠস্বরও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল বই কি, কিছু ঠাহর করার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট।

'কুন্দন, তোর ওসবে কি মতলব রে? যা, গিয়ে নিজের পড়া মুখস্ত কর।'

'মাস্টারমশাই বলছিলেন তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।'

'মাস্টারমশাই কে? রামদত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করিস।'

এ আবার কি! মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন? বলতে না চাও, বোলো না। রাগ করো কেন? ...কিন্তু, রাগ তো বাবার আসেই না! তবে?

তবে আবার কি? কচু। দু-চার বছর দম কষে থাক, সবুর কর। এখন সব প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখ, শুধু পড়া মুখস্ত করে যা, পড়া। প্রশ্ন কিভাবে করতে হয়, তুই এখনও শিখিস নি। যখন শিখবি, তখন দেখা যাবে।

কিন্তু পড়ার মতো হলে তবেই তো মুখস্ত করার প্রশ্ন ওঠে! এসব মুখস্ত করার দরকারই নেই, আপনা-আপনি মুখস্ত হয়ে যায়।

কোই বাত নেই। আসল পড়া তো পড়ান ওকে নারায়ণলাল টাম্‌টা, দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারে, শুয়ে-শুয়ে। তখন না থাকে প্রশ্ন, না থাকে পড়া। থাকে শুধু গল্প—অন্তহীন কৌতূহলে ভরা এক একটি গল্প। আর, গল্পগুলো যেখানে গিয়ে জমা হয়, তা কখনও ম্লান হবার নয়। সেই কথাসরিৎসাগরের একমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটে নিদ্রায় এবং সে সেই ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে, বয়ে চলে। তারপর একসময় হঠাৎ পাখিদের কলরব ভেসে আসে ওর কানে। ...তারপর ভোরের আলো জরুরী বাজারের ঢাল বেয়ে সোজা পৌঁছে যায় ইস্কুলে।

ভাবিস না তুই রামী

কুন্দন হাঁপাচ্ছে। ইস্কুলে এখন হাফটাইম। এই ফাঁকে বাবাকে জানিয়ে আসা দরকার। গোটা ইস্কুলে ফার্স্ট হওয়া, চাট্টিখানি কথা?

'এতো মিহি সুতো বোধহয় তোর বাপেও কাটে না। ওর কাছেই শিখেছিস, তুই না?' স্কুলসুদ্ধ ছেলের সামনে রামদত্ত মাস্টার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। এখনও টনটন করছে।

'তুই বুঝতে চাইছিস না কেন রামী!' ...বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছেই থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কুন্দনকে। বাবা-মায়ের সম্বাদ চলছে। ওঁদের কথা চালাচালি শুনতে কুন্দনের বেশ মজা লাগে। আড়াল থেকে শোনে। এ সুযোগও হাতছাড়া হয় কেন।

'তকলি কাটলে পেট ভরবে নাকি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভরবে। কিন্তু তোর না। তোর পেট তো ভরা। তকলি হলো তাদের জন্যে যাদের পেট কখনও ভরে না। বুঝেছিস?'

'হয়েছে, হয়েছে। চুলোয় যাক তোমার তকলি। ভারি এসেছো পেট ভরানেওয়ালা।'

'কি বললি? একসময় তুইই না সারাদিন চরকা নিয়ে বসে থাকতিস। আমার চেয়েও ভালো কাটতিস। আর এখন...আমার তকলিটাকেই আগুন লাগাবি বলছিস? তোর এমন মতি এলো কোত্থেকে রে রামী? বেচারি তকলিটা তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে শুনি...'

'মই দেয়নি বলছো কি করে? তকলিটা ঘরে ঢোকার পর থেকে কোন্ ভালোটা হয়েছে শুনি? আমি তোমার মনরক্ষা করতে চেয়েছিলাম শুধু। তখন কি ছাই বুঝেছি এই তোমার লক্ষণ হয়ে দাঁড়াবে! বাবা তো তখুনি বলে দিয়েছিল...'

'উনি আবার কী বলে দিয়েছিলেন রে? বলছিস না কেন? আজকাল দেখছি খুব বাবা-বাবা করছিস। যখন দেখ তখুনি বাবা। ঢের হয়েছে। তুই একটা কাজ কর, ওখানে গিয়ে থাক গে যা। আমিও হরিদ্বারে গিয়ে নামজপ করি। এই খটাখটি আর ভালো লাগছে না। ঠিক আছে?'

'ঠিকই বলেছো। আর তবে বাকিটাই কী রইলো?'

কুন্দনের হাঁপুনি এতক্ষণে থিতিয়ে পড়েছে। হাফ-টাইমের ঘণ্টি পড়লো বলে। ওর বাল্য-চেতনা আর সময়-চেতনা একসঙ্গে হঠাৎ জেগে উঠে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। বলের মতো সটান গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জনের মাঝখানে...'বাবা! মা! আমি ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছি, দ্যাখো।'

'কিসে রে?'—মা ওকে আদর করে কাছে টেনে নেন। বাবা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, অবিচল। আগেই খবরটা জেনে গেছেন নাকি?

'তকলি কাটায়। রামদত্ত মাস্টার মশাই বলছিলেন এর চেয়ে মিহি সুতো কাটতে তোর বাবাও পারেন না বোধহয়। উনিই শিখিয়েছেন নাকি? আমি বলেছি, হ্যাঁ'।

'আরে!' বাবা হো-হো করে হেসে ওঠেন। আঙুল দেখিয়ে মাকে বলেন, 'এবার বল কুন্দনের মা। এবার আগুনে পোড়া দেখি তকলিটাকে।'...

'হুঃ। ভারি আমার তকলিওয়ালা।' মা বিড়বিড় করতে-করতে হেঁশেলে গিয়ে ঢোকেন, 'বিরাট কীর্তি করে এসেছে যেন! আমি বলি, কী এমন বড়ো পুরস্কার নিয়ে এসেছে শুনি?'

'কুন্দন!' পৃথ্বীরাজ কাপুরের মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন বাবা। নাটকের সংলাপ বলার মতো করে বলেন, 'তুই প্রাইজ পেয়েছিস, বড়ো আনন্দের কথা। কিন্তু এবার তুই এই তকলিটাকে উনুনে ফেলে দে। নইলে তোর মা তোকে আর আমাকে দুজনকেই বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'কেন বাবা?' কুন্দনও নাটকে মজা পায়—'তকলি পছন্দ নয় কেন মায়ের?'

'আমি জানবো কি করে, ওকেই জিজ্ঞেস কর। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দে দেখি। আমি যদি তোকে বলি খুব সুতো কাট, রোজ তিন ঘণ্টা ধরে কাট। আর তোর মা যদি বলে, ব্যাটা, ভালো চাস তো তকলিটাকে জ্বালিয়ে দে। তবে তুই কার কথা শুনবি? আমার, না তোর মায়ের?'

মহা ফ্যাসাদ! এ নাটক তো ধাতে সইলো না। কুন্দন আড়চোখে দেখলো, মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে। ওঁর ভরসা বুঝি কুন্দন ওঁর দিকেই ঝুঁকবে।

কুন্দন মাথা তুলে এবার বাবার দিকে তাকায়। বাবা কোমরে হাত রেখে এমনভাবে দাঁড়িয়ে, মল্লযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত যেন। ও হাসি চাপতে পারে না। জোরে হেসে উঠে দু'হাত ওপরে তুলে চোঁ করে ছুটে পালিয়ে গেল। যেতে-যেতে ওর কানে ঢোকে—'তুই ভাবিস না রামী। ছেলে তোর কথাই শুনবে।'

কংগ্রেসের দপ্তর

কুন্দনের দাদুর বাড়িতে প্রতিদিন নিয়মিত বৈঠক বসে। বাজার আর পাড়ার কেষ্টবিষ্টু লোকেরা আড্ডা মারতে জড়ো হন। কংগ্রেস কমিটির আপিসটা অন্যখানে, সদর রাস্তার ধারে, কিন্তু তবু কেন জানি পাড়ার নচ্ছার ছেলেগুলো দাদুর কোঠাবাড়িটিকেই আখ্যা দিয়েছে 'কংগ্রেসের দপ্তর'। বেশ রোয়াবদার মানুষও বটে কুন্দনের দাদু ঃ লম্বা আর সুঠাম, সুপুরুষ চেহারা, ইংরেজদের মতো টকটকে ফর্সা গায়ের রং, আর গালদুটো এমন লাল আর চকচকে — লোকে আড়ালে তাঁকে

'টমেটো' বলে ডাকে। টাম্‌টাকে টমেটো বানিয়ে দিয়েছে। আরও কতো লোককে কতো-কী নাম দিয়েছে খোদায় মালুম। বাবার এসব পছন্দ নয়। বাবা বলেন, এই হলো এ-শহরের লোকেদের সবচেয়ে বাজে অভ্যেস। কুন্দন কিন্তু দারুণ মজা পায়। ভাগ্যিস বাবাকে এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো পদবী দেওয়া হয়নি। কি করে বেঁচে রয়েছেন! এমনিতে দু-একজন 'নেতাজী' বলা শুরু করেছে বটে, কিন্তু নেতাজী তো আর গাল নয়!

কুন্দনের মাসিরাও কম যান না। মায়ের স্বভাবটাই একটু অন্যরকম। খিচকিচ-কিচকিচ করবেন, কিন্তু কাজ করবেন বাবার কথামতো। পেটে বিদ্যে বলতে কিছু নেই, কিন্তু পড়শি মহিলাদের সামনে বাবার কথাগুলোকেই সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে বলবেন, যেন ওঁর নিজের কথা। কুন্দন শুনে থ' মেরে যায়। কি করে যে মুখস্থ করেন!... বাবার গলাটা যত মিঠে আর নরম, মায়ের কণ্ঠস্বরটা ততই কর্কশ। কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে বেশ মজা পান বাবা। মা যত বেশি রাগ করেন, বাবা তত বেশি খোঁচা দেন। অন্য কারোকে নয়, ব্যাস্, শুধু মাকে তাতিয়েই মজা পান উনি। মায়ের প্রতি ভালোবাসাও কম নয়, কতো আদর করে ডাকেন! পাড়ার অন্য কোনো লোককে এতো আদর করে ডাকেন না বাবা।

একসময় মামা-মাসিরা এ-বাড়িতে আসতেন। এখন আসেন না। কেন আসেন না? মাও আগের মত অত ঘন-ঘন হাভেলি যান না। কুন্দন বোঝে, বাবা সবার চোখের বালি। বাবা ওঁদের সঙ্গে খুব-একটা কথা বলেন না, তাই। এমনিতে সুরেনমামাকে একটু পছন্দ করেন, আর সুরেনমামাও তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু কেন-জানি-না, বাবা আর দাদুর মধ্যে একটা আঁকচাআঁকচি রয়ে গেছে গোড়া থেকেই। বাবা একবার 'লোকসত্তা' বলে একটা পেপার বার করেলেন, তার মাস ছ'য়েকের মধ্যে দাদু বের করা শুরু করে দিলেন 'অধিকার' নামে আরেকটা খবরের কাগজ। 'লোকসত্তা'য় তো সেই কবেই তালা ঝুলেছে, কিন্তু 'অধিকার' এখনও প্রকাশ পেয়ে চলেছে নিয়মিত। মা বলেন, ওতেই সমস্ত টাকাপয়সা ডুবেছে, সেই থেকে আমরা গরীব হয়ে গেছি। মায়ের মুখেই শোনা যে দাদুই বাবার সমস্ত পুঁজি লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা পরিষ্কার 'না' করে দেন। কেননা, মা বলেন, তোর বাবা আর দাদুর মধ্যে মতের মিল নেই। এই মতের মিল জিনিসটা আর কি? ইদানিং দাদুও বাবার মতো খদ্দর পরে ঘোরাঘুরি শুরু করেছেন, আর কংগ্রেসী বনে গেছেন। তবে? মা বলেন, তোর বাবা গান্ধীজীর ভক্ত, আর দাদু গান্ধীজীর নাম শুনে ক্ষেপে যান। ক্ষেপে যান কেন? কেননা, তাঁর মতে জাতপাতের বিভেদ ভেঙে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদেরকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন নি। প্রশ্নটা শুনে বাবা হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন। হাসি থামিয়ে পরে বলেছিলেন, তোর দাদু আগে যেমন ইংরেজদের ভক্ত ছিলেন, এখন তেমনি

কংগ্রেসের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। আসলে কারও ভক্ত নন, উনি শুধু নিজের ভক্ত। এতে মা-র মুখ গোমড়া হয়ে যায়। কুন্দনেরও এটা ভালো লাগেনি। মায়ের বাবার বদনাম মায়ের সামনে করাটা কি ঠিক? কী যে মজা পান উনি! কিন্তু মা-ও কম বিচিত্র নন। সেদিন দাদু না-জানি কী বলে ফেলেছিলেন,... বাপ্-রে, মা এমন ক্ষেপে গেলেন, এমন তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলেন যে দাদুর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা হয়েছিল।...হ্যাঁ, মনে পড়েছে..., এ সেই সময়কার কথা যখন কাগজটা বন্ধ হবার মুখে আর বাবা কদিন ধরে বাড়িতে মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। বাইরে বেরনো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দাদু কী যেন বলেছিলেন মাকে, বাবার কথাই কিছু বলে থাকবেন হয়তো,—ব্যাস, মা গোটা হাভেলি তোলপাড় করে তুললেন। কুন্দন তখন ওখানেই ছিল। কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল সে!—মাকে ওভাবে গাঁকগাঁক করে চ্যাঁচাতে শুনে! মায়ের বিলাপ শুনে মনে হচ্ছিল, কেউ যেন মারা গেছে! কুন্দনের স্পষ্ট মনে আছে, এই ঘটনার পর মা বেশ কয়েকমাস হাভেলি যান নি। মামার বিয়েতে গিয়েছিলেন কোনমতে। তাও, বাবা সাধাসাধি করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই। সুরেন মামাকে তো ধমক দিয়েই ভাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হাভেলি যেতে কুন্দনের এই জন্যেই ভালো লাগে যেহেতু ওখানে একটা ছোট খাটো মাঠ রয়েছে যাতে মামার আর মামাদের ছেলেরা তো ক্রিকেট খেলেই, পাড়ার ছেলেরাও ওদের সঙ্গে খেলতে আসে। ডুমৌড়ার ছেলেগুলোর মতো নোংরা নয় হাভেলি বাজারের ছেলেরা। ডুমৌড়ার ছেলেদের খেলার মাঠও নেই আর বাজারপাড়ার ছেলেরা ওদেরকে খেলায় না। ডুমৌড়ার ছেলেদের সঙ্গে গলির মধ্যে কঞ্চি দিয়ে সোর্ড খেলতে কুন্দনের মোটেই ভালো লাগে না। বাবা একসময় ডুমৌড়ার বাচ্চাদের জন্যে খেলার মাঠ তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। হুকুমসিং পালনীকে তাঁর ধানজমিটা দেওয়ার জন্যে রাজিও করিয়ে নিয়েছিলেন। তবু তিনি শেষপর্যন্ত বেঁকে বসলেন কেন? এই জন্যে বেঁকে বসলেন যেহেতু বাবা নিজের কাগজে পালনী কাকুর দুধের ডেয়ারিটা সম্পর্কে উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছিলেন। এরজন্যে মা-রও রাগ হয়েছিল। কাজটা হওয়ার মুখে পণ্ড করে দিয়ে কী লাভ হলো? খবরের কাগজ কি এইজন্যেই বার করে? বাবা বললেন, 'তবে কেন বার করে শুনি? সমাজের শত্রুদের রুখতেই তো সংবাদপত্র। সংবাদপত্রই মুখ বুজে থাকে যদি, তবে সমাজকে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখাবে কে? তোর বাবা শেখাবেন? নাকি ঐ 'রাজপুত'-অলারা শেখাবেন? আমি ব্রাহ্মণদের জন্যে কাগজ করছি, নাকি বেনেদের জন্যে? খবরের কাগজের কোনো জাত হয় না, বুঝেছিস? কাগজ জুড়বার জন্যে, ভাঙবার জন্যে নয়। বুঝেছিস?' 'খুব জুড়লে তুমি'—মা-র এই মন্তব্য শুনে বাবা হেসে ওঠেন। মা টাকাপয়সা জুড়তেই শিখেছেন নাকি!

হাভেলিতে সব জাতের ছেলেরাই খেলতে আসে। এত কাছে এত ভালো মাঠ আর কোথায়? তাছাড়া মামাদের চেহারাও ডোমদের মতো নয়। ওঁদেরকে ব্রাহ্মণদের চেয়েও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর সভ্যভব্য লাগে। লেখাপড়াও করেছেন প্রচুর। কিন্তু আড়ালে বাজারপাড়ার লোকেরা ওঁদেরকে ডোম বলেই মনে করে হয়তো। তবে হ্যাঁ, মুখের ওপর বলার হিম্মত নেই কারও। তবে যেসব ডোমের দালানবাড়ি থাকে, আর নেতা-টেতা ব'নে যায় যারা, বা ডিগ্রি-প্রতিপত্তি থাকে, তাদেরকে ডোম বলে গণ্য করা হয় না? তারা উঁচুজাতের লোক হয়ে ওঠে? কিন্তু বাবার কাছেও তো দালান-টালান, ডিগ্রি-টিগ্রি কিছুই নেই। তবু, কুন্দন দেখে, লোকে তাঁকে বেশ সমীহ করে। কেউ 'ডোম' বলে দেখুক তো তাঁকে!

দাদুর বৈঠকখানা কুন্দনের বেশ মজাদার ঠেকে। বাবা তার নাম দিয়েছেন, 'থিয়েটার'। থিয়েটারই তো। বাবা অবশ্য রসিকতার ছলে কথাটা বলেছেন। বাবা নিজেও মাঝেমধ্যে ঐ মজলিসে গিয়ে বসতেন—সে বহুদিন আগের কথা। ভৈরবথান থেকে ফিরতিপথে হাভেলি পড়ে। ইদানিং যাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধ করে দিয়েছেন কেন? কত ধরনের লোক ওখানে আড্ডা মারতে আসে! ...উকীল, মাস্টার, দোকানদার, নেতা সব ধরনের মানুষ। 'রাজপুতে'র সম্পাদক তো ফি দিনই আসেন। 'কেসরী'র জোশি মশাই আর 'সোবিয়েত ল্যাণ্ডে'র পন্তজীকেও মাঝেমধ্যে দেখা যায়। আর্যসমাজের সেই স্বামীজীও, যিনি অনাথআশ্রম পরিচালনা করেন আর মিষ্টি-মিষ্টি ওষুধের বড়ি দেন বাচ্চাদেরকে খেতে। আগে এঁদের মধ্যে বেশ কজন আমাদের বাড়িতেও আসতেন। 'রাজপুত'-অলা আর 'কেসরী'-অলাও। এখন ফিরেও চান না কেউ। মা তো দেখতে পেলেই মুখখিস্তি করে ওঠেন—'এই মুখপোড়া হিংসুটেগুলোই কাজটাকে বন্ধ করিয়ে দিলে'...। বন্ধ করিয়ে ওদের লাভটা কী হলো? বাবার সঙ্গে ওদের কী-এমন শত্রুতা ছিল?

নেতা হিসেবে দাদুর অনেক পসার। কিন্তু দাদু ডুমৌড়ার দিকে ফিরেও তাকান না, এখানে আসা তো দূরের। অথচ বাবা রাতদিন এই ডুমৌড়া নিয়েই পড়ে রয়েছেন। কোনোখানে একরত্তি আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখলে নিজের হাতে তুলে নিয়ে দূরে ফেলে আসেন। লজ্জাবশত লোকেরাও সাফ-সাফাই শুরু করে দেন। আগে বস্তিতে একটা মদভাঁটি ছিল, বাবা সেটা বন্ধ করিয়ে দেন। নইলে সবসময় দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকতো। বাজে লোকের আড্ডা ছিল সেটা। বাবা ওর বিগিউল বাজাটাই বন্ধ করে দিলেন। ওখানে এখন খাটা পায়খানা বসিয়েছেন, মাঠে-ঘাটে যাওয়ার বদলে সেখানে একসঙ্গে অনেকজন পাশাপাশি বসে প্রাকৃতিক কাজ সারতে পারে। ল্যাম্পবাতির ব্যবস্থাও বাবাই করিয়েছেন। ইস্কুলও খুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সাহায্যের জন্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। কিন্তু বাবার কেরদানি তাতে মার খায়নি। রামদত্ত মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রেখেছেন। দু'জনের মধ্যে সারাক্ষণ ইস্কুলের

আলোচনাই হয়। রামদত্ত মাস্টারমশাই রিটায়ার হওয়ার মুখে। তারপর বাবার ইস্কুল চালাবেন। মা বলেন, দাদু এলাহাবাদে থেকে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তা শুনে সেটা মনে হয় না। ওঁর চেয়ে বাবাই ভালো কথা বলতে পারেন। কত-কী জানেন বাবা! হলেই-বা মিডিল পাস, ঘোরাঘুরি করেছেন কত! তা-নাহলে রামদত্ত মাস্টারমশাই এত সম্মান দিয়ে কথা বলতেন? দাদুর বৈঠকে যেতেন না? আজকাল বাবাকে ভগবদ্গীতা পড়াচ্ছেন। সংস্কৃতও শেখাচ্ছেন।

বাবা গান্ধী-আশ্রমের খাজাঞ্চি না কী-যেন! দাদু এতেও নারাজ। এরচেয়ে দাদুর দোকানটাই কী খারাপ ছিল? মামারা বসেন না, চাকরবাকরদের দিয়ে কাজ চালাতে হয়। চুরি-চামারি তো লেগেই আছে। বিশ্বস্ত লোক দরকার, সেটা বাড়ির লোকই হতে পারে। কিন্তু মায়েরও এতে আপত্তি। তিনি চান না বাবা ঐ দোকানে কাজ করুন। মামীরাও মাকে ডরায়। শুধু মাসিরাই মাকে ভয় পেতেন না। কিন্তু ওঁরা মা-র মুখই দেখতে চান না। মা বলেন, সব বিগড়ে গেছে। বিগড়ে গেছে মানে? কুন্দনের তো সবক'টা মাসিকেই বেশ লাগে। বেড়াতে নিয়ে যান, খাওয়ান-টাওয়ান। একবার নন্দামাসির একটা চিঠি পৌঁছে দিয়েছিল কুন্দন। সে কী হ্যাপা! মা ঠাস্ করে একটা চড় কষে দিয়েছিলেন ওর গালে। মাকে জানাবার কী দরকার ছিল? ...কিন্তু বাবা বলেন, কোনো কাজই লুকিয়ে করিস না। সত্যি কথা বলবি। মিথ্যের চেয়ে বড়ো পাপ আর হয় না। কিন্তু এমন সত্যি বলে কি লাভ যাতে মার খেতে হয়? সত্যি বললে পুরস্কার পায়, নাকি শাস্তি? যা হোক, পোস্টম্যানের কাজটা ছেড়ে দিল কুন্দন। সাফ বলে দিল, এটা লুকোছাপার কাজ। একে লুকোলে পাপ দেয়, আর জানিয়ে ফেললে চড় খেতে হয়।

বাবার কথা আলাদা। দাদুকে সহ্য করতে না পারলেও, নন্দামাসির বিয়ে উনিই দিয়েছিলেন, আর্যসমাজে। নন্দামাসি তো ছেলেটার সঙ্গে পালাতেই চেয়েছিল। বাবাই ওকে নিরস্ত করেন। সেই থেকে দাদু আরও খাপ্পা। ছেলেটাকে দাদুর পছন্দ ছিল না। গৌরীমাসি জমিদারবংশের সম্বন্ধ এনেছিলেন—ঐ কি-যেন বলে, অন্তর্জাতি বিবাহ। ওটা যখন দাদুর পছন্দ ছিল, এই ছেলেটাকে নয় কেন? বাবা জানান, ছেলেটা খুব গরীব আর স্বজাতি কিনা, তাই। তোর দাদুর সাহেব জামাই চাই। টিপটপ। প্রথমটায় মা-র খুব রাগ হয়েছিল। বলেছিলেন—ওদের মাঝে তোমার নাক গলানোর কী দরকার ছিল? বাবা বলেছিলেন, নন্দা আর ছেলেটা ওঁর পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। ছেলেটা মা-র অপছন্দ ছিল না। কিন্তু এত এত তাড়াহুড়োর কী ছিল? বাবা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, তাড়াহুড়ো না থাকলে ওরা পালাতে চাইতো? এমন ঝুলোঝুলি করতো? ...তাড়াহুড়ো না করলে সম্মান যেত চুলোয়, সেটা ভালো হতো? এরপর মা কোনো দ্বিরুক্তি করেননি। কেন করেননি? কুন্দন সব বোঝে। কুন্দন কোনো কথা ভুলে যায় না। এখন নন্দামাসি আর ছেলেটা দু'জনেই বাবার কেমন ভক্ত হয়ে উঠেছে, দ্যাখো!

আরেকজন চিরঞ্জীলাল

সাধু চরিত সুভ চরিত্র কপাসূ। নিরস বিসদ গুনময় ফল জাসূ।
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা। বন্দনীয় জেহিঁ জগ জস পাবা।'

...বাবা চান করছেন। চান করার সময় বাবা তারস্বরে গান করেন। অদ্ভুত ঠেকে কুন্দনের। চান করতে-করতে গান গাইতে ভালো লাগে কারও! গলায় সুর থাকলেও না-হয় কথা ছিল। গানের নামে নাদাপাড়া মাথায় করা...

'কুন্দন, ও কুন্দন! আমার ধুতিটা দিয়ে যা তো—' বাবা বাইরেই ফেলে রেখে গেছেন ধুতিটা।...আরে, এ যে একেবারে জ্যালজেলে হয়ে গেছে! পরলে বোঝা যায় না তো!...

'বাবা, এটা তো ছিঁড়ে গেছে। নোংরাও হয়েছে।'

'আরে বাবা, যেমনি থাক, শিগ্‌গির দে'—কনকনে ঠাণ্ডায় বাবা হি-হি করছেন। কন্দনের হাসি পেল। এতই যখন ঠাণ্ডা লাগে, ধুতি পরো কেন? পাজামা পরলেই পারো। সেদিন দাদুও হাসাহাসি করছিলেন। বলছিলেন, তোর বাপের বামুনবাড়িতে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল। বামুনদের সবক'টা লক্ষণ শিখে রেখেছে। বনাবস্তিও কার সঙ্গে? না, রামদত্ত মাস্টারের সঙ্গে!

'মা, বাবার অন্য নতুন ধুতি নেই?' কুন্দন হেঁশেলের দরজার কাছে গিয়ে জানতে চাইলো।

'আছে। আমার মাথায় আছে।' মা-র ধ্যাতানি শুনে কুন্দন সভয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল। আরে, এতে রাগ করার কী আছে?

ভেতরের ঘর থেকে গগ্গুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল কুন্দন। ওদিকে ছুটে যেতে-যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো সে। একী! মা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। দ্যাখো দেখি, এবার ইনিও কান্না শুরু করে দিলেন। এবার কাকে কে চুপ করায়! সে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো আর দোলনাটা দোলাতে শুরু করলো। মা বলেন, তুই যখন শিশুটি ছিলি, এর চাইতে ভালো দোলনায় দুলতিস। তোর সময়ে রকমসকমই ছিল আলাদা।

গগ্গুর চোখদুটো আবার বুজে এসেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। কুন্দন সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ওর কানে এলো—'কাঠগুলো এখনো নরম রয়েছে নাকি রামী?'...বাবা কি দেখে ফেলেছেন?...'এবার তো আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাঠগোলা থেকে শুকনো কাঠ ওজন করিয়ে এনেছিলাম। ধরছে না?'

বাবা একতরফা বলে চলেছেন। কুন্দন তখনও সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। ও কিছু ভাবছে।...কুন্দন আবার ভাবতে শিখল কখন থেকে? ...হঠাৎ ও চমকে উঠলো।

দাদুর প্রসঙ্গ এসে পড়লো কেন? 'দ্যাখ্ রামী, তুই যখন বলছিস, আমি ভেবে দেখব'খন। এমনিতে, শ্বশুরবাড়িতে চাকরি করা আর সরকারের চাকরি করা, আমার কাছে দুটোই সমান।'

'তুমি তো সব কথার উল্টো মানে বোঝো। এতে চাকরির কথা আসে কোত্থেকে? বাড়ির প্রেস, তারই দেখাশোনা করবে। মাও বলছিল; আর, বাবার কাছে তো ছেলে-জামাই এক সমান।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা তো বটেই। তা তো বটেই।'—বাবা হেসে ফেলেন। এতে হাসির কি হলো? এইজন্যেই মা রাগ করেন।

'কেন গো, বাবাকে একটু সাহায্য করবে, তাতে, তোমার এতো বোঝা মনে হচ্ছে কেন? একশোটা টাকার জন্যে রাতদিন আশ্রমে খেটে মরো। কোন্ সম্মানটা ওরা তোমাকে দিয়েছে শুনি? সম্মান করবার হলে আজ-এখানে কাল-সেখানে ছুটিয়ে মারতো? পুরো মাইনে দিত না?'

'ওহো রামী, কতবার বলেছি তোকে, ওরা এর বেশি কাউকে দিতে পারবে না। আমাকে দেবে কি করে? এটা সেবার কাজ। বিক্রিবাট্টা বাড়লে বেতনও বাড়বে। তুই চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এই একটা কথাই শুনতে-শুনতে আমার কান পচে গেল। এখন আমিও আর পেরে উঠছি না। একবার তুমি নিজেই গিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছো না কেন?'

'কী কথা বলবো রামী? এই তো গেল দোলের ঘটনা, তোর বাবা আমাকে বললেন, তুমি আশ্রম থেকে যত পাও, তার ডবল টাকা তো আমরা আমাদের কম্পোজিটারকে দিই। গান্ধীর নাম করে ওরা লুঠ চালাচ্ছে, লুঠ। আমি গেলাম রেগে। বলে দিলাম, গান্ধী আশ্রমওয়ালাদের আমি জানি, আপনি না। ব্যস, নারাজ হয়ে গেলেন। এরপর গান্ধীকে আর আমাকে নিয়ে যা মুখে এলো শুনিয়ে দিলেন। আমি কাঁহাতক সহ্য করতাম, তুইই বল! উনি তোর বিয়ে আমার সঙ্গে দেন নি, দিয়েছিলেন একজন পাটোয়ারের সঙ্গে। এখন ঐ পাটোয়ার মরে গেছে, সুতরাং, উনি ভাবছেন ওঁর মেয়েও বিধবা হয়ে গেছে...'

'থাক-থাক।' মা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'এই আমি দু'কান মলছি, আর কোনদিনও যদি এই কথা তুলি। এই তোমার জ্ঞান-ধ্যান? খেতে বসে মধুর বচন বলছো ভারি! তোমার গান্ধীই বুঝি বসে রয়েছেন তোমার জিবের ডগায়! হে ভগবান! এ কোন্ লোকের পাল্লায় পড়লাম আমি! আমি নিজে থেকে কোনো কথা পাড়ছি না আর। যা ইচ্ছে যায়, করো। ...তোমাকে যখন-তখন একথা বলেছি, বলো?'

'আহা রামী! যখন-তখনই যদি বলতিস, তুই আমার রামী হতিস কি করে? গৌরী, নন্দা, পারুলি, খেঁদি এসব হতিস না? নিজের বোনগুলোকে দ্যাখ, আর নিজেকে দ্যাখ, কিসের অভাব ওদের? আর তোরই বা কোনো অভাব থাকতো নাকি, আমি যদি চাকরিটা ছেড়ে না দিতাম? ...আর, তুই যদি আমার হাত ধরে বলতিস, ছেড়ো না, আমি ছাড়তে পারতাম? সবই জানিস, বুঝিস যখন, শুধুশুধু আমার পরীক্ষা নিস কেন? ...দে, আর-দুটো বড়া দে পাতে। ...সেই কখন থেকে আঙুলগুলো চুষছি, দেখতে পাচ্ছিস না? ...কুন্দন খেয়েছে?'

'কোথায়! রোববারের দিন গুণধরের টিকিও দেখা যায় নাকি? নিজের মতোই গড়ে তুলেছো ছেলেটাকে...'

কুন্দন কান খাড়া রেখে শোনে। মা দেখছি আজকাল খুব বেখেয়ালি হয়ে পড়েছেন। এই তো ওর সঙ্গে কথা বললেন!...

'আমি আর কী করতে পারি রামী, ও-ই পিছু-পিছু ঘোরে। বলে, খেলায় মন বসে না। আমার সঙ্গে বেড়াবার নেশায় পেয়েছে ওকে। তুই ওকে হাভেলি পাঠিয়ে দিস না কেন? আমার মাথা খায় শুধু...'

আ-চ্ছা! আচ্ছা! ...আমি ওনার মাথা খাই, না? নিজেই ধরে নিয়ে যাও, বলছো না। আর খেলাধুলোয় মন বসে না কেন বল্লে? কেউ সঙ্গে খেললে তো!

'শোনো,...কাগজটা বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে লক্ষ্য করছি তুমি কেমন মনমরা হয়ে পড়েছো। তোমার ওতেই যখন সুখ, তখন ঐ করো না। যেমনই হোক, দেখাশোনা তো তুমিই করবে। যা ইচ্ছে লেখো, ছাপো,...ব্যাগড়া দিচ্ছে কে? ...আমি তোমার ভালোর জন্যেই...শুনছো?'

প্রতিপক্ষের মুখে কোনো শব্দ নেই। রাগ হলো নাকি? খাওয়াও হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে। ঢেকুর তুলছেন। কুন্দনেরও এতক্ষণে হঠাৎ খিদে পাচ্ছে।

'নে, তোর গুণধর এলো। কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? তোর মা কতো বকাঝকা করছিল!'

'বা রে, এই তো গল্লুকে ঘুম পাড়িয়ে, ইস্কুলের টাস্ক করছিলাম। আমি...' কুন্দনের ভীষণ রাগ হলো। এঁরা ভাবেনটা কি ওকে?

'নে, এবার চটপট বসে পড় দেখি। খেয়ে নে'—বাবা নিজের থালাটা সরিয়ে উঠে পড়লেন। হঠাৎ কিছু মনে পড়ল ওঁর, বললেন, 'ঐ খবরের কাগজটার সব কথা এখনও বেশ মনে আছে রামী। ওটার দুঃখ ঘুচেও ঘোচে না। কি যে করবো, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।'

মা একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। একটা মধুর চন্দ্রসুষমা ছড়িয়ে পড়ছে ওঁর মুখে। ব্যাপারটা আঁচ করার জন্যে কুন্দন ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালো।

দেখলো, বাবার মুখেও স্মিতহাসি। ওঁদের মাথায় আবার কোনো দুর্বুদ্ধি খেলছে নাকি? কুন্দন ভাবলো।

'শোনো, তুমি বাবার কাগজে ঐ কেন ব'নে যাচ্ছো না? ...কালও বলছিল বাবা। আমার তো, সত্যি, কথাটা কখনও মাথায় আসেনি!'

'আচ্ছা!' বাবা বিড়বিড় করতে-করতে উঠোনের দিকে চলে গেলেন। হাত ধুয়ে, কুলকুচি করে আবার ফিরে এলেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিল তোর বাবা?'

'বললাম তো। কতবার শুধোবে? তোমার মন চাইলে করো, আমার কী?' মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'কথাটা কি জানিস রামী, সমস্ত তদারকি করতেন চিরঞ্জীলাল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। উনি ছেড়েছুড়ে চলে গেছেন। সম্পাদক তো উনি ছিলেন না। সবধরনের কাজ উনিই করতেন বটে, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে নাম যেতো তোর বাবার। তারমানে তোর বাবার—তুই রাগ করিস না রামী—আরেকজন চিরঞ্জীলাল চাই। আমি যে সেটা হতে পারবো, তুই তা ভালো করেই জানিস।'...

মায়ের কপালে বলি দেখতে পায় কুন্দন। ...'তুমি যদি করতে চাও, তোমার মন থাকে তো বলো। আমি বাবার সঙ্গে কথা বলছি। চিরঞ্জীলালের ব্যাপারটা ছিল অন্য। তুমি বাড়ির জামাই। তোমার নাম ছাপা হলে বাবার খারাপ লাগবে কেন শুনি?'

'লাগবে, রামী, লাগবে। আর ধরেই নে, সম্পাদকের জায়গায় আমার নামটাই ছাপা হলো, তাতে তফাৎ কী হবে শুনি? তোর বাবা যা চাইবেন, সেগুলোই তো ছাপতে হবে আমাকে। ওঁর চিন্তাধারা আলাদা রামী। আমার সঙ্গে মেলে না। তোর তো সবই জানা...'

'জানি। তবু পরিষ্কার কথা বলে নিতে ক্ষতি কী? তুমি তো বাবাকে নিজের শত্রু ভেবে বসে আছো!...'

'না রামী, না। যারা সত্যি-সত্যি আমার সঙ্গে বৈরাচরণ করে, তাদেরকেই শত্রু বলে মানি না, তো তোর বাবাকে শত্রু ভাবতে যাবো কোন্ দুঃখে? তুইই ভেবে দ্যাখ রামী!'

'তবে আবার নতুন করে তোমার 'লোকসত্তা' বের করছো না কেন বাবা?' কুন্দন আর থাকতে না পেরে ফস্ করে বলে ফেললো।

বাবা সজোরে হেসে উঠলেন,—'কাগজ বের করা তোর ডাংগুলি খেলা, না? খবরের কাগজ বের করার জন্যে কতো টাকা লাগে, চেনাজানা লাগে! আমার কাছে কী আছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ; তোমার কাছে তো কিছুই নেই। থাকবেও না কখনও।'—রাগের

মাথায় মা কুন্দনের থালায় দু-তিন হাতা তরকারি ঢেলে দিলেন। ...'ব্যস্-ব্যস্ মা, কী করছো?' কুন্দন বাধা দিল, 'আমার পেট ভরে গেছে।'

'আমারও পেট ভরে গিয়েছে।' উঠোনের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বাবা বললেন, 'আজ বলদাউজীর মন্দিরে আনন্দস্বামীর প্রবচন রয়েছে, তোরা যাবি শুনতে?'

'আমাকে হাভেলি যেতে হবে। তোমরা বাপ-বেটা যেও প্রবচন শুনতে। আমার গিয়ে কি হবে। দিনরাতই শুনছি তোমার প্রবচন।'—বলতে-বলতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে মা ফিক করে হেসে ফেললেন, 'এখন তুমি বলো, বাবাকে গিয়ে কী জবাব দেবো? আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, তাই করলাম। ওখানে গিয়ে কী বলবো, বলো।'

বাবা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, রামী, তোর বাবাকে গিয়ে বলে দিতে পারিস, সম্পাদক হতে আমি রাজি আছি। কিন্তু কারও দখলতি একদম বরদাস্ত করবো না। যা ছাপতে চাইবো, ছাপবো। যা লিখতে চাইবো, লিখবো আর লেখাবো। তুই সাফ-সাফ বলে দিয়ে আসিস কিন্তু। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি গো, বুঝেছি।' মায়ের মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠলো। বিরাট একটা সম্পত্তি হস্তগত হয়েছে বুঝি! কুন্দনের দিকে চেয়ে হাসছিলেন। মায়েব মুখটা, সত্যিই খুব সুন্দর লাগছিল কুন্দনের।

মৃতের নগরী

বাবার জন্যে তামাক কিনতে বদলু মিয়ার দোকানের দিকে এগোচ্ছিল কুন্দন। গলি ছাড়িয়ে বাজারের মুখে এসে হঠাৎ হৈ-চৈ আর হট্টগোল শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ...কী ব্যাপার! লোকে এমন পাগলের মতো ছুটছে কোথায়? দু'জন সেপাই, কুন্দন ওদেরকে চেনে, ওর পাশ দিয়ে ছুটে পেরিয়ে গেল। যাকে দ্যাখো, সেই পালাচ্ছে!...

সবক'টা দোকান ফাঁকা। একজন দোকানিও নিজের দোকানে নেই, কেউ কোনো জিনিস তুলে নিলে? 'বদলুচাচা!' কুন্দন দেখতে পেয়ে হাঁক দিল। বদলুচাচাও নিজের দোকান ফেলে রেখে পালানোর জন্যে উদ্যত। বদলুচাচা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, আর কুন্দনের হাত ধরে নিয়ে চললো। '...কী হয়েছে চাচা? সবাই যাচ্ছে কোথায়?...'

'আরে আত্মহত্যা, আত্মহত্যা! ...ছেলে-মেয়ে দুটো নিজেদের মধ্যে...মেয়েটা শুনলাম তোদের ডুমৌড়ার বটে...চল, ওখানেই দেখতে যাচ্ছি...'

বাজার পেছনে পড়ে থাকে...গাড়ি...সড়কের চড়াই...কালীমন্দির...নরম্যাল স্কুলের বিল্ডিং...আর, ঐ-যে গির্জাঘরটা। ...'এরই পেছনে, বাগানের মধ্যে এখনো পড়ে রয়েছে লাশ দুটো। চল...'

প্রচণ্ড ভিড়। গোটা শহরটাই যেন উপচে পড়েছে। বদলুচাচার হাত ধরে কুন্দনও ভিড়ের মধ্যে ক্রমশ সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। কেন? ও দেখবে না, দেখতে চায় না, তবু বদলুচাচার হাতটা এমন শক্ত করে ধরে রেখেছে যাতে কেউ ছাড়াতে না পারে।

'জানকী। নররামের মেয়ে...' ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ জানালো।

'আর, ছেলেটা?'

'কর্নেল সাহেবের। ভীমসিং রাওতেলার।'

'চুঃ-চুঃ, বয়েস কতো?'

'আরে, চ্যাংড়াই তো ছিল। ইণ্টারে পড়তো। বড়জোর আঠারো'—

'হরে রাম! এভাবে প্রাণ দেওয়ার কী দরকার ছিল? পালিয়ে যেতিস, বিয়ে করে ফেলতিস।'

'পালিয়ে যেত, মানে? নাবালক ছিল যে! আর, একটা ডোমের মেয়ের সঙ্গে কর্নেল নিজের ছেলের বিয়ে হতে দিত? উহুঁ!'

'বন্দুক পেল কোথায়?'

'কি যে বলেন মশাই, কর্নেলের বাড়িতে একটা বন্দুক থাকবে না?'

'কিন্তু ঘটনাটা ঘটলো কেমন করে?'

'আরে, ছেলেটা আগে মেয়েটাকে গুলি করে। তারপর নিজের বুকে নলিটা ঠেকিয়ে—গুড়ুম!'...

'রামো-রামো! আজকালকার ছোঁড়াদের কেমন মতিগতি দ্যাখো...'

পেছন থেকে একটা রামধাক্কা...আর বদলু মিয়া-সহ কুন্দন দশ গজ সামনে গিয়ে পড়লো।...ও বাবা গো! এ যে দেখছি সত্যি-সত্যি জানকীদি! কুন্দনের গলা থেকে একটা ভয়ার্ত আওয়াজ বেরিয়ে পড়লো। সে বদলু মিয়াকে আঁকড়ে ধরলো। সম্পর্কটা দূরের হলেই বা, দিদিই তো। ...কুন্দন চোখদুটো বন্ধ করে নিল। 'বদলুচাচা! বদলুচাচা! ফিরে চলো।'

বদলুচাচা নড়ে না। বিস্ফারিত চোখে লাশদুটোর দিকে তাকিয়ে সে। কিন্তু ভিড় তার পরোয়া করবে নাকি? এক ঠ্যালায় কুন্দন সমেত বদলুচাচা বেরিয়ে এলো বাইরে। কুন্দন তার হাতটা তখনও ছাড়েনি।

'প্রেম কাকে বলে, দেখলি?' বদলুচাচা শূন্য আকাশের দিকে মুখ করে হঠাৎ বলে উঠলো। যেন আকাশকেই শোনালো কথাটা।

'প্রেম আবার কী, বদলুচাচা?'

'আরে, দেখলি না? প্রাণ দিয়ে দিল! বিয়ে তো আর হতো না, আর একে-

অপরকে ছেড়ে থাকতেও পারতো না ওরা। করতো কী? প্রেম আর বলেছে কাকে?'

'ওরা এতো তাড়াহুড়ো করলো কেন?' কুন্দনের মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

বদলুচাচা হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়,—'তুই শুনলি না? কর্নেল শহর ছাড়তে চলেছিল, ওর বদলির অর্ডার এসে গিয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যেই চলে যেত। শেষবারের মতো ওরাও দেখা করতে চেয়েছিল, পরে আর দেখা হতো নাকি? ব্যস্, এই একটাই পথ খোলা ছিল ওদের সামনে। সারাজীবনের মতো মিলন ঘটানোর। এখন ওদেরকে আলাদা করে কার সাধ্যি?'...

'কিন্তু ওরা দু'জন তো মরেই গেল। মিলন ঘটলো কোথায় বদলুচাচা?'

'ধ্যাৎ!' বদলুচাচা চটে গেল, 'তুই বুঝবি না। তুই এখন খোকা। নিজের বাপকে গিয়ে জিজ্ঞেস করিস।'

দ্যাখো, বদলুমিয়া কেমন বাজারে এসেই সোজা নিজের দোকানে গিয়ে ঢুকলো! কুন্দন কয়েক মুহূর্ত থ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। বাড়ি এমন-কিছু দূরে নয়। কিন্তু ওর গা ছমছম করছে যে! বদলুমিয়া ওর খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কুন্দনের দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই তার। তামাকের পুরিয়া হাতে আস্তে-আস্তে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো সে। তার বুকটা ধড়ফড় করছে,...চোখ খোলা, তবু দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে...রক্ত রক্ত রক্ত...আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে...

দিদির নামটা পর্যন্ত জানে না কেউ, অথচ ছেলেটাকে, ছেলের বাপের নামও সকলের জানা। কেমন-কেমন সব কথা! ...সবাই তো ছেলেটারই সুখ্যাতি করছিল। ...জানকীদির নামটা পর্যন্ত কেউ মুখে আনেনি।...

'ডুমের ছুঁড়ির জন্যে প্রাণ দিয়ে দিল!'

'শুনেছি, লেখাপড়াতে ছিল এক নম্বর।'

'আরে, জানো না, খেলাধুলোতেও ছিল নাম্বার ওয়ান। এ-আই-সির হয়ে খেলতো।'

'এরা দেখা করতো কিভাবে? কর্নেল জানতো নাকি?'

'শুনেছি, বাসন মাজতে আসতো। জোয়ান রক্ত ভায়া, মন দিয়ে বসলো, আবার কি?'

'শুনেছি, কর্নেল মারধোরও করেছিল। এইজন্যেই নিজের ট্রান্সফার করিয়েছিল।'

বাড়িতে ঢুকে কুন্দন দেখলো, কেউ নেই। সবাই গেল কোথায়? জানকীদির বাড়ি গেছে নাকি?

শূন্য ঘরে ওর বুকের ধুকপুকানি আরও বেড়ে গেল। ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। আবার চলে এলো বাজারে। এখনও কোলাহল রয়েছে। ফারাক শুধু

এই যে, খানিক আগে সবাই ছুটছিল একদিকে, এখন কেউ-কেউ ওদিকে যাচ্ছে, কেউ-কেউ এদিকে ফিরছে। ...যারা ফিরে আসছে, ওদের মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে সদ্য একটা ম্যাচ দেখে ফিরছে। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি। দারুণ রোমাঞ্চকর ম্যাচ যেন!

আজ ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না। ছেলেরা এই গল্পই তো করবে। জানকীদির কথা জিজ্ঞেস করবে। সে তখন কি বলবে? ...তারচেয়ে, না যাওয়াটাই মঙ্গলজনক।

মানুষের এক-একটা জটলা। বাজারের সর্বত্র, সকলের মুখে ঐ এক গল্প। একটাই আলোচ্য বিষয়...। কুন্দন বাড়ি ফেরার জন্যে উদ্যত হলো। কতো দেরি হয়ে গেছে! এতক্ষণে ওরা ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই।

'কি রে, ইস্কুল যাবি না তুই?'

কুন্দন ছুটে এসে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

'তুই কোত্থেকে আসছিস রে?'

'আমি...' কুন্দন আমতা-আমতা করে, 'বদলুচাচার কাছে তামাক নিতে গিয়েছিলাম। ও দোকান ছেড়ে পালাচ্ছিল। আমাকেও ধরে নিয়ে গেল।'...খানিকটা রেখে-ঢেকে বলে দিল সে।

'তুই ওখানে গিয়েছিলি, ঐ চার্চে?' বাবাকে একটু ক্ষুব্ধ আর চিন্তিত লাগছিল কুন্দনের। সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে সেই একই প্রশ্ন করে বসলো বাবাকে, 'তুমিও গেছিলে নাকি বাবা?'

'তুই আগে বল ওখানে গিয়েছিলি কেন?' বাবা খাটের ওপর বসে পড়লেন। কুন্দনকেও হাত ধরে পাশে বসিয়ে দিলেন, 'ওটা কোনো মেলা নাকি? ওখানে যেতে কে বলেছিল তোকে?'

কুন্দন মাথা নামিয়ে নিল। মেলা ছাড়া আর কি? গোটা শহরটাই তো ভেঙে পড়েছিল দেখতে।

'কী বিচিত্র মানুষ এরা!' বাবা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন। মা এখনও জানকীদির বাড়ি থেকে ফিরলেন না কেন? বাবাও কি ওখানেই গিয়েছিলেন?

'বদলু মিয়া নিজে তো তামাশা দেখতে গিয়েই ছিল। তোকেও সঙ্গে নিয়ে গেল? অ্যাঁ! বদলুর যদি নিজের মেয়ে হতো? এদের কাছে সবই কৌতুক, যাই ঘটুক কারও। এবার দশ-পাঁচদিন ধরে দেখবি, গাঁয়ে সবার মুখে এই একটাই চর্চা চলতে থাকবে। কোনো কাজকর্ম নেই। এটা শহর, না পাগলাগারদ—?'

আচম্বিতে কুন্দনের মনে পড়ে গেল। বললো, 'জানো বাবা, একটা লোক বলছিল, এই দু'জন পাগল ছিল। সত্যিই...?'

বাবা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর মুখটা রাগে দপ্‌দপ্‌ করছে,—'হবে না কেন? ঐ কথা যে লোকটা বললো, সে কিছু কম পাগল নাকি যে সিনেমার

মজা লুটতে হাজির হয়েছিল? ...আরে, পাগল তো ওরা ছিলই। জীবনটা ভালো করে শুরুই হলো না, আর...' প্রবল আবেগে বাবা কথা শেষ করতে পারলেন না। পায়চারি শুরু করে দিলেন।

'বদলুচাচা বলছিল, সত্যিকারের প্রেম একেই বলে। এই প্রেম কী বাবা?'

'প্রেম!' বাবা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। একমুহূর্ত। তারপর মাথায় হাত রেখে ধপ্ করে বসে পড়লেন, 'বাহ্ রে বদলু মিয়া! কেউ যদি দেখতে পেতো, ...ছাড়াছাড়ি ঘটিয়ে দিত যদি কেউ...তবে তো এই অঘটনটা ঘটতই না। দু'দিন বাদে বাপটা তো যাচ্ছিলই। আপনাআপনি নেশা কেটে যেত। ...এটা তো চান্সের ব্যাপার। ...এতই যদি বাহাদুর ছিলি, এতই ভালোবাসা ছিল যদি, বাপের মোকাবিলা করলি না কেন? দেখতিস, ছেলে-মেয়ে দু'জনেরই পরীক্ষা হয়ে যেত। এ তো নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বার্থপরতা, জঘন্য পাগলামি। জানকীটাকেও শেষ করে দিল! ...কোন্ অধিকারে—?' ...বাবার গলা কাঁপছে। এ কী! বাবা যে চোখ মুছছেন!

'একজন বলছিল, ডুমনির ছুঁড়ির জন্যে প্রাণ দিয়ে দিল।'...

'কী?' বাবা হঠাৎ খুব ক্ষেপে গেলেন। নিজের কান দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছে না কুন্দন। 'হারামজাদা! নীচ! ইতর কোথাকার!...' এসব বাবার মুখে? বাবা বলছেন?—বাবা? ...'এই লোকগুলোকে কী মনে করছিস তুই? ...এইসব সেয়ানা লোকগুলো ভেতরে-ভেতরে খুবই দুর্বল আর কাপুরুষ। এদের শুধু গালগল্প চাই। ব্যস্। ...নিজেরা না পারে মরতে, না পারে মারতে। ...কর্নেলের ছেলে, হুঁঃ! কী বীরগতিটাই না পেল সে! ...লজ্জা করে না? নিজেদের তো কোনো মুরোদ নেই, নিজেরা তো সকাল-সন্ধে লেন-দেন ছাড়া কিছু বুঝিস না...স্বার্থপর, কাপুরুষ, নপুংসকের দল! শুধু কোথাও একটা-কিছু ঘটুক, সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকিস! ...কারও ঘরে আগুন লাগুক, গলায় দড়ি দিক কারও বউ, কারও ছেলে পালাক বাড়ি থেকে—অমনি ছুটবি তামাসা দেখতে! ...আত্মহত্যা, লুটপাট, অন্যের সর্বনাশ-- এগুলো এদের কাছে উৎসব! মেলা!...'

বাবার প্রলাপ যেন ফুরোতে চায় না। কুন্দন বেশ মন দিয়ে শোনে কথাগুলো। আজ মানুষটার হলো কী? এরকম কথাবার্তা তো বলেন না কখনও?

'মানলাম, প্রাণ দেওয়া চাট্টিখানি কথা না, অত্যন্ত সাহসের কাজ। কিন্তু প্রাণ দিচ্ছি কেন, সেটা তো জানা চাই। আরে, যার জন্যে প্রাণ দিচ্ছিস, সেটা তোর প্রাণের চাইতে বড়ো হওয়া চাই কিনা?'

প্রশ্নটা কুন্দনকে করা হয়নি বটে, কিন্তু কুন্দনের কিছু-একটা তো বলা দরকার। জিজ্ঞেস করলো, 'এরা দু'জন কি জন্যে প্রাণ দিল, বাবা?'

বাবা হাতদুটো পেছনে বেঁধে আবার পায়চারি করা শুরু করে দিলেন। করতে-করতে বললেন, 'কি জন্যে যে প্রাণ দিচ্ছে, এটাই যদি জানা থাকতো, তাহলে

এটা ঘটতই বা কেমন করে? অজ্ঞান আর বলে কাকে, মোহ বলেছে কাকে, তাকেই বুঝি বদলু মিয়া প্রেম মনে করে বিভোর রয়েছে।...অপরের অজুহাতে নিজের আশ মেটানোর এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কী হতে পারে?'

'বদলুচাচা বলছিল, তুই কি বুঝবি প্রেম কাকে বলে!'

বাবা অপলক চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। চেহারাটা আগের মতো তেমন ভয়াবহ লাগছে না।

'প্রেম-ভালোবাসা সব কথার কথা। প্রেম জিনিসটা একেবারে থাকেই না যার মধ্যে, নিজেকে আধখানা খরচ করতেও যাদের প্রাণ যায়, সেইসব কর্মবিমুখ, বাকসর্বস্ব, বচক্রু লোকেরাই প্রেমের দোহাই পাড়ার ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে থাকে। আমি বদলু মিয়ার কথাই শুধু বলছি না. ও বেচারা তো ভাবভোলা মানুষ, সারাক্ষণ নিজের শের-শায়েরি নিয়েই মশগুল থাকে—গোটা শহরটা, পুরো সমাজটাই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কী বলবো! প্রেম কাকে বলে? এটা প্রেম নয়। হত্যা। আত্মার হত্যা। কি জন্যে?... প্রেম অন্ধ. একথা যারা বলে তারা নিজেরাই অন্ধ। সমগ্র বিশ্ব—গাছ-পাথর থেকে শুরু করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র. সব তো প্রেমের ওপরেই টিকে আছে। কিন্তু সেই প্রেমকে দেখার জন্যে চোখ চাই, চোখ। শিশুসুলভ নির্মলতা চাই। নিয়ম কারও চোখে পড়ে না। সবাই দেখে শুধু অনিয়মটাকে, আর তাকেই বেশ বাহাদুরি বলে মনে করে। এতে বাহাদুরি আবার কী? মৃতের নগরী কিনা, এভাবেই জাগে।'

বাহ্ রে বামুন-বুদ্ধি!

একটা বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আরেকটা বিভীষিকার কবলে পড়লো শহরটা। বাল্মীক টোলায় একটা ব্রাহ্মণ মেয়ে পালিয়ে এসেছে। কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না, তবে টোলার একজন মেথর যুবকের সঙ্গে এসেছে, এটুকু জানা গেছে। মেথরটার মা-বাপকে গোটা শহর চেনে, কিন্তু ছেলেটা কাজ করে শহরের বাইরে।

বাল্মীক টোলায় লোকে-লোকারণ্য। আর ঐ জনসমুদ্রে বাবা আর রামদত্ত মাস্টারের ফেউলা হয়ে কুন্দনও এসে সামিল হয়েছে। এবার বদলু মিয়ার ভূমিকায় খোদ রামকাকা। তিনিই বাবাকে একরকম জোর করে ধরে এনেছেন এখানে। কুন্দন ইস্কুল থেকে ফিরছিল। পথেই বাল্মীক টোলা। ভিড়ের মধ্যে বাবাকে আর রামকাকাকে দেখতে পেয়ে চুপিচুপি সেও ওঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ব্যারেক-সদৃশ ঐ ইমারতের দোতলায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল ওরা দুজন।

গলায় ফুলের মালা। ছেলেটার চেয়ে মেয়েটাকে একটু বেশি বয়েসী মনে হচ্ছিল. দেখতে-শুনতে ভালো। দামি বেশবাস আর গয়নায় রূপের জলুস আরও ঠিকরে বেরাচ্ছে।

'দেখে নিন সাহেব, আপনারা সবাই দেখে নিন, এ নিজের মর্জিতে আমার সঙ্গে এসেছে। আমি ভাগিয়ে আনিনি। আপনারা একে শুধিয়ে দেখতে পারেন।'

মেথরের বাপটাও ওখানে, ঐ নিচে দাঁড়িয়েছিল। চেনাজানা বয়স্ক লোক দেখলেই সেলাম ঠুকছে সে, তাদের দোয়া প্রার্থনা করছে যেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই হাঁ-চোখে দেখে যাচ্ছে শুধু—সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েছে যেন।

'আমি কতো বুঝিয়েছি, ঘরে বসিয়ে খাওয়াতে পারবো না তোকে। ময়লা সাফ করি, তোকেও ঝাড়ুদারিনীর কাজ করতে হবে। বলল, তুমি যা করবে, আমিও তাই করবো। বল্, বলেছিলি কিনা?'

মেয়েটা মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বললো। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণে মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। 'বলিহারি বাবা!' কেউ বললো। ...'নির্লজ্জতার চূড়ান্ত।' অন্যজন বললো। কুন্দন উঁকি মেরে দেখতে গেল কে বললো কথাটা। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কে কোত্থেকে বলছে, বোঝা দায়!

'ডুবে মর।'—সহসা কেউ চিৎকার করে বলে উঠল।

'ওরে ভবা, এরা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই ফিরে যেতে বল এদেরকে'—কুন্দনের পাশে-দাঁড়ানো পত্তু লালা ফরমান দিলেন।

'কেন লালা, তোমায় বিঁধছে কেন? আমার ব্যাটা আমার ব্যাটা-বউ। এদেরকে আমি তাড়িয়ে দেব কেন?'

'ছেলে-বউ ওসব আমরা বুঝি না। এ অধর্ম এখানে চলবে না। বুঝেছিস?'

'ওহে লালা, ধর্ম-টর্ম এখানে কপচিও না। বলে দিচ্ছি।'

'অ্যাঁ, ভবা! আরে ভায়া, তামাশা করো কেন? এতো সেয়ানা হয়ে তুমি—' বংশীকাকার গলাটা পরিষ্কার চিনতে পারে কুন্দন।

'তামাশা আমি করছি, না তোমরা? আমরা থানায় জানিয়ে দস্তুরমতো বিয়ে করিয়েছি।'

'থানার জাত মারি...' ভিড়ের ভেতর থেকে কে-যেন গর্জে উঠলো।

'শালাদের আমরা দেখে নেব। আসুক বাইরে। সব তেজ ঘুচিয়ে দেব...'

'আচ্ছা, দেখি কার বুকের পাটা এতো শক্ত, আমাদের গায়ে হাত তুলে দেখাক একবার!' জোয়ান ধাঙ্গড়টা বউয়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, 'চল্, বেরো আমার সঙ্গে'—

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর আবার সেই গুজগুজ ফিসফিস। দু-একজন

শিস্‌ও দিয়ে উঠলো। মেয়েটা একঝলক লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে, মুখ নিচু করে বসে পড়লো।

'হারামজাদি, বসে পড়লি যে! বেরোচ্ছিস না কেন?'—ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠলো।

এমন সময় বাবা হঠাৎ মুখ খুললেন, 'দাঁড়া। এখুনি বাইরে বেরনোর দরকারটা কি? সবাই দেখে নিয়েছে—গোটা শহর দেখে নিয়েছে। ভবা, এদেরকে ভেতরে নিয়ে যা। আর লোকহাসি করিস না।'

'এ আবার নেতাগিরি মারাতে কে এলো রে?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বেধে গেল। মেয়েটা যেখানে বসেছিল, একটা পাথর ঠিক তার পেছনের দেয়ালে এসে লাগল। দুমাদুম্ ইটপাটকেল পড়তে শুরু করলো। বাবা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন, আর টোলার ঐ ইমারৎ আর ভিড়ের মাঝখানে আবর্জনার যে উঁচুমতো স্তূপটা ছিল তার ওপর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চেঁচাতে শুরু করলেন—'শান্ত হও! শান্ত হও! তোমরা সব সজ্ঞানে এসো, সজ্ঞানে এসো!'... কিন্তু ঢিল পড়ায় তাতে ছেদ পড়ে না। দুম্‌দাম্ ইটপাটকেল পড়ে যেতে থাকলো। 'বাবা!' কুন্দন চিৎকার করে ডাকলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার ভেসে এলো—'সরে যা, পাথর যদি না খেতে চাস, সরে যা।' ...'মারো, ব্যাটাকে মারো'...'অ্যাই খবরদার! ইনি নেতা'...

বাবা একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বুক চিতিয়ে চিৎকার করছেন, 'চালাও, বাহাদুররা-সব ইটপাটকেল চালাও! সাবাশ! নাও, মারো আমাকে...'

টোলায় শোর উঠল। মাস্টার রামদত্ত প্রথমে আবর্জনার স্তূপটার দিকে ছুটে গেলেন, তারপর সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সোজা বাল্মীক টোলায়। ...'সরো-সরো, খবরদার! একজনও এগিয়েছো যদি আস্ত রাখবো না...'

কুন্দন দেখলো, টোলার সব ক'টি কুঠরি থেকে লাঠিসোঁটা বেরিয়ে পড়েছে। ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা অকস্মাৎ 'অ্যাবাউট টান' নিলেন। জামার আস্তিন তুলে, কোমরে দু'হাত রেখে বাল্মীক টোলার উন্মত্ত জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন, 'বাহ্! বাহ্! এই না হলে পুরুষ! তোরা খুব বাহাদুর, না? ঢ্যালার জবাব লাঠিতে দিবি? ওদিক থেকে ঢ্যালা, আর এদিক থেকে লাঠি? ...পুলিশ এলো বলে। পুলিশও ওদের পক্ষ নেবে। তখন? তোরা দেখছি খুব চালাক হয়ে উঠেছিস! বীর ব'নে গেছিস এক-একটা!'

পুলিশ! ...পুলিশ!... হঠাৎ ছুটোছুটি-হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। লোকগুলো অন্ধের মতো যে-যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। একজন কনেস্টবল বাবাকে ধরতে আবর্জনার স্তূপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ...'খবরদার!' রামদত্ত মাস্টার তীরবেগে সেদিকে ছুটে গেলেন—'খবরদার! কার গায়ে হাত দিচ্ছো?' ...ছত্রখান হয়ে-পড়া ভিড় আবার একটু-একটু করে জটলার আকার নিতে শুরু করলো।

'থানাদার সাহেব!' ভবা মেথর সামনে এগিয়ে এসে জোর গলায় বলতে শুরু করলো—'ইনি না থাকলে আজ আমাদের সবার মাথা ফাটতো। ইনিই আমাদের রক্ষা করেছেন সাহেব। ইনিই...। আপনি এসে না পড়লেও এমন কিছু অঘটন ঘটতো না।'

'কেসটা কী? হঠাৎ ঝগড়াটা বাধলো কেন?'

রামদত্ত মাস্টার সমগ্র ঘটনাটা বয়ান করা শুরু করলেন। বাবা এমন পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন সূর্যকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন! মুদ্রিত নেত্র, ধ্যানমগ্ন। কুন্দন পেছনে ফিরে দেখল, কৌতূহলী লোকগুলো দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখছে।

'ছেলেটা কে? কার বিয়ে হয়েছে?' থানাদার হুংকার ছাড়লেন। জওয়ান মেথরটা রেলিং থেকে চিৎকার করে জানান দিল—'আমি সাহেব, এই যে এখানে। আমাকে চিনলেন না সাহেব?'

'খুব চিনেছি। ডাক, তোর বউটাকে ডাক।'

বউটা কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। তেমনি, আনত মুখে।

'তোরা এখান থেকে আজই কেটে পড়, বুঝলি?' থানাদার গর্জালেন, 'তোরা বাইরে বেরালে কেউ যদি পাথর ছোঁড়ে, গুলি মারে? মারদাঙ্গা বাধলে সামলাবে কে? তোরা শালা এখানে এলিই কি করতে? কে বলেছিল আসতে?'

'আপনি কিরকম কথা বলছেন, দারোগা মশাই? ইনি ছেলেটির বাবা। ছেলে বউকে নিয়ে নিজের বাবার কাছে আসবে না? এক্ষেত্রে আপনি হলে...' বাবা আরও কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় রামদত্ত মাস্টার মুখে আঙুল ঠেকিয়ে তাঁকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলেন।

'ঠিক আছে। দেখা হয়ে গেল। আর এদের এখানে থাকার দরকার কী? বিয়ে হয়ে গেছে, এবার কেটে পড়ুক এখান থেকে। খামোকা শহরে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবে।'

'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। কি বলো ভবা?' রামদত্ত মাস্টার জানতে চান। ভবা মাথা নিচু করে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে, উভয়সংকটে পড়েছে যেন। বর-বউও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওরা ওদের বাপের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ বাবা ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, 'কী, সওদাটা তোদের পছন্দ?'

মেথর ছেলেটাকে সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে'—ওর মুখ দিয়ে বেরোলো।

'ছাই ঠিক আছে!'—বাবা হঠাৎ এমন জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পর্যন্ত চমকে উঠলো।—'তার মানে এই যে, তোরা যা করেছিস, ভুল করেছিস। তুই এখানে বাপের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলি,

নাকি নিজের হেকমত দেখাতে এসেছিলি! যে, দ্যাখো, আমি কত বড়ো নরপুঙ্গব দ্যাখো, বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছি! তুই হিরোগিরি দ্যাখাতে এসেছিলি তাই না? আর দারোগা বলে দিল বলে পিটটান দিচ্ছিস—কাপুরুষের মতো? তবে কি তুই ভেবে এসেছিলি এই কসবার লোক ফুলমালা পরাবে তোর গলায়, তোর কপালে রাজটিকা দেবে? তোর জয়জয়কার হবে আর তুই সবার বুকে চড়ে বুক-চেতিয়ে ঘুরে বেড়াবি বাজারে? এখন কোথায় গেল তোর সেই তেজ? তুই চুরি করে এসেছিস, নাকি লোকের বউ ভাগিয়ে এনেছিস? এতো ভয় পাচ্ছিস কেন?'

'সেটা এনাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন...' মেথরটার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। থানাদার ক্ষেপে গেলেন, 'আপনি নেতাজী দয়া করে এখান থেকে চলে যান। এটা ল অ্যাণ্ড অর্ডারের মামলা। আশ্চর্য! আমি যত উত্তেজনা সামলানোর চেষ্টা করছি, আপনি ততই এদেরকে উসকানি দিয়ে চলেছেন? যান, এখান থেকে আপনি যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন।'

'বেশ তো। আপনি আপনার কাজ করুন। আমিও আমার কাজ করছি'—বলতে-বলতে বাবা ওখানেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। আবর্জনার স্তূপটার ওপর।

মাস্টার রামদত্ত ওঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেন, 'চল ভাই, চল।'—কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাবা নড়বার পাত্র নন। ভবা এগিয়ে এসে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, বাবাকে অবাক চোখে দেখছে সে। ভবার ছেলেটাও দোতলা থেকে নেমে ওঁর পাশে এসে দাঁড়ালো।

'ঠিক আছে রমদা। ওনাকে ল অ্যাণ্ড অর্ডার করতে দাও। আমিও নিজের কাজ করছি। কি নাম ভবা তোর ছেলের? লছমন?'

'হাঁ হুজুর। আপনার বেশ মনে আছে দেখছি!'

'আমি হুজুর নই ভবা। তোর হুজুর তো ওই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার নাম নারায়ণলাল টাম্‌টা। তুইও আমাকে চিনিস না নাকি? বৌমার নাম কী?'

'বলছিস না কেন?'—লছমন ধমক লাগায়।

'ভাগবন্তী।'—মেয়েটি নিচু গলায় জানালো।

'কোথায় কাজ করিস, লছমন?'

'পিলিভিতে। ডিসপেন্সারিতে।' লছমন একটু ভ্যাবাচাকা হয়ে পড়েছে।

'ছুটি নিয়ে এসেছিস? ক'দিনের?'

'আজ্ঞে, পনেরো দিনের।'

'তবে? তুই ছুটি ফুরনো পর্যন্ত এখানেই থাকবি, বুঝেছিস? কাল তোদের রীতি অনুযায়ী বিয়ে হবে, আর্যসমাজে।' বাবা উঠে দাঁড়ালেন। যেন বরকে নয়, ভিড়কে সম্বোধন করছেন তিনি।

'বিয়ে তো হুজুর, হয়ে গেছে। আমাদের রীতি অনুযায়ী।' ভবার গলাটা এমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে কেন? কুন্দন ভাবলো।

'সে-সব ঠিক আছে ভবা। কিন্তু একবার আর্যসমাজেও হয়ে যায় যদি, ক্ষতি কি? আমরাও সামিল হবো।'

'হুজুর, ক্ষতি তো কিছু নেই। কিন্তু...লোককে আবার মিছিমিছি ভড়কে লাভ কি? আর্যসমাজওয়ালারাও ল্যাঠা সামলাতে যাবে কেন?'

'তুই এসব ভাবিস না ভবা, আমি রয়েছি তোর সঙ্গে। তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম। আর্যসমাজীদের কাছে এটা ল্যাঠা কিসের? ওটা গড়া হয়েছে কি করতে? এই পরিস্থিতিতে ওরা যদি সহায় না হয়, তবে হবেটা কে? তুই বুঝতে পারছিস তো?...' বাবা ভবার কাঁধ ধরে ঝাঁকান।

'আমরা কোর্টে যাবো। আর্যসমাজে যাবো কেন?' লছমন ক্ষেপে গেল হঠাৎ।

বাবা হেসে ফেলেন। 'কোর্টে গিয়ে কী করবি রে লছমন? ...আমাদের আসল কোর্ট তো হলো এরা—' বাবা ভিড়ের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখান। ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েকজন হাততালি দিয়ে উঠলো।

থানাদার আর দম কষে থাকতে পারলেন না। এগিয়ে এলেন। কটমট চোখে একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে, বাবাকে বললেন, 'দেখুন নেতা মশাই, আপনি অযথা কথা বাড়াচ্ছেন। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার আপনি কে? আমি আপনাকে বললাম, কেটে পড়ুন এখান থেকে। আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ সজোরে শিস্ দিয়ে উঠলো। লছমন একঝলক সেদিকে তাকিয়ে, বুক ঠুকে বললো, 'আমরা এখানেই থাকবো, এখানেই। কে কি করে দেখবো!'

'চোপ্ শালা! ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করিস না।'—থানাদার দাবড়ানি দিলেন, 'মেরে তক্তাপেটা করে দেবো। বুঝেছিস? দাঙ্গা বাধাতে চাস শালা?'

বাবা সামান্য এগিয়ে এলেন—'দাঙ্গা তো বাধাচ্ছেন আপনি, দারোগা মশাই! আপনি নিশ্চিন্তমনে ফিরে যেতে পারেন। আমি জিম্মা নিচ্ছি। দাঙ্গা-টাঙ্গা কিছু বাধবে না। এ-শহরের মানুষ অতটা বেআক্কেল নয় যতটা আপনি ভাবছেন। আমি এদেরকে জানি। এই ছেলেটাকে আপনি ভয় খাওয়াবেন না। একে পুরুষের মতো সমাজের মোকাবিলা করতে দিন। একে আর এর বউকে এদের মাঝেই বাস করতে হবে। আপনি কতদিন এদের পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াবেন? আপনি এদের আর সমাজের মাঝখানে না এলেই মঙ্গল। এটা মোটেই ল অ্যাণ্ড অর্ডারের মামলা নয়, দারোগা মশাই। এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমারও আছে।'

'অদ্ভুত পাগল লোক তো!' থানাদার ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন, 'মশাই, আমাকে

ল অ্যাণ্ড অর্ডার শেখাবার আপনি কে? আপনি নেতা হতে পারেন নিজের বাড়িতে। যান, মানে-মানে কেটে পড়ুন দেখি এখান থেকে।'

হঠাৎ...এ কী! রামদত্ত মাস্টারের দমফাটা হাসিতে হকচকিয়ে গেল সবাই। হাসতে-হাসতে ওঁর বিষম লাগে আর কি! কুন্দনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁর দিকে তাকায়। সকলে হতভম্ব! থানাদার চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকাল।

'শুনুন দারোগা মশাই, যে লোকটির পাল্লায় আজ আপনি পড়েছেন, উনি নেতা-টেতা কিছু নন। আপনারই স্বজাতি। এই পাবলিককে শুধিয়ে দেখুন। আপনি এই থানার চার্জ নিয়েছেন ক'দিন হলো—বাই দ্য ওয়ে?'

প্রতিটি চোখ থানাদারের মুখের ওপর নিবদ্ধ। থানাদারের কপালের যাবতীয় রেখা-উপরেখা একসঙ্গে ফুটে উঠেছে। ভুরু কুঁচকে তাকান তিনি রামদত্ত মাস্টারের দিকে। এতক্ষণ একটা ছিল, এখন দেখছি দু-দুটো পাগল! সাহস দ্যাখো পাগলটার!

'ইনি হলেন, মশাই, নারায়ণরাম টাম্‌টা। প্রাক্তন পাটোয়ার, বৃটিশ জমানার। বুঝলেন কিছু? কানুনগো হতে চলেছিলেন, মাতৃভূমির খাতিরে তাকে লাথি মেরে জেলে চলে যান। সেটা না করলে, ইনি আজ অন্তত ডেপুটি কালেক্টার হতেন, আর আপনি হতেন এঁর অধীনস্ত কর্মচারী। এবার বুঝেছেন? তোমরা কী বলো হে? আমি কিছু ভুল বলেছি?'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বুড়ো বেরিয়ে আসেন, হাতের লাঠিটা বার-দুয়েক মাটিতে ঠুকে তিনি বলেন, 'সত্যি বলেছো মাস্টার। এই শহরে পাটোয়ার মশাইকে চেনে না এমন লোক আছে নাকি? ইনি নেতা-নেতা বলছেন কেন? নারায়ণরাম জনসেবক, নেতা-টেতা কিছু নন, এটা তুমি এনাকে বুঝিয়ে বলো।'

রামদত্ত মাস্টারের মুখে একটা দুষ্টুমি-ভরা হাসি খেলে গেল। 'এক্কেবারে হক কথা বলেছো দাদু। ইনি সত্যিসত্যি নেতা হলে দারোগা মশাই এঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলতেন? উপহাস করতে পারতেন?'

সমবেত হাসি। করতালির করকাপাত। থানাদারের মুখ ক্রোধে আরক্ত, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। হাতের ডাণ্ডাটা দিয়ে নিজের জঘনে প্রহার করেন তিনি। 'ঠিক আছে, আপনারা যা ইচ্ছে যায় করুন। আমি নিজের ডিউটি করছি' কয়েক পা এগিয়ে তিনি একজন কনেস্টবলের দিকে ঘুরে বললেন, 'তোমরা এখানেই থেকো। কিছু ঘটলে আমাকে খবর দিও। বুঝেছো?' বুটের খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে কিছুটা এগিয়ে আবার থামলেন, পেছন ঘুরে বললেন, 'অ্যাই ভবা, শোন, তোর ছেলেকে একটু বাদে থানায় পাঠিয়ে দিস। কাজ আছে।'

'আচ্ছা হুজুর।' ভবা হাতজোড় করে মাথাটা অনেকখানি নিচু করে নিল, 'হুজুরের আদেশ শিরোধার্য।'

'ছেলেকে থানায় পাঠানোর কোনো দরকার নেই, ভবা। এ পুলিশের চাল, ভয় খাওয়ানোর। বুঝেছিস?' কথাগুলো বাবা থানাদারের চোখে চোখ রেখে বললেন।

'এবার চল ভাই, আমাদের কাজ তো চুকেবুকে গেল।' মাস্টার রামদত্ত বাবার হাত ধরে টান মারলেন, 'কি রে লছমন, পালাবি না তো?'

'না আজ্ঞে, আমি পালাতে যাবো কেন? পালাবে আমার জুতো।' লছমন নিজের বউয়ের দিকে তাকায়। বউটাও হাসছে। কেমন ঠ্যাটা আর বেহায়া দ্যাখো! ...মনে-মনে ভাবলো কুন্দন। রামদত্ত মাস্টার হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'তবে তো তুই নির্ঘাৎ পালাবি। জুতো জোড়া তোর পায়েই থাকে কিনা!'

লছমন একটু লজ্জা পেল। বউটাও হেসে উঠলো, আনত মুখে। ভিড় ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। লোকের হাসিও কানে আসছে। একমাত্র বাবার মুখেই হাসি নেই। ওঁর মুখটা কেমন শক্ত দেখাচ্ছে! রামদত্ত মাস্টারের কাঁধের ওপর ভর রেখে এমনভাবে হাঁটছেন, যেন পায়ে মোচ লেগেছে।

'চল ভাই, তাড়াতাড়ি চল। লেংচে-লেংচে হাঁটছিস কেন?' রামকাকা বলেন, 'অনেক দেরি হয়ে গেল। বেচারি ভাগী হয়তো চিন্তা করছে। তুই তো যেখানে যাস, সেখানেই একটা করে কাণ্ড বাধিয়ে ফেলিস!'

'তুমিই তো টেনে আনলে আমাকে। এসব তোমারই কারসাজি বামুন ঠাকুর।' বাবা রাগত গলায় বললেন।

কুন্দনেরা বাড়ি এসে পড়েছে। 'এক ঘুটুক চা খেয়ে যাও'—বাবা আখুটি জানালেন। কিন্তু রামকাকার ভীষণ তাড়া রয়েছে। উনি যাবেন, শুনবেন না। বাবা বিরসবদনে অন্ধকার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

'নারায়ণ, একটা কথা জেনে রাখ। কালই যদি এই লোকগুলো কসবা ছেড়ে না পালায়, আমার নাম বদলে দিস।'

'কি বললে?' অন্ধকার সিঁড়ির মুখেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন বাবা। 'রমদা! ও রমদা!...' কিন্তু রমদা ততক্ষণে বাবার নাগালের বাইরে ঘন অন্ধকারে, না-জানি কতদূর এগিয়ে গিয়েছেন।...

কিন্তু রামকাকার নাম পাল্টে ফেলার মতো নির্বন্ধ সত্যিসত্যি আর ঘটেনি। ঘটেছিল বটে, কিন্তু যেমনটা উনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তেমনটা নয়। লছমন আর ওর বউ শহর ছেড়ে চলে যায় শুধু। ঐ ঘটনার পরদিনই। কুন্দনের মানে আছে, বাবা যখন খবরটা প্রথম শোনেন বদলু মিয়ার মুখে, বাঁ হাতের তালু দিয়ে বার তিনেক নিজের কপাল চাপড়ে বাবা শুধু এটুকু বলেছিলেন, 'বাহ্‌ রে বামুন-বুদ্ধি!'

ভাগীরথী ওরফে রামকাকার পর্ণকুটির

প্রেসের নাম অধিকার প্রেস। সেইমতো কাগজের নামও রাখা হয়েছিল 'অধিকার'। বাবা ওরফে নারায়ণরাম টাম্‌টার আপত্তি ছিল নামটায়। মন্তব্য করেছিলেন, 'এ দেখছি বিসমিল্লায় গলদ।'

'এখন যা হবার, হয়েছে।' গুড়গুড়িটা বাবার দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বলেছিলেন রামকাকা, 'নাম নিয়ে তোর কি হবে? কাজ নিয়ে মতলব। এডিটার হয়েছিস, নাকি ইয়ার্কি?'

বাবা হুঁকোটা হাতে নেন বটে, কিন্তু মুখে ঠেকান না। ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর ঠোঁটদুটো কিছু বলার জন্যে কাঁপছিল, বিড়বিড় করে কিছু বলেওছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

কিন্তু যে-কথা তিনি রামদত্ত মাস্টারকে মুখ ফুটে বলতে পারেন নি, পথে আসতে-আসতে তা নিজের দ্বিতীয় বন্ধুটিকে বলে ফেলেছিলেন। এমনিতে কুন্দন তখন আর ছোট্টটি নেই, প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে মিশন স্কুলে ভর্তি হয়েছে, ক্লাস এইটে পড়ে। 'নেতাজী'র বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হয়ে ওঠার প্রথম সিঁড়িটি ছুঁয়ে ফেলেছে। তিনিও যে মিড্‌ল ক্লাস পাশ, হলেই বা পুরনো জমানার।

সেদিন মঙ্গলবার। মানে, মঙ্গলবারের বিকেল। কি মঙ্গলবার বিকেলের দিকে তাঁর ভৈরবথানে যাওয়া চাইই, এবং সঙ্গে যাবে কুন্দন ভৈরবথান, কেন-জানি ওর তখুনি মনে হতো, একটা ছুতো মাত্র। আসল ভৈরব তো ছিলেন রামকাকা, আর আসল ভৈরবথান ছিল মন্দিরের ওপাশে পাহাড়তলির গা ঘেঁষে ঐ ছোট্টো কুটিরটি, কুন্দন আদর করে যার নাম দিয়েছিল 'রামকাকার পর্ণকুটির'।

কুন্দনের কাছে, মঙ্গলবার মানেই ছিল উৎসবের দিন। বরং বলা যেতে পারে, বাদবাকি ছ'টা দিনও রামকাকার পর্ণকুটিরটিও ওর স্বপনে-জাগরণে সর্বক্ষণ ঝলমল করতো।

রামকাকার সন্তান বলতে তিনটি। তিনটিই কন্যা। বড়ো মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়েগেছিল অনেকদিন। মেজো গোমতী তখন ভি.টি.সি. করে, যে স্কুলে রামকাকা পড়াতেন, সেখানেই শিক্ষকতা করছে। তারও বিয়ে মোটামুটি ঠিক হয়েই ছিল। ভাগীরথী গোমতীর চেয়ে পাঁচ-ছ বছর ছোটো—বয়েসে প্রায় কুন্দনের সমান।

রামকাকা বাবার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। আসামাত্র একসঙ্গে বেরিয়ে যেতেন ভৈরবথানের দিকে। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে ফিরতেন ঘণ্টা খানেক পর। ঐ সময়টুকু কুন্দন আর ভাগীরথী হয় খেলা করতো, নয় গল্প করতো। হাতে কাজ না থাকলে গোমতীদিও ওদের কাছে এসে বসতো। এক ঘণ্টা মনে হতো যেন এক মিনিট, নির্দিষ্ট সময়সীমা ফুরিয়ে যেতেই দূর থেকে ভেসে আসতো

বাবা আর রামকাকার গলা। অর্থাৎ, যাওয়ার পালা। কিন্তু না, বিতর্কের জোঁক তখনও দু'জনকে ছাড়তো না। বাড়িতে ফিরেও তার রেশ দস্তুরমতো বজায় থাকতো।

'ওরে ভাগী, চট্ করে চা নিয়ে আয় তো মা।'—বাড়িতে ঢোকার পর এই হতো রামকাকার প্রথম কথা। আর মিনিট ক'য়েকের মধ্যে পেতলের রেকাবির ওপর দু'গ্লাস ভর্তি চা এনে হাজির করতো ভাগীরথী, আর বাবার মুখ দিয়ে 'আহা!' না বেরনো অব্দি অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো। ভাগীর হাতের চায়ের এই 'আহা' কুন্দন তিন বছর ধরে শুনে আসে আর ভেবে পায় না যে তারিফ করার মতো এমন কী রয়েছে তাতে। ওর বড়ো বোন তারা শুধু চা নয়, খাবার পর্যন্ত বানাতে পারে, অথচ তারিফ তো ছার, সারাক্ষণ বকুনি খেয়ে মরতে হয় ওকে। প্রথম প্রথম বাবাই ওকে নিয়ম করে পড়াতে বসতেন, পরে তাও ছেড়ে দেন। একে সময়াভাব, প্রেসের কাজ। তায় মা মাঝেমধ্যে ঠোনা মারেন, ওকে পড়িয়ে কী হবে? ছেলে দুটোকে পড়াও, সেটাই ঢের। বাবার খারাপ লাগতো, পরে গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইদানিং কেন-জানি একটু খিটখিটেও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একদিন এমনি ঠোনা মারলে বাবা একেবারে খেঁকিয়ে ওঠেন, 'যা, এখন থেকে তোর মা-ই তোকে পড়াবে।' এবং সেইদিন থেকে পড়ানো ছেড়ে দেন। মা আবার পড়াবে কি? এদিকে কুন্দনকেও একটু এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিল তারা। আগে ভাগীর সম্পর্কে কুন্দন যখন ওকে কিছু বলতো, বেশ উৎসাহ দেখাতো ও। এখন ভাগী কেন, কুন্দনের প্রতিও কোনো আগ্রহ নেই। বাবা আর কুন্দনের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে আড়ালে কী-সব কথা হয়, তা নিয়েও কৌতূহল দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে তারা। কুন্দন টের পায়, বাড়ির সবাই, সব-কিছু কেমন যেন বদলে বদলে যাচ্ছে। এমনকি বাবাও। পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটু বাতিক ছিল ওঁর, কিন্তু ইদানিং কী যে হয়েছে, সেদিকে নজর দেওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে, সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা-অভিযানও বন্ধ করে দিয়েছেন। একসময় একটা জিনিসও বেঠিক জায়গায় দেখতে পেলে বাড়ি মাথায় তুলতেন, আর এখন চোখের সামনে আবর্জনার পাহাড় জমছে দেখেও অদেখা করেন। ব্যাপারটা কুন্দনের চোখে আনকোরা ঠেকে, ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। ওর মনে হয়, বাড়ির সবাই একে-অপরের প্রতি শুধুশুধু খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

সেটা ছিল মঙ্গলবারের এমনি এক বিকেল। রামকাকার পর্ণকুটিরের সিঁড়িতে বসে সকালের কথা ভাবতে-ভাবতে কুন্দনের চোখে জল এসে যায়। ছলছল চোখে সূর্যের লাল গোলাটাকে, কেঁপে-কেঁপে, একটু-একটু করে ডুবে যেতে দেখছিল ও।—সামনে, পাহাড়ের পেছনে। ভাগীরথী তখন ওর দিদির সঙ্গে কাজে ব্যস্ত। ওদের কলকল হাসি এসে লাগে ওর কানে। ওর কিছুই ভালো লাগছিল না—সূর্যের রক্তাভা, পাহাড়তলির ঢাল বেয়ে নেমে পড়া শীর্ণ নদীর রজতকণার মতো

চিকচিকে জল, সবুজ ক্ষেতের আঁকা-বাঁকা সিঁড়ি, সোনার সূঁচের মতো হিজলের ঝলমলে ঝালর, কিছুই না। বাবার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে, কেন ফেলে দিয়ে গেলেন ওকে, উদাস ও একলা? ভাগীরথীর ওপরও রাগ হচ্ছে, যেন জেনেশুনেই তিরস্কার করছে ও।

সূর্যের গোলাটা খাতগহ্বর সহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু উঁচু-নিচু উলঙ্গ টিলার চতুর্দিকে সোনালি আলো বিকীর্ণ করছে। অথচ কুন্দনের মন জুড়ে সেই সকাল থেকেই কালো কালির ছোপ। হঠাৎ কী হলো, একাকী ঠায় বসে থাকতে-থাকতেই সকালে শোনা সেই কথাগুলো চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ধরে সহসা এবং সেই বেষ্টনী ভেদ করা ওর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

'তুই গিয়ে ওনাকে বলে দে রামী, শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'কাকে শ্রদ্ধা করছো?'

'তোর। তোর বাপের। কতো করে বোঝাবো তোকে?'

'তুমি জানো আর তোমার কাজ জানুক। আমি ওসবে নেই।'

'আমি কারও গোলামি করতে পারবো না। তোর বাপেরও না।'

'তবে যাও, গিয়ে ওই খাদি আশ্রমওয়ালাদের গোলামি করো।'

'শোন রামী। তোর জন্যেই এই জোয়াল আমি কাঁধে নিয়েছি। ওখানে আমার কাজের কড়িমাত্র মূল্য নেই। আমি বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারিনি রামী। কিন্তু দেশ-দুনিয়া দেখেছি, তোর বাপের চেয়েও বেশি। লেখাপড়া জানলেই হয় না। প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা গলানো, প্রত্যেক কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ!... তোকে খুশি করতে আমার নাম দিয়ে দিয়েছেন—তাতে কি?'

'তা'লে ছেড়ে দিচ্ছো না কেন? বসে-বসে আমার মাথা খাচ্ছো শুধু।'

'তোর মাথা খেতে যাবো কেন রামী? আজ একবছর হতে চললো নিজেরই মাথা খাচ্ছি। ...শ্বশুর মশায়ের গোয়ালে বাঁধা ঐ গাইটিকে দেখেছিস। ওরও অবস্থা আমার চেয়ে ভালো।'

'দড়ি ছিঁড়ে পালাও তুমি। কে আটকাচ্ছে তোমাকে?'

'তুই, আবার কে? এতোই যদি সহজ হতো, তবে দুঃখটা কিসের? আর ঐ একটাই গোয়াল হলে কথা ছিল। আসল গোয়াল তো হলি তুই, এখান থেকে পালাই কোথায়?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বেঁধে রেখেছি তোমাকে। না তুমিই বেঁধে রেখেছো আমাকে? আমার তো পোড়া কপাল, তাই তোমার পাল্লায় পড়েছি। যা করার করো, আমার মাথা খেয়ো না।'

বিছানায় শুয়ে থাকতে-থাকতে আবার ঘুম পাচ্ছিল কুন্দনের। পরের কথাবার্তা হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা ও নিজেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ভোরবেলাকার ঐ ভাঙা-সংলাপ বিকেলের মুখে আবার এসে জোড়া লাগে হঠাৎ। তফাৎ শুধু এই যে এবারের প্রতিপক্ষ মা নন, সে নিজে। হ্যাঁ, ভৈরবথানের পথে, গির্জাঘরের মোড়ে কুন্দন হুট করে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসে। ও নিজেই জানে না, কেন প্রশ্নটা করে বসল, ...'এডিটার মানে সম্পাদক, তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ, কেন? এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?' বাবা হঠাৎ সাপ দেখার মতো চমকে ওঠেন।

'আমাদের হিন্দী বইয়ে লেখা আছে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী খুব ভালো সম্পাদক ছিলেন আর বড়ো-বড়ো লেখকদেরকে পর্যন্ত শুধরে দিতেন।'

'ওহো।' বাবা হেসে ওঠেন, 'লেখকদেরকে নয় রে বোকা. ওঁদের ভাষায় ভুলত্রুটি কিছু থাকলে শুধরে দিতেন। এটুকু তো সম্পাদকরা করতেই পারেন।' ...একটু থেমে বললেন, 'তুই জানিস, আমিও একজন এডিটার? তোর দাদুর 'অধিকারে'র?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—অধীর আগ্রহে বলে উঠলো কুন্দন, 'এটুকুও জানবো না? প্রত্যেক সপ্তায় বাড়িতে আসে যে। আমিও পড়ি, মাও পড়ে।'

'আচ্ছা? বল দেখি, অধিকার পড়তে তোর কেমন লাগে?'

'আমার?' কুন্দন এক মুহূর্ত চিন্তা করে গম্ভীর মুখে বললো, 'অধিকার তো আমার খুউব ভালো লাগে। কিন্তু মা-র বোধহয় লাগে না। মা বলে, তোর বাবার তো এতে কিছুই দেখছি না। কে-জানে কেমন এডিটার!'

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাবা। কুন্দনের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। তারপর হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন, 'তোকে কে বলে দিয়েছে যে নারায়ণ এডিটার? সে এডিটার নয়, বুঝলি, ডেসপ্যাচার। ডেসপ্যাচার কাকে বলে জানিস?'

দিব্যি তো হাসিখুশি মুড ছিল, হঠাৎ এই চটাচটি কেন রে বাবা! ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে ও। ভোর বেলা শোনা কথাগুলো সহসা মনের মধ্যে জেগে উঠলো। বোকার মতো মাথা নেড়ে দিল ও।

'গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা রেজিস্টারে চড়ায় যে, তাকে বলে ডেসপ্যাচার। বুঝেছিস?'

'বু-বুঝেছি।' কুন্দন তোতলায়। তারপর দুজনের মধ্যে আর কথা হয় না। ওরা হাঁটতে থাকে।

সেটা ছিল মঙ্গলবারের বিকেল। তারপর আরও শত-শত, হাজার-হাজার মঙ্গলবার পেরিয়ে গেছে। এখন তো খেয়ালই থাকে না, আজ কী বার। যে বারই হোক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু তখন অবশ্যই এসে যেতো। ...কেননা মঙ্গলবারের

বিকেল মানেই ভৈরবথানের দিকে বেড়াতে যাওয়া, নারায়ণরাম টাম্‌টার গল্পের ঝুলি, রামকাকার পর্ণকুটির। ...আর হ্যাঁ, মঙ্গলবার মানেই ছিল ভাগীরথী।...

পশ্চিমাকাশের গাঢ় রক্তাভায় ক্রমেই একটা কালিমার ছায়া পড়ছে। খোলা জায়গায় পড়ে থাকা বাসি কালচে রক্তের মতো। পাহাড়গুলো যে একটু আগে পর্যন্ত ঝলমল করছিল, এখন সব কালো চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে। সামান্য একটু করুণ আলো এখনও রয়ে গেছে অবশ্য। দিনের উজ্জ্বল আলোয় প্রকৃতির যে অংশটি চোখে পড়ে না, অন্ধকার ঘনিয়ে আসার প্রাক-মুহূর্তে এহেন আলো-আঁধারিতে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধরা পড়ে যায় সহজে। পাহাড়ের এক-একটি ভাঁজ, এক একটি রেখা, গাছ-গাছালির এক-একটি পাতা এই মোলায়েম আলোয় কেমন উজ্জ্বল হয়ে ফোটে!

আচমকা ওর চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে এলো। গাছ, পাহাড়...সমস্ত কিছু এক কোমলতর গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সহসা। ব্যাপারটা ঠাহর করতে একটু সময় লাগে কুন্দনের। ...'কে বল তো!' ...পেছন থেকে চোখের ওপর চেপে বসা কচি-কচি দুটি হাত। এতো ছোটো-ছোটো আর নরম হাত গোমতীদির হতে পারে না। ...'ভাগী!' ও বলে উঠলো আর খপ্ করে হাত দুটো ধরলো। ভাগী তখনও ওর চোখের ওপর থেকে হাত সরায়নি। কুন্দন দূর থেকে গোমতীকে হাসতে শুনলো। তবে কি গোমতীদিও কোথাও বেরোচ্ছে নাকি?...কুন্দন হাত সরানোর কপট চেষ্টা করতে-করতে মনে-মনে বললো, 'ভাগীরথী, এখুনি হাত সরিয়ে নিস না তুই। আমার এমনিই ভালো লাগছে।' ...কিন্তু পরক্ষণেই ভাগীর হাত সরে গিয়ে সমস্ত দৃশ্য আবার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। সমস্ত মজা মাটি হয়ে গেল।

'তোরা কিন্তু কোথাও যাস না। আমি এখুনি ওপার থেকে আসছি।'—দূর থেকে গোমতীদির গলা শোনা গেল। খাড়াই জঙ্গলের শীর্ণ রাস্তার ওপার থেকে।

ভাগীরথী তখনও হেসে চলেছে। কুন্দনের হঠাৎ মনে হলো কারা যেন এদিকেই আসছে। তবে কি এক ঘণ্টা ধরে ও এই সিঁড়ির ওপরেই বসে রয়েছে! ...কিন্তু না, ওদের পায়ের শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আজ ওঁরা এতো দেরি করছেন কেন? আজ এমনি-সব আজগুবি ব্যাপার ঘটে চলবে নাকি?

'কুন্দন, এখানে একা-একা বসে কী ভাবছিস রে?' ভাগীরথী ওর পাশে এসে বসলো, 'আমাকে দেখতে পাস নি তুই? সেই কখন থেকে তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি! তুই কোথায় হারিয়ে গেছিলি বল তো?'

কুন্দনের বুকের ভেতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। ওর চোখদুটো আপনাআপনি ঝাপসা হয়ে এলো। ও মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'তুই আমার ওপর রাগ করেছিস কুন্দন?'

কুন্দন আলতো করে মাথা নাড়লো। না। ও ভাগীর ওপর রাগ করতে যাবে কোন দুঃখে? ...হঠাৎ ওর ইচ্ছে হলো ও ভাগীরথীর সামনেই হাহাকার করে কেঁদে ওঠে, আর ভাগীরথী নিজের হাতে ওর চোখ মুছিয়ে দিক, ওকে সান্ত্বনা দিক। ও হয়তো কেঁদেই ফেলতো, কিন্তু গোমতীদির কথা মনে পড়তেই, ঝটিতে উঠে পড়লো, ভাগীরথীও উঠে পড়লো। কুন্দনের একটা হাত ধরে দোলাতে-দোলাতে সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওই পাহাড়টার নাম জানিস?'

...এই মুহূর্তে পাহাড়ের নাম জানার কোনো কৌতূহল কুন্দনের নেই। তবু, ভাগীরথীর মনরক্ষার জন্যে কৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ করে বললো, 'না তো'...

'আরে, তুই এইটুকুনও জানিস না? ওর নাম দুনাগিরি। লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদের শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন, হনুমান তখন লঙ্কা থেকে উড়ে সোজা এই পাহাড়ে এসে নামেন আর গোটা পাহাড়টাই উপড়ে নিয়ে যান।'

'বাঃ পাহাড়টা তো যেমনকার তেমনি আছে! উপড়ালেন কোথায়?' কুন্দন জেনেশুনে বোকার মতো প্রশ্ন করলো।

'আরে বাবা, হনুমানজী এটাকে এখানে ফেরৎ রেখে যান।' কুন্দনের বুদ্ধির বহর দেখে সত্যিসত্যি করুণা হয় ভাগীরথীর, উনি তো শুধু সঞ্জীবনী শেকড় নিতে চেয়েছিলেন। চিনতেন না, তাই পুরো পাহাড়টাকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাজ হয়ে যাবার পর আবার ফেরৎ রেখে গিয়েছিলেন। সত্যিই জানতিস না তুই?'

'জানতাম।'

'জানতিস! তবে?'

'তবে আর কি! কুন্দনের একদিকে কেমন-যেন লজ্জা-লজ্জা করছিল, আবার অন্যদিকে দুষ্টুমি করতেও মন চাইছিল। সঞ্জীবনী বুটি! ওর হঠাৎ কী হলো, বলে উঠলো, ভাগীরথী, কাকা আর বাবা তোর চায়ের এতো তারিফ করেন কেন জানিস? ওটা সত্যিকারের প্রশংসা, না মিছিমিছি, বুঝিস কিছু?'

ভাগীরথী অবাক চোখে হেসে উঠলো, 'কেন, মিছিমিছি আবার কি?'

কুন্দনের ইচ্ছে করলো, বলে দেয়, একবার আমাকেও খাইয়ে দ্যাখ। আমি যদি তারিফ করি, সেটা হবে সত্যি। নইলে মিছিমিছি। আবার কি! কিন্তু মনের কথা মুখ ফুটে আর বেরতে পারে না। ও প্যাঁচার মতো গোল-গোল চোখ করে ভাগীরথীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু।

এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা বুঝি একটু বেশিই বুদ্ধি রাখে। অন্তত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। নইলে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ভাগীরথী বলে ফেললো কি করে, 'তুই যদি আমার হাতের চা খাস, তাহলে তুইও মানতে বাধ্য।' কথাটার মধ্যে দারুণ একটা চ্যালেঞ্জ টের পেল কুন্দন। একটা নতুন খেলার গন্ধও পেল। হাতের তালু

উল্টে দিয়ে বললো, 'খাইয়ে দ্যাখ। আমি তারিফই করবো না। আমি বাবা থোড়াই যে অল্পেতেই আহা-আহা করবো!'

ভাগীরথী হেসে কুল পায় না। 'আরে বাবা, তোর খেতে ইচ্ছে জেগেছে সেটা বল না। বাবারাও এসে পড়লেন বলে। ওদের আসার আগে চুপচাপ খেয়ে নে। কাউকে বলিস না কিন্তু, কাউকে না।...' নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ধাঁ করে ছুটে গেল ও ঘরের ভেতরে। ওর পেছনে-পেছনে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো, কুন্দনও রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো, 'গোমতীদি এসে পড়ে যদি?'

'দিদি এতো তাড়াতাড়ি ফিরবে না। কিন্তু তুই এখানে থাকিস না কুন্দন, বাইরে গিয়ে বোস।' ভাগীরথী ওকে আলতো ঠেলে দেয়।

কুন্দন কিন্তু নড়বার পাত্র নয়। এই ভাগীও বিচিত্র! দিদি যখন এখুনি এসে পড়ছে না, তবে ভয় পাচ্ছিস কেন? ও শুধু ভাগীরথীর হাতের চা খেয়েই পরিতুষ্ট হতে চায় নাকি? ওর চা বানানোও দেখতে চায়। এ বোঝায় কী করে?

'কুন্দন! বোঝবার চেষ্টা কর, দ্যাখ্ জেদ করিস না।' ভাগীরথী অনুনয়ের গলায় পীড়াপীড়ি করলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় কুন্দন। কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে মন চায় না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে যখন আশ্বস্ত হলো কোথাও কেউ নেই, তখন পা টিপে-টিপে আবার গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো হেঁশেলের দোর গোড়ায়, সন্তর্পণে। ঠিক যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন বাবা, মায়ের সামনে।

ভাগীরথী ওকে দেখামাত্র ঝটিতে উঠে দাঁড়ালো ঃ 'তুই শুনবি না কুন্দন? তোকে বললাম না,...দিদি ভীষণ রাগ করবে কিন্তু।'

কুন্দন বেশ মজা পাচ্ছিল। 'দিদি রাগ করবে কেন?...আর, এখুনি ফিরছে নাকি?' ...আর ভাগীরথীই বা এরকম করছে কেন? ওকে এমন ভয়াতুর লাগছে কেন? সহসা একটা হিমশীতল ধারা কুন্দনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল যেন! ও আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে এসে বারান্দায় স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। মনের সমস্ত উচ্ছ্বাস এক নিমেষে হাপিস।

ভাগীরথী পেছন-পেছন ছুটে এলো। চায়ের গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললো, 'নে কুন্দন, চটপট খেয়ে ফেল। দিদি এলো বলে।'

ওর ভয়-পাওয়া দেখে কুন্দনের নিজের বুকের ভেতরটাও ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে উঠলো। 'আমি এতো ভয়ে-ভয়ে খেতে পারবো না ভাগীরথী। থাকতে দে।'

ভাগীরথী গ্লাস-হাতে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখের ওপর চোখ পড়তেই কুন্দনের সমস্ত রাগ জল। 'তবে দে, খেয়ে নিই।' ও গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিলো।

কিন্তু এক চুমুক খাওয়ার পর, কুন্দনের না-জানি কী ইচ্ছে জাগলো, গ্লাসটা ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে ধরে বললো, 'তুইও এক চুমুক খেয়ে দেখ ভাগীরথী। চা-টা সত্যি ভালো হয়েছে।'

'য্যাঃ!' বলে দাঁতে জিব কেটে ভাগীরথী দু'পা পেছনে হড়কে গেল। ভঙ্গিটা কুন্দনের এতো ভালো লাগলো যে এবার জেদে পেয়ে বসলো ওকে।

'আমি চা খাই নাকি!' শরীর দুলিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে বললো ভাগীরথী।

'আমিও খাই নাকি? তোর হাতের বানানো খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই খাচ্ছি। এক চুমুক খা না!'

'আচ্ছা দাঁড়া।' ভাগীরথী একটু শিথিল হয়, 'নিয়ে আসছি।'

'না, এতেই খা না। ' কুন্দন কিন্তু জেদে অটল।

ভাগীরথী হাঁ-চোখে তাকায়...'কী? আমি এঁটো খাবো?'

'কারো এঁটো খাস না?' কুন্দন জানতে চাইলো।

'না।' গলায় জোর ঢেলে বললো ভাগীরথীঃ 'এঁটো খাওয়া বাবা পছন্দ করে না।'

কুন্দনের মনে হলো, ভাগীরথী মিথ্যে বলছে। অবশ্যি, ওর বাবাও এঁটো - কাঁটা খাওয়ার একদম বিরুদ্ধে। 'তুই মিথ্যে বলছিস ভাগী'—আহত স্বরে বললো কুন্দন, 'আমি জানি, আমার এঁটো তুই খাচ্ছিস না কেন।'

ওর গলার আওয়াজেই এমন একটা-কিছু ছিল, যে, ভাগীরথী আর 'না' বলতে পারলো না। নীরবে গ্লাসটা ওর হাত থেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এক চুমুক দিয়ে ফেরৎ দিতে-দিতে বললো, 'নে, এবার খুশি তো?'

মুহূর্তের জন্যে কুন্দনের মনে হলো একটা বিরাট দুর্গ জয় করে ফেলেছে ও। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, জোর করাটা ঠিক হয়নি। খুব, খুবই বাজে হয়েছে। ভাগীরথী আনত মুখে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ যেন ওকে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকার দণ্ড দিয়েছে। কুন্দনের বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠলো, ও সামনে গিয়ে ভাগীরথীর একটা হাত ধরল। 'ভাগী! আমাকে ক্ষমা করিস'...ও বলতে চাইছিল কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোলো না। ...না-জানি কতক্ষণ পরস্পরের হাত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। হঠাৎ গোমতীদির গলার আওয়াজ শুনে দুজনেই দারুণ ভাবে চমকে উঠলো।

'কী করছিস রে তোরা এখানে? আচ্ছা!' গোমতীদির চোখ গ্লাসটার ওপরে পড়ে। দিদি দাঁড়িয়ে থেকে দুজনকে আপাদমস্তক বার কয়েক দেখে ভাগীরথীর কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। কুন্দন ওখানেই কাঠের মতো অনড় হয়ে তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। দুটো আওয়াজ ওর কানে আসছিল। ভাগীরথীর কান্না। আর, বাবা আর রামকাকার জোরে-জোরে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসার।

এক হাতে তালি বাজে না

'রমদা, বলো।'

'কি বলবো নারাণ? তোর মতো গেঁতো লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তুই যেতে চাস তো যা। কিন্তু ওখানে গিয়েও যদি না বলে? মাইনে কতো দেবে?'

'যা এখানে দিতো, তাই।'

'যা এখানে দিতো, তাই?' রামকাকার ভুরুজোড়া ঈষৎ ওপরে উঠে যায়— 'কী বলছিস রে নারাণ! আরে, দেড়শো টাকার জন্যে নিজের ঘরদুয়ার ছেড়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে মরবি? তোর মাথা খারাপ হয়নি তো? নিজে কী খাবি, আর ঘরেই পাঠাবি কী?'

'রমদা, আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো আশ্রমেই হয়ে যাবে। তরলা বেন বলে দিয়েছে। যে-বয়েসে এখানকার মেয়েরা সাজ-গোজ ছাড়া কিছু বোঝে না, সেই বয়েসে তরলা বেন বাপ-মার বাড়ি ছেড়ে সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে বাপুর সেবা করতে এসে জুটেছিল। ওকে মীরা বেনের চেয়ে কম ভেবো না।'

'ব্যস-ব্যস ভায়া, থাকতে দে তোর তরলা বেন, মীরা বেন। কতো যুগ ধরে গান্ধী নামের মালা জপছিস তুই! দুনিয়া কোত্থেকে কোথায় এসে পড়েছে, তুই আছিস কোনখানে! সেবা-সেবা করে মরছিস, তোর সেবা নিতে বসে আছে কে? খুব যে বেসিক শিক্ষার ভূত চেপেছিল—শালা তো ছোঁয়া আমাকেও পেয়েছিল! দু'বচ্ছর পণ্ড করে কি পেলাম বল্! আরে, তোর মতো তপস্বীও যখন হার মেনে নিল, তখন ঐ অমলা বেন কমল বেন কী করবে শুনি? তুই লোক না পোক? এতো মার খেয়েও তোর শিক্ষা হয়নি?'

'শিক্ষা হয়েছে রমদা, বেশ ভালোই শিক্ষা হয়েছে। দেখছো না, বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। এখন এর বেশি আর কী করতে পারি?'

'হ্যাঁ, বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা খুব বাহাদুরির কাজ, না? বৌঠানকে জিজ্ঞেস করেছিস?'

'বৌঠানকে?...' বাবার মুখে একটা সলজ্জ হাসি। তিনি কুন্দনের দিকে তাকান এবং অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ব্যস, কিছু করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, কুন্দন ভাবলো। মা আর বাবার মাঝখানে তো কিছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু রামকাকার বাড়িতে মুখ খুলতে কি? ঘরটা কেমন-যেন অদ্ভুত হয়ে গেছে।

'মা তোর খুব রেগে আছে কাকা'—কুন্দনের মুখ দিয়ে দুম্ করে বেরিয়ে গেল। মা যেন কী বলেছিলেন? মা বলেছিলেন, তুই এক ফাঁকে মাস্টার মশায়কে বলিস, মা ডেকেছে। এখন তো দেখছি গণ্ডগোল হয়ে গেল।

'রামীও বিরুদ্ধে, কুন্দনও।' বাবা হাসছেন। যখনই দেখো, হাসছেন! এইজন্যেই মা রাগ করেন।

'গেলবার তরলা বেল যখন আসে, আমাদের বাড়িতে উঠেছিল। রমদা, রামী মুখে যাই বলুক, তরলা বেনকে সেও শ্রদ্ধা কম করে না।' বাবা আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'জানো রমদা, রামী তো দেখেই হাঁ বনে গিয়েছিল। মাড়ুয়ার রুটি আর বাথুয়াশাক তরলা বেন এমন তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছিল, যেন মালপোয়া খাচ্ছে!

'হ্যাঁ। আর মা সেদিন বিনা বিছানায় শুয়েছিল, সেই খবরটাও জানো?'—কুন্দন চিৎকার করে বলতে চাইলো। এই তরলা বেনও একটা বিকট সমস্যা। ফি মাসে একবার করে আসা চাইই।

'রমদা, আমি হলাম গিয়ে মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। যেটুকু শিখেছি, তোমার কাছেই শিখেছি। মনে আছে, তুমি আমাকে অনাসক্তি যোগ শিখিয়েছিলে। সত্যি বলতে কি রমদা, অনাসক্তি কী জিনিস সেটা তরলা বেনকে দেখে বুঝেছি। হীরাভুঙরির সেই পাদ্রিটার প্রবচন? আরে, সেই-যে, যখন যিশুর মা-বাবা এসেছেন যিশুর সঙ্গে দেখা করতে, যিশু ওঁদেরকে বলছেন—আমি কোনো মা-বাবাকে চিনি না, আমি তো আমার পরমপিতার কাজ করছি। এইসব বিলেতি শিষ্যাগুলো রয়েছে না বাপুর, এঁদের অবস্থাও ঐ রকম। ঠিক বলিনি রমদা?'

রামকাকা একটু-যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, 'কী? এই পাদ্রি আবার কোত্থেকে এসে টপকালো? ...ওরে ভাগী, দুটো আংরা এনে দে মা।'

কুন্দন এতক্ষণ যেন এরই অপেক্ষায় বসে ছিল। ঝটিতে হুঁকোটা তুলে নিয়ে ভেতরে গেল আর আংরা ভরে নিয়ে এলো। এখন আর গোমতীর রাজত্ব নেই কিনা। ভাগীরথীই বাড়ির মালিক। সুতরাং উনুনের ধারেও সে চলে যায় অনায়াসে। এরজন্যে বাবা মাঝেমধ্যে ধমকও লাগান। ওঁর একটা কথা কুন্দনের বেশ মনে আছে: 'কেউ অনুমোদন করছে বলে সেটা আগ বাড়িয়ে নিতে হবে, এমন কথা নয়।' রামকাকা যখন বাড়ি আসেন, বাবা ইয়ার্কি মেরে বলেন, 'রামী, আমাদের তো দেখছি নরকেও গতি হবে না! একজন কুলীন বামুনকে আমরা ডোম বানিয়ে ছেড়েছি!'

রামকাকা প্রত্যেক বারই সজোরে হেসে ওঠেন আর বলেন, 'আরে ভাই, আর বাকিটাই বা কী রইলো। গোটা শহর জুড়ে তো এই ডুমিয়া বামুনেরই জয়জয়কার। তাই না বৌঠান?...'

ব্যস, শুধু একটা কথা কুন্দন বুঝতে পারে না যে, সব ব্যাপারে এতো উদারমনা হওয়া সত্ত্বেও রামকাকা নিজের মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এতটা রক্ষণশীল কেন! মেয়েদের জন্যে এখন তো আবার আলাদা মিশন স্কুল খুলেছে। বেচারি

ভাগীর কতো ইচ্ছে করে! কিন্তু রামকাকার সেই এক গোঁ—মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা একেবারে আলাদা রকম হওয়া উচিত। আলাদারকম মানে কী? বাবারও সেই এক রা। এই বুড়োদুটো পারলে কুন্দনকেও পড়তে দেয় না। মিশন ইস্কুলের নাম শুনলেই, না-জানি কেন, এঁরা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন!

আসরে কারও মুখে কোনো কথা নেই। হুঁকো তৈরি না হওয়া অব্দি কথা শুরুই হবে না। আশ্চর্য, হুঁকো ছাড়া এঁরা কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না! কী যে এতো সুখ পান! কুন্দন একবারই টেনে দেখেছিল। ঘেমে-নেয়ে একাকার, চোখে জল এসে গিয়েছিল, সারাদিন কেশে মরেছিল। অথচ এঁদের এক মিনিটও হুঁকো ছাড়া চলে না।

আঙ্গার ভরার অজুহাতে কুন্দন আরেকবার ভাগীরথীর কাছে গিয়ে বসলো। কিন্তু ভাগীরথী ওর দিকে ফিরেও তাকালো না। শুধু ফু-ফু করেই সার। কুন্দন জানে, এই ফু-ফু করলেই আংরা তৈরি হবার নয়।

'ভাগীরথী, বাবা কাকাকে বলে দিয়েছে। উনি রাজি হয়ে গেছেন।'

ধোঁয়ায় বোজা চোখ পিটপিট করে তাকায় ভাগীরথী, 'কী?'

'কাকা কথা দিয়েছেন, তোকে বিশারদের পরীক্ষায় বসতে দেবেন। কাল ফর্ম ভরে দেবেন। প্রথমে না করেছিলেন। বাবার বকাতে ঠিক আছে—ঠিক আছে বলা শুরু করে দিলেন...'

ভাগীরথী ওর মুখের দিকে এমন চোখে তাকায় যেন আগে কখনও ওকে দেখেই নি। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? ভেতরে-ভেতরে খই ফুটতে শুরু করেছে, বাইরেটা এতো বেজার দেখাচ্ছে কেন?

'তুই যদি বলিস, আমিও ভরে দিই।'—কুন্দন নিজের কথায় নিজেই লজ্জা পাচ্ছে কেন?...

'তুই বিশারদ করে কি করবি। দিব্যি তো পড়ছিস—' ভাগীরথীর কথাটা বেশ মিষ্টি লাগলো কুন্দনের কানে।

'এ পড়া আর বিশারদের হিন্দী পড়ার মধ্যে তফাৎ আছে। রামকাকা আমাদেরকে পড়াবেন। উনি কতো ভালো পদ্য পড়ান!' এক নিঃশ্বাসে বললো কুন্দন। নির্ভেজাল মিথ্যে একটা। পড়তে আবার ভালো লাগে কার? এ যে ভাগীরথীর কাছে বসার একটা বাহানা।

'দে, হুঁকোটা এদিকে ধর।...' ভাগীরথী চিমটে দিয়ে আংরা ভরে দেয় হুঁকোয়। ...'ওরে, ও ভাগী...' আসর থেকে ডাক আসে। হুঁকোর জন্যে প্রাণ ছটফট করছে দুজনের। কুন্দন ছুটে গিয়ে হুঁকোটা ধরিয়ে দিল রামকাকার হাতে।

'তুই খৃষ্টান হতে গিয়েছিলি, সেদিনের কথা মনে আছে?' ...বলেই রামকাকা

সজোরে হেসে উঠলেন। বাবাও হাসছেন। এরমধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে, যা কুন্দন জানে না।

'মনে আছে ঐ অ্যাটকিন্সন তোর পেছনে কেমন পড়েছিল?'

'বাহ্ রামদা, এখনও ভোলোনি দেখছি! বেচারির খুব ভরসা ছিল আমার ওপর। ট্রেনিংয়ের জন্যেও তো উনিই পাঠিয়েছিলেন আমাকে।'

'বনে গেলি না কেন খৃষ্টান? তোর তরলা বেন তো আছেই, ওর কাছে দীক্ষা নিয়ে ফেল। দেখছিস না, আমি-তুই গাঁঠের পয়সা খরচ করে বুনিয়াদি-শিক্ষার পাঠশালা খুললাম, কী লাভ হলো তাতে? শূন্য। আমাদের ইস্কুলে ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে যারা সাত-পাঁচ ভাবে, তারা ঐ মিশনারিগুলোর হাতে-পায়ে পড়ছে। আমি তো বলি নারাণ, আজই গিয়ে দীক্ষা নিয়ে ফেল। কাল-দিনে হেডমাস্টার বনে গেলে তোর সাত-পুরুষের আশ মিটে যাবে।'

বাবা নঞর্থক মাথা নাড়েন। রামকাকার কথা তাঁর পছন্দ নয়। কুন্দন ভেতরে-ভেতরে আঁৎকে উঠলো। ওর এই টেনশন ভালো লাগে না।

'ব্যাপারটা হলো রমদা, ঐ কী-যেন একটা প্রবাদ আছে না, কপালে নেই ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি! তাই বলছিলাম, মিশনারিদের দুষে লাভ কি? আমরাই ওদেরকে ডেকে এনেছি। ওদের তো সেবাই ধর্ম। প্রচারও হয়ে যায় তাতে, ক্ষতি কী! আমরা প্রচার করি না, কিন্তু সেবাও তো করি না। ওদের স্বার্থ-পরমার্থ দুই চরিতার্থ হয়, আমাদের দুর্বলতার সুযোগে। এতে আমাদের খারাপ লাগছে কেন? বাপু বলতেন, আমরা যদি নিজেদের ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, তবে যাদের থাকবার থাকবে, যাদের থাকার নেই তারা আপনাআপনি ছেড়ে চলে যাবে। এ যে আমাদেরই পাপ, মহারাজ। একে অন্যের পিঠে চাপিয়ে লাভ কি?'

রামকাকা নিবিষ্ট চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। স্মিত হেসে ধীর গলায় বললেন, 'তাতে কি? হোক নিজের পাপ, কিন্তু লড়াইয়ের এ কোন্ ছিরি যে ময়দান ছেড়েই পালিয়ে যাবো?'

'আমি পালাচ্ছি, কে বললো?' বাবা এতো জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে কুন্দন আঁৎকে উঠলো।

'আরে বাবা, তোর কথা কে বলছে? তুই মিছিমিছি রাগ করছিস। বেশ তো, তুই শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দে, তোর ঐ গান্ধীর বুনিয়াদি-শিক্ষার আইডিয়াটা ফেল মেরে গেল কেন?'

'ফেল মেরেছে, কে বললো?' বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি আমাকে ভরতি হতে দিচ্ছো না, পরীক্ষাও দিতে দিচ্ছো না, তার বাদে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছো যে ফেল করে গেছিস! এ তেমনি কথা। আরে, বাপুর ঐ মহান স্বপ্নটা সুযোগই পেল কোথায়?'

'আবার সেই কথা? সুযোগ মেলে না, তাকে খুঁজতে হয়। এ দেশে বেসিক এডুকেশনের যখন কারও প্রয়োজনই নেই, কারও ভালো লাগে না আইডিয়াটা, তখন তাকে পরখ করবে কে শুনি? দরকারি জিনিসের পেছনে লোকে কেমন পাগলের মতো ছোটে, সে তো তুই দেখছিস। আমাদের ডুমোড়ার বংশীকেই দ্যাখ, ভুলভাল ইংরেজি পড়িয়েই সেন্ট কলম্বাসের হেডমাস্টার ব'নে গেছে। অর্থাৎ, ভুলভাল যেমনই হোক, সবারই চাই ইংরেজি ইস্কুল, তোর বুনিয়াদি শিক্ষা নয়। এই গাঁয়ের হালই যখন এই, তখন বড়ো-বড়ো শহরে কী হবে! আমাদের একটা আধুলি দিতে যাদের প্রাণ ফাটতো, তারা দিব্যি পঁচিশ টাকা খরচ করে নিজেদের সন্তানদের ইংরেজ বানানোর জন্যে খৃষ্টানগুলোর পা চাটছে। যারা তোকে, আর আমাকেও 'ডোম' বলতো, তারা আড়ালে যাই বলুক, মুখের সামনে তো বংশীকে 'ফাদার' বলেই ডাকে। আমি এটাই বলছিলাম তোকে, বুঝেছিস? এই ফাদারল্যাণ্ডে, তুইই বল, এখানে তোর বা আমার জায়গা কোথায়?...কী রে, তোর আবার হাসি পাচ্ছে কেন?'

'ফাদারল্যাণ্ড' শব্দটায় কুন্দন হেসে লুটোপুটি খায় আর কি! কোনো উপায়ে হাসি থামিয়ে বললো, 'ফাদারল্যাণ্ড আর মাদারল্যাণ্ডের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে রামকাকা?'

'হ্যাঁ আছে'—রামকাকা কুন্দনের প্রশ্নটাকে তেমন খেয়াল করলেন না। কিছুক্ষণ হারিয়ে রইলেন নিজের মধ্যে। তারপর বললেন, 'তুই সুযোগ পাওয়ার কথা বলছিস। তোর-আমার আর কী, আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কিন্তু এই ছেলেটার কী হবে? এ ব্যাটা গান্ধীকে মেনে চলবে, না নেহরুকে? হিন্দী শিখবে, না ইংরেজি? নিজের ঘর সামলাবে, না গোটা সমাজের ইজারা নেবে? তুই হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় পাটোয়ারির চাকরিটা ছেড়ে দিলি। প্রমোশনের মুখেই। কেন? সাল্ট আর সালমের দাঙ্গাবাজদের ধরে জেলে পোরা কর্তব্য ছিল না তোর? গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও তোকে এই কথাই বলতেন যে একজন পাটোয়ার হিসেবে সেটাই তোর ডিউটি ছিল।'

'বাজে কথা'—বাবা প্রায় গর্জে উঠলেন, 'কী আলফাল বকে মরছো রমদা! আমি ডিউটি ছেড়ে পালিয়েছিলাম, না অসহযোগ করেছিলাম? আগে ইস্তফা দিয়েছি, তার পরে, যা করবার করেছি।'

'চন্দ্রসিং গাড়োয়ানির নাম শুনেছিস কখনও?'

'তুমি বলতে চাও কি?'—বাবা সজাগ হয়ে উঠলেন।

'পল্টনে থাকাকালীন নিরস্ত্র পাঠানদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। সেটা অসহযোগ ছিল না? কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি যখন সবরমতী আশ্রমে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কী হয়েছিল জানিস? তোদের গান্ধী ঐ বীরপুঙ্গবকে এমন ডিসিপ্লিন শেখালেন যে, উনি কমিউনিস্ট ব'নে গেলেন।'

'হবে হয়তো, তাতে কি?' বাবার মুখটা ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠছে, 'এতে তো এই প্রমাণিত হচ্ছে যে সেটা অসহযোগ ছিল না। বীরে বীরে তফাৎ আছে মহারাজ। বত্রিশ আর বিয়াল্লিশের মাঝখানেও দুস্তর ব্যবধান। তুমিই একবার আমাকে পৃথ্বীসিং আজাদেরও গল্প শুনিয়েছিলে। আরে, সেই যে বিপ্লবী, যিনি গান্ধীজীর আশ্রমে বেশ কয়েকবছর থাকা সত্ত্বেও পরে কমিউনিস্ট ব'নে গিয়েছিলেন। আমি ঠিক জানি না, তুমিই এইরকম কিছু বলেছিলে...'

'হ্যাঁ, তাহলে?' রামকাকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কোমরে হাত রাখেন, যেন ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

'তাহলে আবার কি?' বাবা এক-একটা শব্দ বেঁধানোর মতো করে বলেন, 'কমিউনিস্ট হওয়াটাও বোধহয় সহজ নয়। কিন্তু...আমার মন বলছে, সত্যাগ্রহী হওয়া তার চেয়েও কঠিন। নিজেকে মারা অন্যকে মারার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত। তোমার চন্দ্রসিং গাড়োয়ালি হোন আর পৃথ্বীসিং আজাদ—ওঁরা দুজনেই প্রকৃত বীর ছিলেন, দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা বলে, অতটা বীর ছিলেন না, যতটা তুমি ভাবছো। পৃথ্বীসিং আজাদের সেই চিঠিটা আমি পড়েছি, যাতে কুড়ি বছর খুনোখুনির জীবন কাটানোর পর গান্ধীজীর মতাদর্শ গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন। চিঠিটা গান্ধীজী নিজের কাগজে ছেপেছিলেন। কিন্তু তুমি বলছো, উনি আবার সেই আগের জীবনেই ফিরে গিয়েছিলেন। এতে কী প্রমাণিত হয় শুনি? ...একটা অস্থির, চলমান চিত্তের সেবা? এমন দোলাচলচিত্ত মানুষের বীরত্বের কাহিনী আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? ...তুমি...'

'হ্যাঁ, বীর তো একা তুমি—গান্ধীর চেলা যে!' রামকাকা হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন—'ধ্বংস করে দিলে গোটা দেশের যৌবনটাকে। আজ যে এতো চোরাবালি দেখছিস, এ তারই পরিণাম। আরে, আগে নিজের মুরোদ দ্যাখ, নিজের শক্তি দ্যাখ, তারপর দ্যাখা বাহাদুরী, যতটা তোকে মানায়। মুখপোড়া ভণ্ড কোথাকার, বুলি কপচাবি গীতা আর অনাসক্তির, আরও কতো কী! আর ক্যারাক্টারের বেলায়—জিরো। এরা চালাবে সত্যাগ্রহ? উঁহু! তুই দেখে যা নারায়ণরাম, ...এই ফাঁকিবাজ, নকলবাজ আর কাপুরুষ জাতি হাঁড়ির হাল করে ছাড়বে তোদের সত্যাগ্রহের। এখন থেকেই লক্ষণ টের পাচ্ছিস? এবার কুষ্ঠ হয়ে ফুঁড়ে বেরোবে ঐ লুকোনো ঘা। তখন বুঝবি।'

রামকাকা আবার বসে পড়লেন। সম্ভবত ক্রোধের সাপটাও আস্তে-আস্তে ফণা নামিয়ে নিচ্ছে। এবার হুঁকোর কথা মনে পড়বে। না-না, চা। চা চাই। আরে, ভাগীরথী জেনে ফেললে কি করে?

'বেঁচে থাক মা। শুনলাম, হিন্দীর পরীক্ষা দিচ্ছিস! তা পরীক্ষা দিতে যেতে হবে কোথায়?'

'কোথাও না বাবা, এখানেই টাউন স্কুলে সেণ্টার পড়েছে।...জানি না বাবা আমি পারবো কিনা।'

'পারবি না মানে? তোর হিন্দী তো দেখছি ভালোই। তুই করে নে, তারপর একেও করিয়ে দিস। অল্পসল্প তো তুই শিখিয়ে দিতে পারবি একে। পারবি না?'

'পারবো বাবা।'

দাঁতে দাঁত ঘষলো কুন্দন। গা রি-রি করছে ওর। দেমাক দেখো ছুঁড়ির! আইডিয়া দিল কুন্দন, গৌরচন্দ্রিকা করলো কুন্দন, আর এখন দেখাচ্ছে যেন সবকিছু নিজেই করেছে! হিন্দী শেখাবে কুন্দনকে! ঢং দ্যাখো রাজকুমারীর! আর...এ আবার কী? আমি যেমন রামকাকাকে কাকা বলি, তেমনি ও কাকা বললেই পারে! নিজের বাবাকেও বাবা, আবার আমার বাবাকেও বাবা? এ আবার কেমন আদিখ্যেতে?

আবার কেমন অঙ্গ দুলিয়ে হাঁটছে দেখো গজগামিনী! এখন তোর এখানে কী কাজ? বড়োদের মাঝে?

'বাবা, আজ খাবার খেয়েই যাবেন। ঠিক তো?'

'না মা। তোর কাকিমা রান্না করে বসে রয়েছে হয়তো। আজ অনেক দেরি হয়ে গেল। চল কুন্দন, যাই'—বাবা হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

ভাগীরথী এগিয়ে এসে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। 'না বাবা, আমি আজ আপনাকে যেতে দেবো না। আমি সব বানিয়ে ফেলেছি। খাবে কে?...'

'খেয়ে নে ভায়া, খেয়ে নে। বেচারি কখনও জেদ করে না। আজ এত করে বলছে যখন, ওর মনটাও রেখে নে। কী বানিয়েছিস রে ভাগী? শাকসব্জি বাড়িতে কিছু ছিল?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—' ভাগীরথী পুরো ফিরিস্তিটা শুনিয়ে দিল—'ভাটের বড়া, পাঁপড়ের নাবড়া আর...তিমিলের রায়তা...'

'ব্যস-ব্যস—' বড়ার নাম শুনে বাবার জিবে জল এসে গেছে নির্ঘাৎ। কিন্তু মাও তো বড়ার ঝোলই রাঁধছিলেন। সকাল থেকে ঐ নিয়েই তো পড়েছিলেন।

'মা, আরেকদিন না-হয় তোর রান্না খাবো। আজ তো কাকিমা বেজায় রাগ করবে..'

'থাক, থাক, তোর দেখছি বৌঠানের রাগের খুব চিন্তা! ঢং করছিস কেন?' ...রামকাকা বাবার কাঁধ ধরে এমন একটা ধাক্কা দিলেন যে বাবা তক্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।—'বোস কুন্দন, বোস। আমাকে আবার বাজারেও যেতে হবে। খাবার খেয়ে একসঙ্গে বেরোবো সবাই। তুই দিদির বাড়ি চলে যাস ভাগী। বৌঠানকে সামলানোর দায়িত্ব আমার। তুই চিন্তা করিস না।'

বাবাকে শেষপর্যন্ত অস্ত্র সংবরণ করতে হলো। কিন্তু কুন্দন জানে, উনি এতে খুশি নন। বাড়ির বাইরে খেতে অভ্যস্ত নন। জ্যোলিকোট গিয়ে কি করবেন কে জানে? কোথায় খাবেন?

বাবার চোখদুটো চারদিকে ঘোরাঘুরি করে একটি ফ্রেম-বাঁধানো ফটোর ওপর স্থির হয়। ভাগীর মায়ের ছবি। বাবাকে কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে!

'এখানেই নিয়ে আয় মা, খেয়ে নিই।'

তারপর, আবার সেই আহা-আহা। মা রাঁধুক, আর ভাগীরথীই রাঁধুক। অদ্ভুত অভ্যেস ওঁর।

'মা, তোর হাতের রান্না খাচ্ছি, আর মনে পড়ছে জানকীদির কথা!...' বাবার গলাটা এতো রুদ্ধ-রুদ্ধ মনে হচ্ছে কেন? রামকাকাকেও কেমন উন্মনা দেখাচ্ছে!

'নারাণ, ওর চলে যাওয়ার পর খাওয়া-দাওয়াও সব ঘুচেছে। মেয়ে আর থাকবে ক'দিন? একটা তো বিদায় নিয়েছে, দ্বিতীয়টিও নেবে। বুড়ো বয়েসে আমার যে কি গতি হবে, আমিই বুঝি।...'

'রমদা!'...বাবা কিছু বলতে গিয়ে আটকে যান। ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। খেতে বসে এসব কী শুরু করলেন বাবা! ভাগীও ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে।

'নারাণ, তুইও চলে যাবি। আমি এখানে একা পড়ে থেকে কী করবো?' রামকাকার গলা কাঁপছে কেন? বাবা নীরব। বাবা চুপ করে আছেন কেন?

'কিন্তু তোর মাথায় এটা এলো কি করে, বল তো?'

বাবা একটু পাকে পড়েছেন বোঝা যায়। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না যেন।

'রমদা, কি বলবো? আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। না শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে মেজাজে মেলে, না খাদি আশ্রমওয়ালাদের সঙ্গে। কাগজ চালাতে গিয়ে জমা পুঁজিও ঘোচালাম। স্কুল খুললাম, সেটাও গেল। আমি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। তরলা বেন ঐ গাঁয়ে একটা স্কুল চালায়। ওটা বটেও, ও ছাড়া আরও কয়েকটা ব্যবস্থা দেখাশোনা করতে হবে আমাকে। আশ্রমের সবাই আমার ওপর ভরসা করে বসে আছেন। এমন তপস্বিনী আমার মুখ চেয়ে বসে আছে, আমি না বলতে পারি? ক'টা দিন নরকের গ্লানি থেকে তো মুক্তি পাবো। এটাও ভাবছি। সত্যি বলতে কি এই গাঁয়ে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

রামকাকার কপালে ভাঁজ ফুটে ওঠে। একটা বড়ো-সড়ো কথা বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন যেন। কুন্দন মনে-মনে শিউরে উঠলো, কেন-যেন!

'দ্যাখ নারাণ, ফয়সালা যখন করেই ফেলেছিস তখন সাত-পাঁচ ভেবে কী হবে। আর, ফয়সালা যখন নিয়েই ফেলেছিস, তখন আমার মতামত জেনে কী করবি? তোকে পছতাতে হবে নারাণ, তোর কপালে দুঃখ আছে। কোন্ ভাষায় বোঝাই তোকে? দুনিয়াটা একেবারে উল্টো। তুই বালি খুঁড়ে তেল বার করার চেষ্টা করছিস। তরলা বেনের কথা আলাদা, ভিক্ষের চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া! কিন্তু তুই যে ঘরসংসার পেতে বসে আছিস। নিজের সন্তানের মুখের পানে চা,

রামীর দিকে তাকা। এই জুয়োখেলা ছাড়। এ আবার কেমন-পারা সত্যাগ্রহ, বল দেখি?'

রামকাকা একমুহূর্ত নীরব থেকে বন্ধুর মনের ভেতরটা জরিপ করে নিতে চাইলেন। না-জানি কী আছে ঐ মনে! কুন্দন কি বাবার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছে?

'এক হাতে তালি বাজে না, নারাণ। আমার কথাগুলো শুনতে তোর নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে। কিন্তু সবাই যা দেখতে পায়, তুই সেটা দেখতে পাস না কেন? কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বাস করছিস তুই? এটা গান্ধীর যুগ নয় নারাণ। সে যুগ গেছে। তাকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। গান্ধী বেঁচে থাকবেন নারাণ, কিন্তু নিজের দেশে নয়। আমার এই কথাটা মনে রাখিস।'

'আমি সেটা মানতে পারছি না রমদা'—বাবার মুখটা আবার শক্ত হয়ে উঠেছে—'আমি যেদিন এটা মেনে নেবো, আত্মহত্যা করবো সেদিন।'

আরে, এ কী হলো! রামকাকার আবার কী হলো হঠাৎ? বাবাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছেন উনি। সত্যিকারের কান্না।—'নারাণ, তুই যাস না নারাণ! আমাকে একলা ফেলে যাস না। তুই পাগল হয়ে গেছিস নারাণ, আস্ত পাগল হয়ে গেছিস...'

'রমদা, রমদা, কী হয়ে গেল তোমার? দ্যাখো, ছেলে-দুটো কেমন ভয় পাচ্ছে! আরে বাবা, আমি এখুনি যাচ্ছি নাকি? তুমি যখন হ্যাঁ বলবে, তখন যাবো। তোমার সঙ্গে শলা না করে কখনও কিছু করেছি?' বাবার গলাটাও ধরে এসেছে। মহা ফ্যাসাদ!

এর কিছুক্ষণ পর বুড়ো দু'জন গির্জার পথ ধরে বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। দুর্জনের মুখই থমথমে। কারও মুখে কথা নেই। ওঁদের দু'জনের চেয়েও বেশি উদাস ঐ ছেলেটি, যে ওঁদের পিছু-পিছু হেঁটে চলেছে, বা ঘঁষটে-ঘঁষটে এগোচ্ছে। আর, ভাগীরথীও সঙ্গে রয়েছে। ওর দিদির বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ও জেদ ধরলো, না, কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। কুন্দনের, এটা কেমন-যেন ভালো ঠেকলো না। কেন?

হয়তো এই কারণে যে, নিজের বাড়ি কুন্দনের পছন্দ নয়। বিশেষত সেই সময়, যখন সে রামকাকার পর্ণকুটির থেকে ফেরে। ভাগীরথী এলে তো নিজেদের বাড়িটা আরও নোংরা ঠেকে ওর। এর আগে কখনও ভাগীরথী এসেছিল ওদের বাড়ি? মাত্র একবার, ও যখন সেভেনে পড়ে। এই তিন বছরে ও নিজে কম-করে কুড়িবার তো ভাগীরথীর বাড়ি গিয়েছেই। ওর মনে কখনও প্রশ্ন জাগেনি যে ও নিজে এত যায় কেন, ভাগীরথী কেন আসে না। ওর না-আসাটাই এতদিন স্বাভাবিক মনে হয়েছে কেন?

প্রশ্নটা বড়ো ঘোরালো। খুবই ঘোরালো। এতো ঘোরালো যে এদান্তি তার জবাব মেলেনি। কুন্দন, ওরফে প্রফেসার তামতা আর বলেছে কাকে?

আপনি ডোবে বামুন

'তোমাকে ছাড়া তো রুটির গরাসই নামতো না ওর গলা দিয়ে।'

'ব্যস-ব্যস। থাকতে দাও মহারাজ। সকাল-সকাল বোকা বানানোর জন্যে আমাকেই পেলে? তোমার সন্ধ্যাহ্নিক নিশ্চয়ই আটকে থেকেছে উনি না থাকায়।... নিজেরটা বলো, আমায় মাঝখানে টানো কেন?'

'আরে, আমি আর তোমাকে বোকা বানাবো কি বৌঠান। সন্ধ্যাহ্নিকের কথাটা ভালো বলেছো। সন্ধ্যাহ্নিক তো সেই কবেই শিকেয় উঠেছে যবে থেকে তোমার কর্তার পাল্লায় পড়েছি।'

'দ্যাখো-দ্যাখো,...এখন মিছিমিছি অপবাদ দিও না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। উনি থাকলে জবাব দিতেন।'

'জবাব দিত আমার মাথা! তোমার কর্তার কীর্তি জানা আছে কিছু? তোমার সামনে হয়তো ভিজে বেড়ালটি বনে থাকে। আমার মতো লোকের কাছে তো সিংহ।'

'কথা শোনো! তোমার কাছে সিংহ হবেন কি বামুন ঠাকুর। রাতদিন তোমার কেত্তন করেন। শুনে-শুনে আমার কান পচে গেছে।'

'শুনে-শুনে তো বৌঠান, সত্যি বলছি, আমারও কান পচে গিয়েছিল। যখনই দ্যাখো, রামী রামী!...কি এমন বট-সাবিত্রীর ব্রত করো গো বৌঠান, আমিও শুনি।'

'ব্রত-ট্রত তুমিই জানো মহারাজ। ওসব তোমাদের ব্যাপার। আমরা হলাম গিয়ে হাড়ি-ডোম। আমাদের আবার ব্রতপালন কী?'

'তুমি তো করো, মা, মিথ্যে বলছো কেন?' কুন্দন থাকতে না পেরে ফস্ করে বলে দিল।

রামদত্ত মাস্টার অবাক চোখে কুন্দনের দিকে তাকান, তারপর বিকট জোরে অট্টহাসি করে ওঠেন। মা লজ্জা পেয়ে মুখ আড়াল করেন, তাঁর মুখেও হাসি।

'তো, এই ব্যাপার বৌঠান!'

মা জবাব দিলেন না। কিন্তু ওঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এই বুঝি কথা পাল্টে দেবেন।

'ভাগীরথীর সম্বন্ধের কিছু হলো?'

কুন্দনের কান দুটো খাড়া হয়ে উঠলো। ভাগীরথীর সম্বন্ধ!...তবে কি— ?

'তোমার চোখ দুটো বৌঠান, না-জানি সেই কোন্ যুগে পড়ে আছে। আরে এখন আর সে জমানা নেই, যখন দশ-বারো বছরে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। এত তাড়াহুড়োর কি আছে? তোমারও খুব অল্প বয়েসেই হয়েছিল না বৌঠান?'

'কে বললে? মা ভুরু তোলেন—'আমার বাবা এরকম কম-বয়েসী বিয়ের ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। ঐ যুগেও পনেরো বছরের ছিলাম আমি, বিয়ের সময়।'

'ওহো, তাই তো বলি...' রামদত্ত মাস্টারের মনে কোনো দুষ্টুবুদ্ধি খেলা করছে। তিনি কুন্দনের দিকে তাকান—'আরে, যা তো এক প্যাকেট নাম্বার-টেন নিয়ে আয়। নারাণ চলে গেল, এখানে তো কেউ পোছেই না। এতক্ষণে তিনবার ছিলিম ভরে যেত।'

'আমি আনবো ভরে? মা, একটু তামাক পড়ে আছে না পিণ্ডিতে?'

'না রে, সব বোধহয় শুকিয়ে-টুকিয়ে গেছে। যা, বদলু মিয়ার কাছ থেকে নিয়ে আয়।'

'আরে, না রে, সিগারেটই নিয়ে আয়। তোমার দিব্যি বৌঠান, নারাণ যাওয়ার পর থেকে একদিনের জন্যেও ছিলিমে হাত দিই নি। ইচ্ছেই করে না। বৌঠান, নারাণের একটা চিঠি এসেছে কাল।'

'আচ্ছা!' —কুন্দন আর মায়ের মুখ দিয়ে একসঙ্গে বেরোলো—'আমাদের কাছে তো যাওয়ার পর থেকে একটাও চিঠি আসেনি বাবার।'

'আরে বাবা, তোদের জন্যেই তো এনেছি। তোরাই দেখে নিস।'

'কী লিখেছেন? ভালো আছেন? মন বসেছে কি না?'

'এ তুমি জিজ্ঞেস করছো বৌঠান? তোমাকে ছাড়াও নারাণের কোথাও মন বসতে পারে? ...আরে যা রে, চটপট একটা সিগারেট নিয়ে আয়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মুখ দেখছিস কি?'

কুন্দন বোঁ করে ঘুরে সিঁড়ি টপকে নিচে নামে আর হাণ্ড্রেড মিটার রেস লাগিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ায় বদলু মিয়ার দোকানের সামনে। বদলু মিয়া সস্নেহে ওর দিকে তাকায়। কুন্দনের হঠাৎ খেয়াল হলো, সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এখানে তো তামাকের পিণ্ডি ছাড়া কিছুই মেলে না!

'কি রে ব্যাটা, ঢের দিন বাদে দেখছি! বাবা এসেছেন নাকি? ...এই, একটা কড়া মতো তামাকের পিণ্ডি দে দেখিনি।

'না বদলুচাচা, সিগারেট চাই, সিগারেট।'

'আরে ব্যাটা!' বদলু মিয়ার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল—'তোর মাথার ঠিক আছে তো? বাবা সিগারেট খেতে শুরু করলেন কবে থেকে?'

'বাবা নয়, কাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।'...কুন্দন যেন দড়ি ছিঁড়ে পালাচ্ছে। পালাতে-পালাতে সে বদলু মিয়াকে ধমকের সুরে বলতে শুনলো—'আচ্ছা দাঁড়া-দাঁড়া! আসতে দে বাবাকে।'

কুন্দনের হাসিও পাচ্ছে, আবার রাগও হচ্ছে। মনে হচ্ছে বদলু মিয়া ওকে সন্দেহ করেছে। বদলু মিয়া ভাবছে কুন্দন সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে। ভাবুক।

ডুমৌড়ার সব ছেলেই খায়। ডুমৌড়াকে শোধরাবার খুব চেষ্টা করেছিলেন বাবা। কিন্তু তফাত বিশেষ-একটা ঘটেনি। মদভাঁটি বন্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই, আর কিছু সাফ-সাফাইয়ের কাজও শুরু করিয়েছিলেন। এখন অবস্থা যে-কে-সেই।

সিঁড়িগুলো দ্রুত চড়তে-চড়তে কুন্দন হাঁপাচ্ছে। খুব জোরে ছুটে এসেছে সে। ওর অনুপস্থিতিতে চিঠিটা যদি খুলে গিয়ে থাকে! মা গেলেন কোথায়?...চা বানাচ্ছেন হয়তো।

'এনেছিস? সাবাশ! এবার বল্, পড়াশোনা কেমন চলছে?'

'ভালো রামকাকা। হাফ ইয়ারলিতে ফার্স্ট হয়েছি।'

'আরে বাহ্! এ বছর তো তোর বোর্ড পরীক্ষা। ওতে ফার্স্ট হয়ে দেখা। বৃত্তি পাবি। শোন্ একটা টিউশানি করবি?'

'আমি?' কুন্দন হতভম্ব। আমি টিউশানি পড়াবো? রামকাকার আজ হলোটা কী!

'কেন, ক্ষতি কি? উকীল সাহেবের ছেলেটাকে মনে আছে তোর—আরে, সেই যে, পূরণ পাণ্ডে। তোর সঙ্গেই তো পড়তো। এখনও ক্লাস এইটেই পড়ে আছে। প্রত্যেক বার অঙ্কে গাব্বু মেরে যায়। তোর ম্যাথ তো খুব স্ট্রং। বেচারা কুসঙ্গে ফেঁসে গিয়েছিল। আমার সময় নেই অথচ উকীল সাহেব পেছনে পড়েছেন। তুই করে নিলে ভাল হতো।'

মা চা হাতে এসে ঢুকেছেন। রামকাকা চট্‌জল্‌দি কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে মা-র দিকে এগিয়ে দিলেন—'এ কিছু না বৌঠান, সামান্য লঙ্কা আর মুলো, আর একটা কপি। এবার অল্পসল্প শাকও হয়েছে। ভাগী বললে, খালি হাতে যেও না, এগুলো নিয়ে যাও।'

'আরে, এসবের কী দরকার ছিল?' থলিটা উজাড় করে ফিরে এসে মা বললেন।

'সব ভাগীর পরিশ্রমের ফল। ওরই খুব শখ। আমার দ্বারা তো কিছুই হয় না। তিন-তিনটে টিউশানি পড়াই। না পড়ালে ঘরের খরচা চলবে কি করে? শোনো গো বৌঠান—কুন্দনকে বলছিলাম একটা টিউশানি তুইও করে ফেল না কেন। বাড়ির ব্যাপার। কুড়িটাকা ফি দেবে।'

'না, কোনো দরকার নেই। তুমিও রমদা...কী যে বলো! এ ছোঁড়া আবার টিউশানি পড়াবে কি? বেচারা নিজের পড়া করারই ফুরসৎ পায় না। ভাইকেও পড়ায়...'

'তাতে কি বৌঠান, আমি তো ওর ভালোর জন্যেই বলছিলাম। এখন থেকেই উপার্জন করার অভ্যেস হলে মন্দ কি? এরই কাজে লাগবে। ভালো-ভালো বই কিনতে পারবে। এর বইয়ের কতো শখ!'

'কোনো দরকার নেই মহারাজ। সখ যদি আছে, বাসন মেজেও মেটাবো। একে টিউশানি করতে দেবো না।' 'কথা শোনো, বাসন মাজতে যাবে তুমি কোন্ দুঃখে!

বাসন মাজুক তোমার শত্রু। আমি তো এমনি-এমনি বললাম কথাটা। তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, থাকতে দাও, ছাড়ো। আচ্ছা, এবার নারাণের চিঠিখানা পড়ো দেখি। মাকে শুনিয়ে দে রে কুন্দন, তুইই পড়ে শুনিয়ে দে।'

'আমাকেই সোজাসুজি লিখতে পারতেন না?' মা-র রাগ হয়। রাগের কথাই বটে। 'যাক্-গে, দাও।'

স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য প্রিয় বন্ধু রমদা মহারাজকে নারায়ণের সহস্রকোটি প্রণাম। তোমরা সকলে ভালো থাকলে, শরীরাদি কুশল থাকলে আত্মা শান্তিলাভ করে। অত্রস্থলের কুশল সমাচার এই যে আমি ইস্কুলের কাজ দেখাশোনা করা শুরু করে দিয়েছি এবং খুবই আনন্দে রয়েছি। কিন্তু রমদা, তোমার কথা খুব মনে পড়ে। এ তো তোমার উপযুক্ত কাজ ছিল মহারাজ—আমার একার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। মেমসাহেব অল্পসল্প সাহায্য করেন বটে, কিন্তু তাঁর আরও পঁচিশ রকমের কাজ রয়েছে। তিনি একা কী-কী দেখবেন? তুমিও যদি এসে পড়ো রমদা, সত্যি বলছি, স্বর্গ হয়ে যাবে। তুমি আর আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, যে আশ ছিল আমাদের, সেটা পূরণ হতো। তোমার কি আছে? ভাগীরথীও বাচ্চাদের পড়িয়ে দিতে পারবে—তার নিজেরও ভালো লাগবে। শোনো, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এখানেই উঠে এসো। তোমার থাকা-টাকার ব্যবস্থা মেমসাহেব করে দেবেন। ভালো কুঠরি পাবে তুমি। বেতন তেমন-কিছু নয়, কিন্তু কাজটা সেবার। গ্রামের গরীব ছেলেরা ফিস কোত্থেকে জোটাবে? বিনিময়ে ফিসের চেয়ে বেশি কাজ করে দেয়। তোমারও যত্ন আত্তি করবে, খুব শাক-সব্জি লাগিয়েছে—শহরে পাঠিয়ে দিই, তাতে ইস্কুলের খরচা চলে যায়। ছেলেরা খুব পরিশ্রমী, ফলের গাছও বসিয়েছে। সুতো-কাটা সেলাই করার কাজ আমি শুরু করিয়ে দিয়েছি। সেটা থেকেও কিছু আমদানি হবে। এটাকেই পরে মিড্‌ল ইস্কুল করে দেবো। পুরো জেলার আদর্শ বিদ্যালয়। এই আশ্রমের কায়াকল্প তোমার হাতেই সাঙ্গ হবে। শোনো, সবাইকে ডেকে নিচ্ছি এখানেই। আমাদের তরলা মেমসাহেবের হৃদয়খানি অনেক বড়ো। থাকার জায়গার অভাব আছে নাকি? ব্যাস, প্রথম তিন-চার বছর চুটিয়ে কাজ করতে হবে। গোড়ার দিকে একটু-আধটু অসুবিধে হবে বটে, কিন্তু পরে কোনো-কিছুর অভাব থাকবে না। আমাদের বাপু কি বলেছিলেন...'এই মাটি প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কিন্তু কারো লোভ মেটাতে সে অক্ষম।'...তো, আমাদের প্রয়োজনই বা কতটুকু রমদা? আমরা সাদা-সিধে লোক। তুমি রামীকেও বুঝিয়ে বোলো, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানেই চলে আসুক। মৌলিক শিক্ষার সূত্রপাত নিজের বাড়ি থেকেই হওয়া উচিত কিনা? হ্যাঁ, কুন্দনকে এখানে আনতে না চাইলে আনবে না। ওকে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিক। মামাদের সঙ্গে পড়বে। ওর সেখানে ভালোও লাগে। তারাও ওকে খুব ভালোবাসে। আমি মিছিমিছি রামীর সঙ্গে ঝগড়া করতাম। ভাবতাম আমার

সঙ্গে তাদের যখন বনাবস্তি নেই তখন অনুকম্পা গ্রহণ করবো কেন? এখন রামীকে বোলো, আমি হেরে গেছি, তুই জিতে গেলি। তোর কথাটাই ঠিক ছিল। আমরা কুন্দনের পথের বাধা হতে যাবো কেন? ওর জন্যে দাদু আমাকে বলেছিলেন, 'ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছো কেন? তোমার নিজের বারকাজেই ফুরসৎ নেই, আর ছেলেটা এখনও নাবালক! ওকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দাও।' আমার অনেক খারাপ লেগেছিল কথাগুলো শুনতে। রামীও তাঁর হ্যাঁ-এর সঙ্গে হ্যাঁ করেছিল। তিন দিন মুখ ভার করে ছিল। তারপর, তুমি তো জানোই ওর স্বভাব। ঝগড়াঝাটি করতে ছাড়বে না, কিন্তু করবে আমি যেমনটি বলবো। তুমি ডালে তো আমি পাতায়-পাতায় গোছের ব্যাপার। বেচারার মামাবাড়ি যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছি। রামী তো আমার মাথায় চড়ে বসেছিল, এবার পড়াও ছেলেকে। ও ভাবছে আমি সন্ত জ্ঞানেশ্বর, সব কিছু পড়াতে পারি। কিন্তু ইচ্ছে করে পড়াই না। না-জানি ওর মনে একটা ধারণা বাসা বেঁধে নিয়েছে যে আমি গোটা দুনিয়ার জন্যে ভালো করে মরি আর শুধু নিজের বাড়ির একরত্তি পরোয়া করি না। এখন রমদা, ওকে বোঝাবে কে যে এ ওর নিছক মনের ভুল। আমি যেটুকু পড়াতে পারতাম পড়িয়ে দিয়েছি, তুমি যেটুকু করবার, তুমিও করতে বাদ দাও নি। এখন ঐসব উঁচু ক্লাসের পড়া আমার মগজে ঢোকে না। একজন মিড্‌ল পাস জানেই বা কতটুকু! আর এই সায়ান্স-টায়ান্স তো বাপের জন্মে পড়ি নি। কিন্তু তোমার বৌঠানকে বোঝাও, সে বলে কিনা তুমি বাহানা করছো। আমি সব বুঝি।'

'সুতরাং, তোমাকেই বুঝিয়ে বলতে হবে মহারাজ। যবে থেকে এসেছি, এই একই চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা দরকার। কুন্দনের ভাই, বোন সবাই এখানে আরামে থাকবে। রামীরও ভালো লাগবে। মাসে-মাসে একবার করে গিয়ে কুন্দনের খবরাখবর নিয়ে আসবে। কুন্দন ম্যাট্রিক পাস করে এখানে আসতে চাইলে ভালো, নইলে যা ওর দাদু বলবেন, যা সে নিজে ভালো বুঝবে, করবে। আমার তরফ থেকে কোনোরকম জোর-জবরদস্তি নেই। রমদা, তুমিই তো আমাকে বলেছিলে যে বাপুর ছেলে হরিলাল তাঁর কঠোর অনুশাসনের ফলে বিগড়ে গিয়েছিল। মাতাল হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমান ব'নে গিয়েছিল। যে-কারণে আমারও ভীষণ ভয়। সে একেক সময় এমন বাঁকা-ট্যারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসে যে আমার ভয় ধরে যায়। রমদা, আমি ঠিক বলছি কিনা? আমি চিঠি লিখতে পারি না—অভ্যেসই নেই। কিন্তু এই অজুহাতে তোমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলার জন্যে মন ছটফট করে। গল্প করার যে নেশা তুমি ধরিয়ে দিয়েছো, সেটা পুরো হবে কি করে? মেমসাহেবের মতো আমি অত পড়াশোনা করিনি। উনি সায়ান্সও পড়েছেন আর উনিও বলে থাকেন যে শেষপর্যন্ত সায়ান্সও সেখানেই গিয়ে পৌঁছবে যেখানে বাপু আগে থেকেই পৌঁছে গিয়েছিলেন, নিজের আত্মজ্ঞানের

মাধ্যমে। যা-হোক, আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে কুন্দনকে সায়ান্স নিয়েই পড়তে দেওয়া হোক। যতো পড়তে চায় পড়ুক, তারপর যেমনটা তরলা বেন বলছেন, সায়ান্সও ওকে শেষপর্যন্ত বাপুর কাছেই পৌঁছে দেবে। তাহলে ক্ষতি কী? রমদা, ঈশ্বর মঙ্গলময়। আমি লিখবো কুন্দনকে, আলাদা চিঠিতে। কিন্তু, তার আগে তুমি ওকে আর রামীকে জানিয়ে রাখো—সামান্য সুপারিশ করে দাও। তোমার আর কুন্দনের কথাবার্তায় মিল আছে। তুমি হচ্ছো জ্ঞানী পুরুষ, ব্রাহ্মণ, তুমি হলে ওর গুরু। তুমি বললে, তার প্রভাব থাকবে। তুমি ওদেরকে বুঝিয়ে রাখলে আমারও সাহস বাড়বে।'

'আর রমদা, তোমাকে লুকিয়ে লাভ কী! ছেলেপুলেদের কাছে না পেয়ে মনটা বড্ডো ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কোনো কাজে মন বসে না। দিনগুলো তো কেটে যায়, কিন্তু সন্ধে হলেই, মনের মধ্যেও আঁধার ঘনিয়ে আসে। বাইরে থাকলেই বোঝা যায়, ঘর কী জিনিস! ঘরে থাকলে, খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ছটফট-ছটফট করে। মানুষকেও অদ্ভুত করে গঠন করেছে ভগবান, এ অভাগার কিছুতেই শান্তি নেই। দ্যাখো রমদা, মনের মতো কাজ করাটাই যথেষ্ট নয়, মনের মতো সাথী পাওয়াটাও সমান জরুরী। ভালোবাসার পিপাসাও মেটা দরকার। না-জানি কোন্ জন্মের পুণ্য এটা যে তোমার মতো হীরা-বন্ধু পেয়েছি, রামীর মতো সঙ্গিনী পেয়েছি। তোমাদের দুজনে কাছে না থাকায় বড়ো অসহায় ঠেকছে নিজকে। এখানে এসে পড়ো তোমরা, তারপর মজা কাকে বলে দ্যাখো। ওই শহরে কী আছে রমদা, যে তোমার কদর করলো না, আমার সেবা কবুল করলো না? তোমার গুণ তো নারাণ জানে রমদা। তোমাকে হেডমাস্টার করে দেবো। তোমার ছত্রছায়ায় আমরা থাকবো। আর রামীকে বোলো, তোকে লেখা পড়া শেখানোর যে ইচ্ছে ছিল আমার, সেটা আমি পুরো করবো। সপ্তায় দু-তিন দিন বড়োদের ক্লাস হয়। ওতে ভরতি করে দেবো...'

'আমার ভরতি-টরতি হয়ে কাজ নেই। লজ্জাও করে না, দ্যাখো দেখি...' মা মাঝপথেই ডিস্টার্ব করে দিলেন কুন্দনকে, 'হয়েছে কি রে, এবার থাম্ দেখি। চিঠি নাকি পুরাণ? দু'কলম আমাকে লিখলে হাত ক্ষয়ে যেতো?'

মা-র রাগ দেখে সজোরে হাসি বেরিয়ে আসে রামকাকার মুখ দিয়ে, 'ব্যাস্-ব্যাস বৌঠান, পুরাণ শেষ হয়ে এলো বলে। তোমারই তো চিঠি বৌঠান। আমাকে লেখাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তোমার কর্তার আমি হলাম গিয়ে সন্দেশবাহক। পড় বাবা, তাড়াতাড়ি পড়। এ মহাপুরাণ শেষ কর দেখিনি।'

...'তাহলে রমদা, তুমি রামীকে বলে দিও এখানে আমি ভালো আছি আর তুই এখানে চলে এলে এটা স্বর্গ হয়ে যাবে। তুই একবার এখানে এসে দেখে তো যা। মন না বসলে ফিরে যাস। মন বসলে, তবেই থাকিস। মেমসাহেব তোর

কথা খুব বলেন, আর উনিও বলেছেন, তোরা এখানেই বাড়ি তৈরি করে থাক। তাঁর শরীরটা ইদানিং ভালো যাচ্ছে না। জমির অভাব নেই। একটা কো-অপারেটিভ তৈরি করছেন, রমদা। এরকম স্বাবলম্বী আশ্রম সম্ভবত কোথাও নেই। সবই তরলা মেমসাহেবের বুদ্ধি। আমার মাথাতেও নানারকম প্ল্যান ঘুরঘুর করছে। ব্যাস্, তোমার আর রামীর সহায়তা চাই শুধু—তারপর রামীও দেখবে, তুমিও দেখবে—নারাণ অতখানি অপদার্থ নয় যতখানি তোমরা তাকে মনে করো। ব্যাস্ যেটুকু পারলাম লিখে দিলাম, বাকিটা তুমি বুঝে নিও—তোমার সেবাদাস, নারায়ণ।'

'বলো বৌঠান, এবার কী বলছো?' রামকাকা চিঠিটা ভাঁজ করে কুন্দনকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে বললেন। মা এতক্ষণে হয়তো অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, 'মানুষের পাগল হতে দেরি হয় না।'

'সেই তো, সেই তো!' মা-র সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠলেন রামকাকা, 'আপনি ডোবে বামুন, যজমানকেও নিয়ে ডোবে। এখন তুমিই বলো বৌঠান, আমার বাপের ভিটে ছেড়ে ঐ পাণ্ডববর্জিত জায়গায় গিয়ে নিজের মাথা ভাঙবো?'

মা ততক্ষণে হেঁশেলে গিয়ে ঢুকেছেন। কাঠগুলো সাজাতে-সাজাতে বললেন, 'তুমি জানো আর তোমার বন্ধু জানুক। তুমি অত করে বোঝালে, কিছু হলো? এখন উল্টে তোমাকে বোঝাচ্ছেন। আমার বাবাই ঠিক বলেছিল।'

'কী বৌঠান?'

'যেদিন খবরের কাগজ ছেড়ে এসেছিলেন, সেদিনকার কথা। আমি তো তখনও কিছু জানতাম না। আমি এমনিই কোনো কাজের ছুতো নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। বলতে শুরু করলো, 'তোর বরের মাথাটা গেছে। সামান্য ছোট্ট একটা ব্যাপারে দশ জনের সামনে আমার অপমানের একশেষ করে ছাড়লো। এতই যদি দেমাক, তবে এসেছিলে কেন বাপু? আমারই কাগজে আমার কথা কেটে-ছেঁটে ছাপা হবে! কিছু বলো তাতে ঝামেলা, না-বললে তাতেও ঝামেলা। ...আমি বলছি রামী, এ রকম লোকের কারও সঙ্গে বনাবন্তি হতে পারে না। না নিজে শান্তিতে থাকবে, না অন্যকে শান্তিতে থাকতে দেবে।'

'আচ্ছা!' ...রামকাকা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, 'তোমার বাবাও তো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সত্যি, নারাণের কী যে হয়েছে না! আমারও মাথা খারাপ করে দিয়েছে সে। এখন যাচ্ছি বৌঠান। আবার আসবো, আসছে রোববার। ততদিন যা ফয়সালা করবার করে নিও।'

মা হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন, 'কিসের ফয়সালা রমদা? তুমি কি মনে করছো, আমিও পাগল হয়ে গেছি?'

'না-না, তুমি পাগল হতে যাবে কেন বৌঠান? কিন্তু নারাণের মাথায় কিছু ঢুকলে তাকে সে আর তাড়াতে পারে না। তুমি যাবে না লিখে দিলে, সে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে।'

'তাই যদি হয়, তবে তুমিই চলে যাচ্ছো না কেন? সেখানে আমার কাজই বা কি? ইস্কুল চালাবে তুমি, খেতালি-জিরাতি দেখবেন উনি। আমি সেখানে মেমসাহেবের পা টিপে দিতে যাবো?'

'ছ্যা-ছ্যা!' রামকাকা দাঁতে জিব কাটলেন, 'কী যে বলো বৌঠান! চিঠিটা তোমার কাছেই রইল। আরেকবার ভালো করে পড়ে নিও, ভেবে-বুঝে নিও। আমি তো আর ওর মতো ছিটকপালি নই। তবু, ভাবছি একবার গিয়ে দেখেই আসি, এ সব ওর আকাশকুসুম কল্পনা শুধু, না বাস্তবেও কিছু করতে চলেছে। ও তো ভোলানাথ, অল্পেতেই গদগদ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তো...যাক-গে, একবার গিয়ে দেখে আসতে ক্ষতি কী?'

মা স-চমকে রামকাকার মুখের দিকে তাকান। ওঁর হাসি পাচ্ছে।—'দেখলে, আমি বলেছিলাম না? তুমিও ওঁর কথার ছলনে ভুলে গেলে? যাও রমদা, যাও, আর গিয়ে বলো রামীর জ্যোলিকোটে এসে কাজ নেই। ভুলে যাও যে তোমার একটা ঘরসংসারও রয়েছে। আমি...'

এ কী! মায়ের গলাটা হঠাৎ রুদ্ধ শোনাচ্ছে কেন? রামকাকাও একটু বিচলিত হয়ে পড়ছেন, 'আচ্ছা, এখন চলি। তুমি ভেবো না বৌঠান, আমি ওকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো, যদি তেমন কিছু না ঠেকে, তবে। আরে, ওখানে গিয়েই তো বুঝবো। মেমসাহেব তো নন, যেন সাক্ষাৎ দেবী, যার কাছে সমস্ত দুঃখের উপচার রয়েছে: সব কথার-কথা বৌঠান। তুমি চিন্তা কোরো না। হ্যাঁ, আমি আবার আসবো।'

মা খাবার দিচ্ছেন। কুন্দন বা মা কারও মুখেই কোনো কথা নেই। এমন কী হয়েছে রে বাবা! চিঠিতে তো এমন কিছুই ছিল না। চিঠি পড়বার সময় সবাইকে তো বেশ মগ্ন দেখাচ্ছিল। তবে মায়ের আবার হঠাৎ কী হলো?... কুন্দনের মাথাটা ঠিক কাজ করছে না। বাবার ওপর এখন ওরও ভীষণ রাগ হচ্ছে। এরকম রাগ সে আগে কখনও অনুভব করে নি।

গান্ধীর উত্তরাধিকারী

একবার, মাত্র একবার, নারায়ণরাম টাম্‌টাকে নিয়ে হৈ-চৈ হয়, দারুণ হৈ-চৈ হয়। আচার্য কৃপালনি যেদিন প্রথম আসেন আমাদের মফঃস্বলে, ঘটনাটা সেই সময়কার: রামলীলা ময়দানে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গোটা শহর ভেঙে পড়েছিল। আর, কেন জানি না বাবার নামটাও ঐসময় লোকের মুখে-মুখে ফিরেছিল। বাবা তখন শহরেই গেড়ে বসেছিলেন। কুন্দন বেশির ভাগ সময় কাটাতো ওর মামাবাড়িতে। দাদুর

সান্ধ্য-বৈঠকে প্রায়ই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতো। দাদুর কাছে কাজ নিয়ে অনেক লোক আসতো, দেখে কুন্দন অবাক হতো। দাদুর কথাবার্তা শুনে গোড়ার দিকে ওর ধারণা হয়েছিল, আগে যেমন ইংরেজদের ছড়াছড়ি ছিল চতুর্দিকে, এখন তেমনি কংগ্রেসে-কংগ্রেসে ছয়লাপ। পরে হঠাৎ জানা গেল রামরাজ্য পরিষদ নামেও একটি সমিতি আছে, একটা প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি না কী-যেন রয়েছে। জনসংঘ, কমিউনিস্ট পার্টি এসবও রয়েছে। ওর এক মামা, জগদীশ মামা কমিউনিস্ট ব'নে গেছেন আর আরেক মামা সুরেন্দ্র মামা, সোশ্যালিস্ট।

এই সুরেন্দ্রমামাই (সোশ্যালিস্ট) একদিন একটা বিস্ফোরক খবর দিলেন কুন্দনকে, যে, জামাইবাবু ভাগ্যলক্ষ্মী জয় করতে চলেছেন। ঠিক এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিলেন—কুন্দনের এখনও বেশ মনে আছে। তারপর সেদিনেরই বৈঠকে...

উপস্থিত মণ্ডলীকে স্তব্ধবাক করে দিয়ে সুরেন্দ্রমামা অকস্মাৎ রহস্যোদ্‌ঘাটন করলেন, সোশ্যালিস্ট পার্টি যে-সব প্রার্থীর নামগুলো নিয়ে ভাবছে, জামাইবাবুর নাম তার শীর্ষে।

'ইম্পশিবল্!' দাদু প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'বলিস কি রে সুরেন? নারায়ণের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টির কী মতলব? ও যে গান্ধীর চেলা, রাজনীতিকেও লোকনীতি বলে!'

'আর তবে কী বলবেন শুনি?' সুরেনমামা বললেন, 'এই একই কথা তো কৃপালনী আর লোহিয়াও বলেন।'

'রাখ তোর কৃপালনী আর লোহিয়া। গান্ধীই যেখানে কিছু করতে পারলেন না, তখন এঁরা কিছু করতে পারবেন মনে করছিস? এখনও পঞ্চাশটা বছর কংগ্রেসকে কেউ নাড়াতে পারবে না, বুঝেছিস? বুদ্ধির ঢেঁকি! ...বুকের পাটা ছিল জওহরলালের, যিনি এই দু'জনকে ডেকেছিলেন—ঐ যে কী-যেন নাম, তোদের ঐ জে পি-কেও বলেছিলেন, এসো, আমার সরকারে অংশ নাও। কিন্তু তাতে রাজি হবেন কেন? এনারা তো দেড়জন মিলে আলাদা দল গড়বেন। খিচুড়ি পার্টি। কে চেনে এঁদেরকে? জওহরলালের নামেই জাদু! লোহিয়া, কৃপালনিকে কে চেনে?'

'ইট্‌স টু-মাচ ড্যাডি!' মাঝপথেই বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সুরেনমামা।

'টু-মাচ আবার কী? তুই তো হলি গিয়ে দু'দিনের সোশ্যালিস্ট, এরই মধ্যে বড়ো-বড়ো বুকনি আউড়াচ্ছিস! পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়ে এসেছিস রাজনীতির তর্ক করতে।'

'টাম্‌টা সাহেব, এ আপনার জোরের কথা।' কংগ্রেসী নেতা প্রদ্যুম্ন নারায়ণ তিওয়ারি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আরে, বই পড়ে যদি না করে, আর কীভাবে করবে বলুন। জেলে যাওয়ার, লাঠি খাওয়ার সুযোগ তো এখন নেই...'

'আপনিও মশাই বেশ বলেছেন! সোশ্যালিস্টরা তবে কি জেলে যায়নি?

সোশ্যালিস্টরা লাঠি খায়নি?' সুরেনমামার রোখ চেপে যায়, 'আর, এসব রাজনীতিতে আসার যোগ্যতা নাকি?'

'সাবাশ! সাবাশ!' কমিউনিস্ট মামা চেঁচিয়ে ওঠেন।

'তুই থাম তো—' দাদু ধ্যাতানি দিয়ে কটাক্ষ করে হাসলেন, 'সুরেনের মধ্যে, যা-হোক, কিছু তো একটা রয়েছে। তোর মধ্যে কী আছে শুনি?'

'কেন? কমিউনিস্টরা কি কিছুই পোহায়নি? এই সোশ্যালিস্টগুলোর তো বেশ মজা ছিল। হিরো বনে ঘুরে বেড়াতো। আমরা যে চাবুক খেয়েছি...'

'তুই? তুই তখন জন্মেছিলি নাকি?' দাদুর অট্টহাসিতে গোটা আসরটা গমগম করে উঠলো।

'আই মীন, আওয়ার পার্টি। ডোণ্ট বি সিলি...' কমিউনিস্ট মামা চোখ পাকিয়ে তাকান।

'হোয়াট পার্টি?' সুরেনমামা তেড়ে এলেন, 'যখন আমাদের দলের সমস্ত নেতা জেলে পচছিলেন, আর আমরা গণ-আন্দোলন করে মরছিলাম, তখন কি করছিল তোদের ঐ বিশ্বাসঘাতক পার্টি?'

'গণ-আন্দোলন! ছ্যাঃ—' তেতো নিম খেয়ে ফেললে যেমন, কমিউনিস্ট মামা মুখ-বিকৃতি করে উঠলেন, 'গণ-আন্দোলন, স্যার, কাকে বলে?'

'পিপল্স ওয়ার। তাই তো? সুরেন, তুই ওকে বলছিস না কেন?' দাদু বললেন। হঠাৎ ওঁর চোখ পড়লো, আসরের এক কোণে চুপ করে বসে-থাকা কুন্দনের ওপর। 'তিওয়ারি মশাই, এই বাচ্চাটাকে দেখে মায়া হয়। বাপের নজর দেওয়ার ফুরসৎ নেই। খেলাতেও মন বসে না এর। এখানেও, যখন দ্যাখো, হাঁ করে শুনছে লোকের গুরুগম্ভীর কাথাবার্তা। কী যে মজা পায়! এই বয়েসে এমন ডালনেস...'

'নো ড্যাডি, ইউ ডোণ্ট নো।' কমিউনিস্ট মামা বলে উঠলেন, 'এখানে তো ও বেশ অ্যাকটিভ থাকে। ডুমোড়া গিয়েই ডাল হয়ে পড়ে। সবকিছু ডিপেণ্ড করে পরিবেশের ওপর। পরিবেশ পাল্টে দাও, মানুষ পাল্টে যাবে।'

'দ্যাট্স লাইক এ কমিউনিস্ট!' দাদু সজোরে হেসে উঠলেন, 'জগ্গু, তোর তো দেখছি রাতারাতি ভাষাই বদলে গেছে! সুরেন, এদের মতো তোদেরও ট্রেনিং ক্যাম্প বসে নাকি?'

'বসবে ড্যাডি, ইলেক্সানটা আগে চুকে যাক। তারপর চাদ্দিকে শুধু আমরাই গিজগিজ করছি, দেখবে। তোমাদের নেহরু-কংগ্রেসেরও টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'নেহরু কংগ্রেস! ভালো বলেছো। তিওয়ারিজী ফোড়ন কাটলেন, 'যেন গান্ধী-কংগ্রেসও রয়েছে বিরোধী-শিবিরে! আইডিয়াটা মন্দ নয়। তাই না টাম্টা সাহেব?'

টাম্টা সাহেব কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁকে একটু অন্যমনস্ক দেখায়।

'আরে বাবা, থাকতে দাও।' সদ্য-আসা মুনব্বর মিয়াঁ বলে উঠলেন, 'বুদ্ধি থাকলে এই সোশ্যালিস্টরাই আজ সরকারে বসতো। আড়ালে থেকে কী বা করতে পারে? আত্মহত্যা করেছে তোমাদের পার্টি, বুঝেছো? একরত্তি পার্সোন্যালিটি নেই, আর চলে এসেছো নেহরুর সঙ্গে ভিড়তে! উঁহু। প্রথমত, এরা কখনই সরকার গড়তে পারবে না। আর, যদি গড়েও ফেলে—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার যেমন—দেখে নিও, দু'দিন যেতে না যেতেই ঘট ওল্টাবে। নিজেদের মধ্যেও খাওয়া-খাওয়ি করে মরবে।'

'কেয়াবাত! কেয়াবাত!' লালা হরগোবিন্দ হাততালি দিয়ে উঠলেন। দাদুও ওঁকে সঙ্গ দিলেন। সুরেনমামা গেলেন ক্ষেপে।

'একটা কাজ করুন মুনব্বর মিয়াঁ, আপনি গণৎকারীর বোর্ড লট্‌কে নিন। প্র্যাকটিস ভালো চলবে। পলিটিক্সে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন কেন'? —তিনি আরও কিছু কটু কথা শোনাতে চাইছিলেন, কিন্তু দাদু বাধা দেওয়ায় আর বলতে পারলেন না।

'সত্যি কথায় রাগ করিস কেন? তর্ক কর।'

'সত্যি হবে তোমাদের কাছে। আমার কাছে এসব আলফাল।' সোশ্যালিস্ট মামা ততোধিক ক্ষেপে উঠলেন, 'পার্সোন্যালিটি! হুঁঃ! যুক্তি দ্যাখো, পার্সোন্যালিটি দিয়ে জনতাকে তুমি পাঁচ বছর ধোঁকায় রাখতে পারো, বড়জোর দশ বছর। দেশের জনগণ বোকা নাকি? এই পার্সোন্যালিটি-কাল্ট তোমাদেরকে ডোবাবে। বুঝেছো?'

'কেন?...আর ঐ গান্ধী-পূজা কি বীরপূজা ছিল না?' দাদু কষে দিলেন।

'ছিলই তো।' কমিউনিস্ট মামা বিড়বিড় করেন, 'ক্যারিশ্মাবাজি আর কে শুরু করেছিল?'

'আপনিই স্যার করে দেখান না ঐরকম ক্যারিশ্মা!' সোশ্যালিস্ট মামা ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন, 'ইতিহাসের মহান জননেতাকে গালমন্দ করতে তোর লজ্জা করে না? এ নেহরুওয়ালা গ্ল্যামার নয়, বুঝেছিস? যা না-ঘরকা না-ঘাটকা।'

'দ্যাখ্, বাজে কথা বলিস না সুরেন!' দাদু এবার নারাজ হলেন, 'গালাগাল তুই করছিস না জগ্গু করছে? তোরা সোশ্যালিস্টরা নেহরুকে গাল দেওয়া ছাড়া আর জানিসটা কী? গান্ধী কি অন্ধ ছিলেন যে নেহরুকে নিজের উত্তরাধিকারী বানিয়ে গিয়েছেন?'

'ঠেকায় পড়লে গাধাকেও বাপ বলে লোকে।'

'মানে?' সুরেনমামা ওঁর চোখে চোখ রেখে জানতে চান।

'গান্ধী আর করতেনই বা কী? প্রোগ্রেসিভ তো আর ছিলেন না। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন অবশ্যই। যখন দেখলেন কংগ্রেসের যুব-সম্প্রদায় নেহরুর সঙ্গে রয়েছে, তখন তাঁর কাছে আর তো কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।'

বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ নেত্রে সুরেনমামা ছোটো ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, যেন ভস্ম করে দেবেন। তারপর বললেন, 'গান্ধী সম্পর্কে ক খ গ-ও যখন জানিস না তখন চুপ থাকলেই পারিস। তাঁর দলিল পড়েছিস?'

'দলিল! ঐ ভিকিরিটার?' কমিউনিস্ট মামা সজোরে হেসে উঠলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভিকিরিটার। তোর মতো হারামখোর বুদ্ধিজীবীর নয়। ...আমি বলছিলাম, গান্ধীজীর অন্তিম বাসনা ছিল, ঐ দলিল মোতাবেক, কংগ্রেসের কাজ চুকেবুকে গেছে, এবার সে গণ-জাগরণের কাজ শুরু করুক। জনগণের মাঝে। সত্তার লালসা পরিত্যাগ করুক।'

'কী যাচ্ছেতাই কথা!' কমিউনিস্ট মামা বললেন, 'তবে তো ওটার যথার্থ স্থান মিউজিয়ামে।'

সুরেন্দ্রমামা ওঁকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে বললেন, 'এই পৃথিবীর বুকে গান্ধীর যা চিন্তাধারা ছিল, তার বাস্তবায়নের জন্যে নেহরুকে উত্তরাধিকারী বানানো কতটা সমীচীন, তা আপনারই বিবেচনা করে দেখুন। নেহরুর মধ্যে উনি সত্যিই যদি আশার আলো দেখতে পেতেন, তাহলে কংগ্রেসকে বিসর্জিত করার পরামর্শ দিতেন কি? গান্ধীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কেউ যদি থেকে থাকে, তা আমরা। বুঝেছেন?'

'তোমরা? অর্থাৎ সোশ্যালিস্টরা? এই বলতে চাও তো?' লালা হরগোবিন্দ সামান্য এগিয়ে এলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গান্ধীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ার ক্ষমতা কারও মধ্যে যদি থেকে থাকে, সেটা হলো সোশ্যালিস্ট পার্টি। এই কারণেই সোশ্যালিস্টরা সরকার গড়ার ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে হাত মেলাতে চাননি। নেহরুর মেকি স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে ওঁরা কী করতেন? ওঁরা গান্ধীর স্বপ্নকে জিইয়ে রাখতে চান।'

'তাহলে একে গান্ধী-পার্টি বলো। সোশ্যালিস্ট পার্টি বলছো কেন?'—মুনব্বর মিয়াঁ বললেন, 'হয়তো তা করলে কিছু ভোটও হাসিল হয়ে যেতে পারে। সোশ্যালিস্ট এখানে বোঝে ক'জন?'

'ঠিক কথা...।' হরগোবিন্দ লালা যোগ করলেন, 'ভোটারদের পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার, কাকে ভোট দিচ্ছে। গান্ধী আর নেহরুর মধ্যে ভোটাভুটি হলে সাফ বোঝা যাবে জনগণ কাকে চায়। গান্ধীর পথে এগোতে চায়, না নেহরুর পথে? জনগণের সামনে দুটো স্পষ্ট বিকল্প রাখছো না কেন?'

'আরে মশাই, এদের তো আর গান্ধী-নেহরু দ্বন্দ্ব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। শুধু চায় নেহরুকে সাবাড় করতে। এটাই তো তোদের পরিকল্পনা, নাকি?' দাদু বললেন।

'হোয়াট আ বুর্জোয়া অ্যামবিশন!' কমিউনিস্ট মামা টিপ্পনি কাটলেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোরা কমিউনিস্টরা আর বলবি বা কী? নেহরু ভুল নীতি অনুসরণ করলে, সাচ্চা দেশপ্রেমিক। তোরা তো পারলে দেশটাকেই বেচে দিস। ওরা, যারা

তোদের নিউক্লিয়াস, যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নাচায় তোদের। আমরা নেহরুর নয়, নেহরুবাদের বিরুদ্ধে। কমিউনিজমের নয়, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে।'

'তবে তো হলো তোর রাজনীতি।' বাঁকা হাসি হাসলেন দাদু, 'গান্ধীও চাই, কমিউনিজমও চাই। অবাঞ্ছিত শুধু নেহরু। বাহ্ রে সোশ্যালিস্ট!...'

'নেহরু আর নেহরুবাদের মধ্যে খানিকটা তফাৎও থাকতে পারে, কেননা নেহরু দ্বন্দ্বের ভেতরে রয়েছেন। কিন্তু কমিউনিজম আর কমিউনিস্টদের মধ্যে পার্থক্য কিসের? আমার মনে হচ্ছে সুরেন্দ্র, হয় তুমি নিজের সোশ্যালিজমকে ঠিকমেতা ডিফাইন করতে পারছো না, নয় তোমাদের গোড়ায় গলদ রয়েছে।' তিওয়ারিজী মামাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিলেন।

'কিসের গোড়া!' কমিউনিস্ট মামা লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরালেন। টান মেরে বললেন, 'এদের সোশ্যালিজম কী বস্তু, তা আমাদের ভালো করে জানা। সেই পচাগলা ব্যক্তিবাদ। নির্ভেজাল অ্যানার্কিজম ছাড়া কী? অন্যদের মতো এরাও উঠতে-বসতে গান্ধীর নাম জপ করে। মূর্খ আর বোকাদের কাছে সেটাই একটা চিচিং ফাঁক। অতি কষ্টে ধর্মের আফিম ছেড়ে আসছিল এই দেশ, এই মাদারি এসে আবার পৌঁছে দিল ওখানে। পলিটিক্স আর সায়ান্স এই দুটোই তো ছিল যা ভারতবর্ষকে এই হাজার বছরের পুরনো পাঁক থেকে টেনে তুলে আনতে পারতো, আনছিলই তুলে। এই ক্ষ্যাপা-বুড়োর পাল্লায় পড়ে দেশটা রসাতলে গেল। এখন কমপক্ষে আরও পঞ্চাশটা বছর লাগবে এর ক্ষতিপূরণ হতে। তারপরই জনসাধারণ সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে...'

'হ্যাঁ। আর সেই রাস্তা সোজা গিয়ে সেঁধোবে মস্কোয়। তাই না?' সুরেনমামা আবার মুখ বেঁকালেন।

'কথাটা তো বাপু তুমি মন্দ বলো নি। কিন্তু ধর্মকে আফিম বলছো, সেটি মানতে পারছি না।' লালা হরগোবিন্দ বললেন, 'এ ভারতবর্ষ বাছাধন। এখানে যা-কিছু হয়, যেটুকু পরিবর্তন আসে, ধর্মের মাধ্যমেই আসে। ধর্ম আর দর্শন।'

'কমিউনিজমও তো ধর্মই, লালা মশাই। আফিম বললে কি হবে?' তিওয়ারিজী বাধা দিয়ে বললেন। লালাজী চোখ বুজে ফেললেন, তারপর পেছনে মাথা রেখে ঠ্যাং-দুটো চেয়ারের ওপর তুলে দিলেন।

'এতে কোনো সন্দেহ নেই।' দাদু যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠলেন, 'গান্ধী এসে এখানকার সবকিছু জটিল করে দিয়েছেন। এই কথাই তো আমি নিজের জামাইকেও বলি। এ তো আর অকারণে নয় যে, লেখাপড়া-জানা লোকেদের ওপর গান্ধীর কোনো প্রভাবই পড়েনি। অশিক্ষিত সমাজেই উনি পূজিত হয়েছেন। গান্ধী যে চৈতন্যবিরোধী ছিলেন, এতে কোনো দ্বিমত নেই। আরে মশাই, আমরা তো তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তোমরা তো সব আজকালকার ছোঁড়া। তাঁর প্রতিটি

পদক্ষেপ ছিল ভুল। শূদ্রদের সংগঠিত হতে বাধা দিল কে? গান্ধী। কৃষক-শ্রমিকদের সংগঠনে বাধা দিল কে? গান্ধী।'

'হিয়ার হিয়ার!' কমিউনিস্ট মামা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'থ্রি চিয়ার্স ফর ড্যাডি!'

সুরেনমামার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো। টেবিলে সজোরে একটা ঘুসি মেরে চিৎকার করা শুরু করলেন, 'ধিক্ তোমাদের! আমি জামাইবাবুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে যেতে পারি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নয়। তুমি ঠিক বলেছো ড্যাডি, গান্ধী তোমাদের মতো বুদ্ধিজীবীদের কাছে অপাচ্য। কিন্তু আরেক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীও এদেশে বাস করেন যাঁরা তোমাদের মতো জড়বুদ্ধি, মেরুদণ্ডহীন আর ইংরেজিয়ানার পা-চাটা নন। দেশের মুখ্যু-সুখ্যু মানুষদের মধ্যেও যাঁদের অস্তিত্ব রয়েছে। তাঁরাই বোঝেন গান্ধীকে, তোমরা নয়। বুঝেছো? ধর্ম-টর্মের কথা বাদ দাও। সে তো আমিও মানি না। কিন্তু এইসব বেওয়ারিস কমিউনিস্টদের মতো তাকে আফিম বলেও মনে করি না। তিওয়ারি কাকা ঠিকই বলেছেন। ধর্মকে আফিম বলছে যারা সেইসব কমিউনিস্টরা নিজেরাই কম ধর্মোন্মাদ নাকি?'

'ব্যস, এবার আমিও কিছু বলবো?' দাদু যেন কিছু অমঙ্গল আশংকা করে মাঝপথে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আম্বেদকরকে তুই কী চোখে দেখিস?'

'আমি আম্বেদকরকে জিনিয়াস মনে করি। কিন্তু শূদ্রদের সমস্যার সমাদান উনি যা বাৎলেছেন, সেটা নয়।'

'আচ্ছা? তাহলে গান্ধী বাৎলে দিয়েছেন সমাধান—তোর মতে?'

'না। সমাধান দেওয়ার কাজ তো তোদের মতো বুদ্ধিজীবীদের। গান্ধীকে তোরা এতো অবজ্ঞা করিস না। তাঁর চোখে এই দেশ একটা গোটা সমাজ ছিল, কোনো শ্রেণী বা জাতি বিশেষ নয়। আর তিনি ভাঙায় বিশ্বাস করতেন না, বিশ্বাস করতেন জোড়ায়। নববৌদ্ধ বানিয়ে কী করবি তোরা? একটা মৃত-ধর্মে লাখ-দু'লাখ মানুষকে ধর্মান্তরিত করেই তোদের আনন্দ, যেন কী বিরাট কাজ করে ফেলেছিস! হিন্দুদের পিণ্ডি চটকে দিয়েছিস কিন্তু হিন্দুধর্ম—যতই পচন থাকুক না তাতে, আজও জীবিত রয়েছে। জামাইবাবু ঠিকই বলেন যে, হিন্দু সমাজের যতই অধঃপতন ঘটুক না কেন, আজও তাতে প্রাণ রয়েছে, উঠে দাঁড়াবার শক্তি আছে। যা আছে সেটা নিয়েই তো থাকতে পারিস! যা নেই, তার ভ্রান্তি খাড়া করে অপামর সমাজ থেকে শূদ্রদের পৃথক করে দেওয়ার মানে? গান্ধীজী এই চিকিৎসার ভয়ংকর দিকটা ভালোমতো আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু সমাজকে গতিশীল মনে করতেন। যে-সমাজ নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে স্বয়ং নিজস্ব শক্তি দিয়ে তাড়াতে পারে। একইভাবে আমাদের দারিদ্রের নিরাকরণও আমরা নিজেদের পুরুষার্থ দিয়ে, অন্যের নকল না করে, অন্যের উচ্ছিষ্ট কবুল না করে, করতে পারি...।'

'ওহ্ ডিসগাস্টিং! আই কান্ট স্ট্যাণ্ড ইট...' কমিউনিস্ট মামা সহসা উঠে দাঁড়ালেন

এবং ওয়াক আউট করে বেরিয়ে গেলেন। দাদু ওঁকে বসার জন্যে ইশারা করলেন, কিন্তু মামা ঘাড়-মাত্র না ফিরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলেন।

'তুই বক্তৃতা দিচ্ছিস, না তর্ক করছিস?'—দাদু বললেন।

'তুমি যা মনে করছো।' সোশ্যালিস্ট মামা বললেন, 'তুমিই তো আমাকে বকিয়ে মারছো। বক্তৃতা করার শখ নেই আমার।'

'কথাগুলো তো সুরেন ঠিকই বলেছে টাম্‌টা সাহেব,' হরগোবিন্দ লালা বললেন, 'আপনিও তো এইজন্যেই আন্দোলন চালিয়েছিলেন যাতে প্রত্যেক শূদ্র-শিশু নিজেদের নামের সঙ্গে 'আর্য' জুড়তে পারে, 'রাম নয়। মানেটা দাঁড়ালো এই যে, আম্বেদকর-সমাধানের অসারতা আপনিও ধরতে পেরেছিলেন।'

'বাঃ, এ আবার কোনো কথা হলো?' মুনব্বর মিঁয়া তর্কে নেমে পড়লেন, 'আর্য লিখে দিলেই কি কুলীন হিন্দুরা আপনাকে আর্য বলে মেনে নেবে?'

'না মানুক'—দাদু জোর দিয়ে বললেন, 'আমাদের আর্য হওয়া কারও স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নাকি?'

'তাহলে শুধু আর্যই কেন?' সোশ্যালিস্ট মামা ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, 'তুমিও শেষপর্যন্ত তাই করছো, যা আম্বেদকর করেছিলেন। ড্যাডি, এ হলো বিশুদ্ধ ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, বুঝেছো? এই গ্রন্থি থেকে অনগ্রসর শ্রেণীকে মুক্ত করাই ছিল গান্ধীজীর প্রাথমিক ও মৌলিক চিন্তা।'

দাদুর কপালে ভাঁজ পড়ে, 'আগে তো তুই এভাবে ভাবতিস না, সুরেন! হঠাৎ কী হলো। জামাইবাবু এসব ঢুকিয়েছে নাকি তোর মাথায়?'

কুন্দন অবাক হলো দেখে যে, দাদুর এই তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গ শুনেও, রেগে ওঠার পরিবর্তে সুরেনমামা হেসে ফেললেন। ইংরিজিতে বললেন, 'জামাইবাবু ইজ গ্রেট! লঙ লিভ জামাইবাবু!' ...এমন সময় তিওয়ারি মশাই, যিনি এতক্ষণ বসে-বসে তন্দ্রা উপভোগ করছিলেন, হঠাৎ চৈতন্য লাভ করে নড়ে-চড়ে বসলেন। কেউ যেন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওঁর মুখে!

'নারায়ণরাম একজন নিষ্ঠাবান পুরুষ। যা মনে-মনে বিশ্বাস করেন, তাই করেন। এ সুরেন্দ্রর ব্যক্তিগত ধারণাও হতে পারে। কিন্তু ভাই, গান্ধীবাদের সঙ্গে সমাজবাদের কী সম্পর্ক, সেটা আমার মাথায় আসে না। আমি তোমাদের লোহিয়াকেও ঠিক বুঝি না। সোশ্যালিস্টরাও তো শেষপর্যন্ত একটু নরম-গোছের কমিউনিস্টই বটে। গান্ধীজী তো সহ্যই করতে পারতেন না কমিউনিজমকে। এই ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো দ্বন্দ্ব-টঙ্গও ছিল না। জ্ঞানত কমিউনিস্টরাও সবসময় গান্ধীকে গাল দেবে, সে যদি সাচ্চা কমিউনিস্ট হয়। আমরা ঢের দেখেছি। সোশ্যালিস্টরা যখন গান্ধী-গান্ধী করা শুরু করে, আমার তো মনে হয় ওরা গান্ধীকে বোঝেই না, শুধু সেন্টিমেন্টের ব্যাপারে। এ হলো ভাঁওতাবাজি, নিপাট ভাঁওতাবাজি। নারায়ণের

মধ্যে অন্তত এই ভাঁওতাবাজি তো আর নেই। উনি হলেন বিশুদ্ধ, সেণ্ট-পারসেণ্ট গান্ধীবাদী। আমার তো মনে হয়, টাম্‌টা সাহেব, এ এক নির্বাচনী কৌশল। তাছাড়া আর কি? কোথায় সমাজবাদ আর কোথায় গান্ধীবাদ! দুটোর মধ্যে সম্পর্ক কিসের?' এতটা বলার পর তিওয়ারিজী চুপ করলেন। তারপর আবার চেয়ারে এলিয়ে দিলেন নিজেকে।

'আমারও তাই ধারণা।' এবার মুনব্বর মিয়াঁ বিড়বিড় করে উঠলেন, 'আমার মতে এই গান্ধীবাদ আর সমাজবাদ দুটোই গোলমেলে ব্যাপার। যে-কারণে সবাই এই দুটোকে কপচে বেড়ায়।'

'আপনাদের নেহরু-কংগ্রেসেও কি এই নাম দুটো আউড়ায় না?' সুরেনমামা ঝট্ করে বলে ফেললেন।

'আমি আবার না বললাম কখন ; ঠিক আছে, ঠিক আছে...' মুনব্বর মিয়াঁ আমতা-আমতা করেন।

'ভাঁওতাবাজি তো ঠিকই—' লালা হরগোবিন্দ কুপিত গলায় বললেন, 'দেখুন, আর্যসমাজ এই কারণেই গোড়া থেকে নীতির ব্যাপারে পরিষ্কার। যে মতাদর্শের সঙ্গে এ-দেশের মাটির যোগ নেই, তা কখনও এদেশের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আর এই মাটির যোগ মানে হলো ধর্ম, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের হাজার-হাজার বছরের যোগ।'

'আচ্ছা, আপনি মনে করেন কোটি-কোটি মানুষ যাঁরা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের কোনো অভিজ্ঞতা বা ধর্ম ছিল না? আর আপনাদের আর্যসমাজ, পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও এক ইঞ্চি জমি জোটেনি যার কপালে সেটা অভিজ্ঞতার ফসল। তাই তো?'

'বাপু, তোমার সঙ্গে কি আর তর্ক করি! তুমি ধরেই নিয়েছো রামবাণ ঔষধি বলতে আছে একটিই, যা সমস্ত সমস্যার নিদান, তা হলো গান্ধীবাদ। তাই না?'

'আজ্ঞে না। তার নাম গান্ধীবাদী সমাজবাদ। যেমনটা আমি আগেও বলেছি, আমরাই গান্ধীর উত্তরাধিকারী। আমরা, মানে সোশ্যালিস্টরা।'

'সোশ্যালিস্ট, মানে কী?'—দাদু বাধা দিলেন, 'জওহরলালও তো সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন চান। তোদের জে-পিও সোশ্যালিস্ট। লোহিয়াও। আর এখন, কৃপালনিও। তুই কার দিকে, তুইই বল।'

কুন্দন লক্ষ্য করলো, এই প্রথম সুরেনমামা একটু ফাঁপরে পড়লেন। আশ্চর্য! জয়ের মুখে এসে মামা এভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? সোজা শর্ট মেরে গোলে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন না কেন বলটা?

'সোশ্যালিস্ট মানে সোশ্যালিস্ট।' মামা বললেন, 'একটু-আধটু মতভেদ তো

থাকতেই পারে। সেরকম লৌহকঠিন পার্টি-লাইন আমাদের নেই। আমরা কমউনিস্ট নই যে...'

'দ্যাখো বাবা, কমিউনিস্ট যিনি ছিলেন, তিনি তো কেটে পড়েছেন। আড়ালে ওঁর সমালোচনা করে লাভ কী?'—তিওয়ারিজী আবার চোখ খুলেছেন! হঠাৎ দাদু, যেন কুন্দনের মনের কথা আঁচ করেই, জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, কী-যেন বলছিলি তুই, যে, নারায়ণকে দাঁড় করাচ্ছে? খবরটা কি সত্যি?'

সোশ্যালিস্ট মামার মুখে হাসি ফুটলো, 'পি-এস-পি-র তরফ থেকে জামাইবাবুকে খোসামোদ করা হচ্ছে। কিন্তু জামাইবাবু গররাজি। বলছেন, আমি এই চক্করে পড়বো না। কাল লখনউ থেকে বালেশ্বরজীও এসেছেন, জামাইবাবুকে সাধাসাধি করছেন।'

'কিন্তু বল দেখি, তোর জামাইবাবুকে দাঁড় করাবার আইডিয়াটা এলো কার মাথায়? ওর আবার পি-এস-পির সঙ্গে কী মতলব?'

'ড্যাডি, এই কথাটাই তো তোমাকে এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি বুঝতে চাইবে, তবে তো! কৃপালনিজী এখানে এসেছিলেন, সরাসরি থোড়াই এসেছিলেন। জ্যোলিকোট হয়ে এসেছিলেন আর জামাইবাবু আর তরলা বেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তুমি জানো না? আমি তো বলেছিলাম তোমাকে। কৃপালনিজী জামাইবাবুকে দেখে প্রভাবিত। সবারই অনুমান উনিই নামটা দিয়েছেন। তরলা বেন পর্যন্ত রাজি—উনিই তো আমাদের কথায় জামাইবাবুকে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু জামাইবাবুর সেই এক গোঁ। নির্বাচনী প্রচারে নামতে রাজি, কিন্তু প্রার্থী হবেন না।'

'তাহলে?'

'বালেশ্বরজী ওঁকে চেনেন। রাজি করিয়ে নিতে পারবেন। নইলে অন্য প্রার্থী খোঁজা হবে।'

'তুমি দাঁড়াচ্ছো না কেন?' মুনব্বর মিয়াঁ ফস্ করে বলে উঠলেন। দাদু হাসিমুখে ওঁর দিকে তাকান।

'হ্যাঁ ভাই, নারায়ণরাম দাঁড়াতে পারেন যখন, তুমি কেন পারো না?' তিওয়ারিজী সমর্থন করলেন।

'আমি তো একজন পার্টি-কর্মী। প্রার্থী এমন হওয়া উচিত, যাকে জনগণ চেনে। আমাকে ভোট দেবে কে?' সুরেনমামা সশব্দে হেসে উঠলেন।

'তুমি টিকিট তো হাসিল করো আগে, বাদবাকি আমরা সামলে নেবো। তোমার ড্যাডি থাকতে চিন্তা কিসের?'—মুনব্বর মিয়াঁ বললেন, 'কি মশাই?'

মশাই অর্থাৎ দাদু মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'আরে ছাড়ো। আবার দ্বঙ্গ-টঙ্গে ভুগতে শুরু করবে। সবে তো ওকালতি পাস করে এলো। দু'দিন হলো প্র্যাকটিশ শুরু করেছে। ছ'মাসও পেরোয়নি লখনউ থেকে এসেছে।'

'আপনারা যখন আমাকে জেতাবার হিম্মত রাখেন, তখন জামাইবাবুকে জেতাচ্ছেন না কেন? ওঁকে তো আমাদের পার্টির সবাই চায়।'

বৈঠকে হঠাৎ নিস্তব্ধতা ছেয়ে আসে। কুন্দন এক-এক করে প্রত্যেকের মুখের দিকে চায়। কারও মুখে কথা নেই। বাবা কি তবে হেরে যাবেন? তার অদ্ভুত ঠেকলো, বাবার কথা উঠতেই সবাই হাসাহাসি শুরু করেন কিংবা চুপ মেরে যান কেন? বাবাকে লোকে এভাবে দেখে, এর পেছনে কোনো-না-কোনো কারণ তো রয়েছে অবশ্যই!

'হয়তো আজই ফয়সালা পাকা হয়ে যাবে। কাল বালেশ্বরজীর জনসভা। নীলকণ্ঠেশ্বরের মাঠে। শুনেছি নাকি অদ্ভুত বক্তা। জামাইবাবু ওঁর বক্তৃতা শুনেছেন। আপনাদের সবাইকে যেতে বলেছেন। আসবেন নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এখন চলি। পার্টির মিটিং আছে।'—এক নিঃশ্বাসে বললেন সুরেনমামা। তারপর ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুন্দন এক লহমা দ্বন্দে ঝুলে রইলো। তারপর সেও ছুটে গিয়ে মামার পিছু ধরলো।

ঘরের লক্ষ্মী

'বৌঠান, আজ শুধু চা দিয়ে সারলে চলবে না বলে দিচ্ছি। সকাল-সকাল শুভংকর বামুনের মুখ দেখলে। আজ তো এমনি যে গোয়ালে গাই থাকলে খুলে নিয়ে যাই। যজমান মশাই গেলেন কোথায়?'

'তোমার আবার কী হলো রমদা? এলেন বলে। এই একটু দুধ নিতে গেছেন।'

'টাম্‌টা সাহেব আছেন নাকি?' নিচে থেকে হাঁক পাড়ে কেউ।

'কে? আরে, মুনব্বর সাহেব যে! আসুন-আসুন, বসুন। টাম্‌টা সাহেব বায়ুসেবনে বেরিয়েছেন। আমিও ওঁর অপেক্ষাতেই বসে আছি। আপনিও আসুন, বসুন।'

'পরে আসবো'খন। আমিও হাওয়া খেতেই বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম, রাস্তাতেই তো, শুভেচ্ছাটা জানিয়ে যাই।'

'আমিও তো মশাই ওই করতেই এসেছি। তাড়া কিসের, বসুন না।'

'এখন একটু তাড়া আছেই ভাই। আবার আসবো। আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার!' রামকাকা শিশুর মতো সকৌতুকে বললেন, 'ধরতে কিছু পারলে বৌঠান, নাকি এর পরেও মুখে বলতে হবে?...আরে যা রে, হাঁ করে দেখছিস কী? গরম গরম জিলিপি নিয়ে আয় দেখি চট্ করে। নে।'

'কিন্তু...'কুন্দনের মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে, 'আপনি জানেন না রামকাকা? বাবা তো রাজিই নয়।'

রামকাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে কুন্দনের দিকে এমনভাবে তাকান যেন ভস্ম করে ফেলবেন। 'এই পোঁদপাকা ওয়্যারলেস ইন্সপেক্টারটা আবার কোত্থেকে এসে পড়লো? কে বলল রে তোকে?'

'কেন? বাবাই তো বলছিল।'

'কী?'

'এই, যে, ইলেকশন-টিলেকশান কিছু চাই না আমার।'

'যা ভাগ! ভারি এসেছে ফফরদালালি মারতে। তুমি শোনাও বৌঠান। তোমার সঙ্গে কী কথা হয়েছে?'

'আমার সঙ্গে কী আবার কথা হবে! বাপ-চেলার মাঝখানে আমাকে কে পোছে? সুরেন বলছিল তাই কানে এলো। ইনি আমাকে একবর্ণও কিছু বলেন নি।'

'আরে, গোটা শহর জুড়ে তোলপাড়, আর তোমাকেই জানায় নি! আসতে দাও ওকে।'

'সেইজন্যেই তিন দিন ধরে বেপাত্তা। হাওয়ার মতো কখন ঢোকেন, কখন বেরিয়ে যান, জানতেও পারি না। নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ নেই। সাতসকালে বেরিয়ে মাঝরাতে কখন বাড়ি ফেরেন, কিছুই বোঝবার যো নেই। ...তোমাকে বলেছেন নিশ্চয়ই।'

'কোথায়! এক হপ্তা হলো দেখা-সাক্ষাৎই নেই। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম, ফিরে গেছে। উকিল মশায়ের বাড়ি গিয়ে কাল জানতে পারলাম। তখুনি আসছিলাম, কিন্তু পথে তোমার সুরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বলল, নারায়ণ এখন মিটিঙে গিয়েছে। শুনলাম, লখনউ থেকে কোন্ এক নেতা এসেছেন তোমার কর্তাকে তোয়াজ করতে?'

মায়ের নাকের ফোকর থেকে বড়সড় একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'হায়! আমিই ওঁর শত্রু হলাম!'

'তুই আবার কার শত্রু হলি রামী? সকাল-সকাল কার সঙ্গে কথা বলিছস?' সিঁড়ি চড়তে-চড়তে বাবা মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকালেন। সব ক'টা সিঁড়ি উঠে আসা পর্যন্ত সবুর সইল না রামকাকার, দেখামাত্র, তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাবাকে। 'কনগ্র্যাচুলেশন এম এল এ সাহেব! কনগ্র্যাচুলেশন!'

'ও, তোমার কাছেও ডাক পৌঁছে গিয়েছে দেখছি! এ কসবা, না, রামঢোল?' আপাত বিরক্ত স্বরে বললেন বাবা, 'আর তুই যেন কী বলছিলি রামী?'

'নাও, এবার শুধোও, একবর্ণও যদি আমাকে বলেছেন কিছু।' মা খোঁটা দিতে ছাড়েন না।

'দুয়ো দুয়ো! বৌঠানকে শুধোলি না পর্যন্ত, আর এম এল এ হওয়ার খোয়াব দেখতে শুরু করে দিলি?'

'কোন্ শালা খোয়াব দেখছে!' বাবা বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমরা আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে কি না?'

'টাম্‌টা সাহেব!' আবার নিচে থেকে কে যেন হাঁক পাড়লো। বাবা মাথা চাপড়ে বসে পড়লেন, 'রামী, বলে দে গিয়ে, টাম্‌টা সাহেব এখানে নয়, ওখানে থাকেন। কে এসেছে, জানি। কোথাও কিছু নেই, মিছিমিছি জ্বালাতে এসেছে। ক'দিন আগে পর্যন্ত সোজা মুখে কথা বলতো না। এখানে এই হচ্ছে মানুষের কদর!'

'আরে, বাড়িতে কেউ নেই নাকি? টাম্‌টা সাহেব!'

'তুমিই বলে দাও রমদা, বাড়ি নেই।' বাবা দাঁতে দাঁত ঘষেন।

রামদত্ত মাস্টার ঝট্ করে উঠে জানালার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আরে, লালাজী না? বাঃ, আসুন-আসুন লালাজী। টাম্‌টা সাহেব বাড়িতেই আছেন।'

নাদুস-নুদুস শরীর নিয়ে গোটা বাড়ি কাঁপাতে-কাঁপাতে লালা হরগোবিন্দ সিঁড়ি ভেঙে দরজার সামনে আবির্ভূত হন, 'কনগ্র্যাচুলেশন টাম্‌টা সাহেব। কখন থেকে ডাকছি...'

'মাফ করবেন। আমরা পেছনের উঠোনে ছিলাম কিনা, শুনতে পাইনি। তাছাড়া টাম্‌টা সাহেব বলে এনাকে কেউ ডাকে না, তাই খেয়াল করিনি।' মা আনত হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

'বেঁচে থাকো মা, সুখে থাকো। কতো রোগা হয়ে গেছো তুমি! শরীর ভালো তো?'

'ভালো আছে লালা মশাই। আপনার গলা কেন চিনতে পারলাম না, তাই ভাবছি। আমি তো এই হেঁশেলেই ছিলাম।'

'ঠিক আছে মা, ঠিক আছে। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তারপর বলুন মাস্টার মশাই, কেমন চলছে? আপনার সঙ্গেও অনেকদিন পর দেখা হলো। বাজারে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছেন নাকি? এখন মিষ্টিমুখ করান দেখি, বন্ধুকে জেতাতে যদি চান।'

'আমরা জেতাবার কে লালাজী? রমরমা তো আপনাদের।'

কুন্দন এতক্ষণ পাশের ঘরে বসে সব শুনছিল। কাঠের পার্টিশান। একটা ফোঁকরে চোখ রেখে বাবার মুখটা দেখতে পায় ও। কাঠের মতো, ভাবলেশহীন।

'কি ভায়া, এমন আনন্দের দিনে গোমড়ামুখ নিয়ে বসে আছো যে!' লালাজী একবার বাবার মুখের দিকে তাকান, একবার রামদত্ত মাস্টারের মুখের দিকে। বাবা নিরুত্তর।

'আসলে কি জানেন লালাজী, আপনি তো এনাকে চেনেন। বৈরাগী মানুষ। কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি ইলেকশানে দাঁড়াবেন। এখন ফেঁসে গিয়ে অবস্থা কাহিল।'

'বাঃ ভায়া, এতে কাহিল হওয়ার কি আছে? এ হলো গণদেবতার আকাঙ্ক্ষা। আর, আমরা তো আছিই সঙ্গে।'

'ব্যস, লালাজী, আপনারা শুধু এইভাবে ওর মনের জোর বাড়িয়ে চলুন যাতে ও সোজা সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। ওর এখনকার মনের অবস্থাটা কেমন জানেন? সমুদ্র লঙ্ঘনের আগে ঠিক যেমনটি হনুমানের হয়েছিল।'

'কেয়াবাত! কেয়াবাত! ...কহঈ রীছপতি সুনু হনুমানা। কা চুপ সাধি রহেহু বলবানা। কওন সো কাজ কঠিন জগ মাঁহী। জো নহিঁ হোই তাত তুম্‌হী পাহীঁ...'

'বাঃ লালাজী! মোক্ষম শোনালেন কিন্তু। এবার বৈতরণীটা আপনিও পার করে দিন। জামবন্তের রোলটা আমরা যে আপনার জন্যেই তুলে রেখেছি।'

লালাজীর দমফাটা হাসিতে গোটা বাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল, 'ভালো বলেছেন মাস্টার মশাই! আসল জামবন্ত তো হলেন আপনি। আমাকে ঐ ক্ষুদ্র বানর হয়েই থাকতে দিন। যা হুকুম করবেন, তামিল করব।' নিজেরই কথায় আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন তিনি।

'দেখুন, আপনি জামবন্ত হতে পারেন। আলবাৎ হতে পারেন। কিন্তু আমি হনুমান নই মোটেই। এই ঢঙ্গ-টঙ্গের ফাঁদে পড়ার পাত্র আমি নই। সাফ কথা।'

'আহা, এতে ঢঙ্গ-টঙ্গের কথা আসে কোত্থেকে নারায়ণ ভায়া! এ হলো দেশসেবা।'

'হবে হয়তো।'—বাবার গলা যুগপৎ নিস্তেজ ও কর্কশ শোনায়ঃ 'দেশসেবার, হয়তো, এও একটা পন্থা। কিন্তু আমার পন্থা আলাদা। আমাকে আমার ধর্ম নিয়েই থাকতে দিন। পরধর্মে আমার ভীষণ ভয়।'

'আহাম্মক কোথাকার! এইজন্যেই কি তোকে ভগবদ্‌গীতা পড়িয়েছিলাম?' রামদত্ত মাস্টার এবার সত্যিসত্যিই কপাল চাপড়ানো শুরু করে দেন।

এই সময়ে, মা ঘরে ঢোকেন। ওঁর হাতে প্লেটভর্তি জিলিপি আর ধূমায়িত চায়ের কাপ।

'এই না হলে কথা!' আস্ত একখানা জিলিপি তুলে নেন লালাজী। ভাঙতে-ভাঙতে বলেন, 'আরে ভাই, সোশ্যালিস্ট পার্টির টিকিট পাওয়া চাট্টিখানি কথা? ওদের সঙ্গে আপনার তো তেমন সংস্রবই ছিল না, তবু সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকেই বেছে নিয়েছে। এটা কম কিসের?'

'এ আর বড়ো কথা কি?' বাবা বললেন, 'আর, তাছাড়া এখনও পর্যন্ত টিকিট পাইনি। এমন কিছুই হয়নি, আর আপনারা চলে এসেছেন অভিনন্দন জানাতে! ভালোই মস্করা করছেন কিন্তু! বুঝে উঠতে পারছি না আপনারা আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? উমেদারি করার লোকের অভাব ছিল কিছু যে আমাকে ঐ তপোবন থেকে টেনে তুলে আনলেন এখানে?'

'অভাব ছিল। তাই তো তোকে বেছেচে।' খিঁচুনির সুরে বললেন রামদত্ত মাস্টার—'সবাই বোকা। আর একা তুই রাজা জনক।'

বাবা চুপ মেরে যান। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে আসে

রান্নাঘর থেকে, 'ঠিক বলেছো রমদা। নিজের সামনে গোটা দুনিয়াটাকে উনি বোকা মনে করেন। আজ অব্দি কারও কথা কানে তুলেছেন, যে, আজ তুলবেন?'

'তুই এ কথা বলছিস রামী? তুই!'—বাবার গলাটা কেমন ক্ষুব্ধ অথচ অসহায় শোনায়।

লালাজী উঠে পড়লেন। 'আচ্ছা ভাই, আমি এবার চলি। তুমি ভেবো না রামী, ইনি দাঁড়াবেন। আলবৎ দাঁড়াবেন, আর জিতবেনও নিশ্চিত। ফয়সালা তো এঁর একার নয়, জনগণের। না করার কোনো অধিকারই এঁর নেই। আরে ভাই, ঘরোয়া ব্যাপারে জেদাজেদি চলতে পারে। আর, এ হলো দেশ আর দশের প্রশ্ন। টাম্‌টা সাহেবকে কে না চেনে! নীতিবাগীশ মানুষ। এঁর সংকোচের কারণটা বুঝেছি। কিন্তু মাঠই যদি না পান, খেলবেনটা কোথায়? আর খেলবেন না, ভিড়বেন না, তো গোল করবেন কিভাবে শুনি? দেশের আজ এইরকম নিঃস্বার্থ সেবকেরই প্রয়োজন বেশি। আমাদের মতো বাজে লোকগুলো ওখানে গিয়ে পৌঁছলে দেশের বারোটা বাজতে কতক্ষণ? আরে এরকম সাধু-মহাত্মারাই যদি সামনে এগিয়ে এসে হাল না ধরেন, তবে এই তরণী ওল্টাতে কতক্ষণ? তখন ঐ পূতিগন্ধময় নেতারাই দেশের মোড়ল হয়ে বসবে। দুর্নীতি ছড়াবে, রাজনীতি নিকৃষ্ট আর নোংরা লোকদের পেশা হয়ে দাঁড়াবে। কি মাস্টার মশাই, আমি ভুল বলছি?'

'আপনি ষোলো আনা নির্ভুল বলছেন লালাজী। আপনি দেশ-দুনিয়া দেখা মানুষ। ধর্ম, রাজনীতি, ব্যবসা, কোনো কিছুই বাদ রাখেন নি। আমিও এতো সহজ আর সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারতাম না। দারুণ বলেছেন!'

'সত্যি বলেছো রমদা'—আবার মায়ের গলা শোনা গেল—'বাবা বলতেন, বুড়ো মানুষের কথা আর আমলকীর স্বাদ বাসি না হলে বোঝা যায় না। ইনিও বুঝবেন, পরে। আজ কোনো নতুন কথা নাকি?'

রামকাকা হো-হো করে হেসে ওঠেন। লালাজী ওঁকে সঙ্গ দেন। বাবাও হাসেন, তবে কষ্টহাসি, যাকে ঠিক হাসি বলেও শনাক্ত করা যায় না।

'আচ্ছা ভাই, চলি।' লালাজী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

'আমার কেমন খট্‌কা লাগছে কাকাবাবু, ইনি আমাদের ভেতরের খবর নিতে এসেছিলেন। বিকেলে হাভেলি গিয়ে সমস্ত জানিয়ে আসবেন।'

'তুই চুপ কর তো!'—মা মুখ-ঝামটা দিলেন, 'তোর মতো বয়েস থেকে এঁকে চিনি। ইনি আমাদের খারাপ চাইবেন?'

'এখন তুই কী বলতে চাস্, বল্? লালার সামনে অতশত বলার কী দরকার ছিল? কুন্দনের কথা সত্যি হলেও হতে পারে। তুমি এদিকে এসো বৌঠান।'

মা এগিয়ে এসে চট্ করে একটা পিঁড়ি পেতে বসে পড়েন। রামকাকার মুখোমুখি।

বাবা উঠে গিয়ে অধীর ভাবে পায়চারি করা শুরু করে দেন। যথেষ্ট উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। এবার দেখো রগড়।

'কুন্দন, তুইও আয় এদিকে। আজ পড়াশোনা থাকতে দে।'

'আরে, কি ছেলেমানুষী করছো? পড়তে দাও ওকে। ও এখানে কী করবে?' বাবা বিরক্তি প্রকাশ করেন।

'হ্যাঁ, যেন তুমিই ওর লেখাপড়ার চিন্তা করে মরছো। কখনও জানতে চেয়েছো, কী পড়ছিস? রমদা, ছেলেকে একেবারে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন। যখনই দেখো, বাপে-চেলায় গুজগুজ ফুসফুস চলছে। আমি যেন বাড়িতেই নেই!'

বাবা কয়েক লহমা অপলক তাকিয়ে থাকেন মায়ের মুখের দিকে। তারপর ঢোঁক গিলে বললেন, 'বেশ বলেছিস! আমার নিজের মাথাই কাজ করছে না, তোকে বলবো কী? দেখছিস যে রমদার সঙ্গেই কোনো কথা হয়নি। কুন্দনের অভ্যেস তো তুই জানিস। হাভেলিতে যত কথা হবে, সব এক-এক করে আমাকে শোনানো চাই ওর। আমি শুনতে চাই আর না চাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা!' কুন্দন আর দম কষে থাকতে পারে না, 'কাল তুমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চাওনি বুঝি?'

'যাক্ গে, বাদ দে। আগে তুইই বল্, পরামর্শদাতা যখন হয়েছিস। তুই শিশুটিও আর নেই, ম্যাট্রিকের পরীক্ষা দিতে চলেছিস। তুই বল তোর বাবার কি ইলেকশানে দাঁড়ানো উচিত?'

'নিশ্চয়ই উচিত। আমি তো এই কথাই বলছিলাম বাবাকে। নইলে সুরেন মামা দাঁড়িয়ে পড়বে।'

'বাপের মতো তোর মাথাটাও গেল নাকি?' মা আবার মুখ-ঝামটা দিলেন।

'না না রামী, ও ঠিক বলছে। কুন্দন কখনও মিথ্যে বলতে পারে না। হাভেলিতে যা শুনেছে, তাই বলছে।'

মা কপাল কুঁচকে বললেন, 'কী বলছো তুমি! তোমাকে যে এবার টিকিট দেওয়া হচ্ছে,সে-খরচটা তো ওই দিয়েছে আমাকে। কতো খুশিখুশি লাগছিল ওকে! কতো সম্মান করে তোমাকে!'

'জঘন্য পলিটিক্স।' রামদত্ত মাস্টার বলে উঠলেন, 'বৌঠান, এ দেখছি ত্যাড়া ব্যাপার!'

'এতে ব্যাঁকা-ত্যাড়ার কিছু নেই রমদা। সহজ ব্যাপার। বেঁচে গেলাম বাবা, আমি এই চাইছিলাম।'

'তুমি তো চাইবেই'—মা হঠাৎ তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন, 'আর, তুইও খুব মজা পাস লাগানি-ভাগানি করতে, না? আর, রমদা, এই ঘরের শত্রু বিভীষণটা

এলো কোত্থেকে আমাদের বাড়িতে বলো দেখি?... আমি এক্ষুনি দেখছি গিয়ে কী করে দাঁড়ায়!' মা সত্যিসত্যিই উঠে দাঁড়ান।

'আরে, আরে, করিস কি? পাগল হয়ে গেলি নাকি?' বাবা দু'হাতে ধরে মাকে বসিয়ে দেন, 'বেচারি সুরেনের কী দোষ? ও তো আমার পেছনে লেগেছে মাস খানেক হলো। যখন এখানকার সমস্ত নামী-দামি নেতা—তোর বাবাও—ওকে চান, তো ও কী করবে? ওঁরা আমাকে উপযুক্ত মনে করেন না, ব্যস। এইটুকু কথা। ...আর আমিই বা চাই নাকি?'

'এইসব ছলপ্যাঁচ আমি বুঝেছি। অতটা মাথামোটা আমি নই, বুঝেছো?' মা বললেন, 'তোমার হাঁটুর বয়েসী, তোমার মোকাবিলা করবে কি? বাবাই বা এমন কাজ করতে যাবেন কেন? কান-ডাঙানিয়াদের সর্বনাশ হোক। ওদের ঘরে বাজ পড়ুক যারা আমাদের পেছনে লেগেছে। আমরা ওই বজ্জাতগুলোর বাড়া ভাতে ছাই দিতে গেছি নাকি?'

'কিছু না জেনেই অগড়মবগড়ম শুরু করে দিস তুই।' বাবা খিঁচুনি লাগান, 'আমাকে দাঁড় করাতে চাইছে কেন, তুই জানিস?'

'আমি কি জানি, যাদের চোখ আছে, তারাই জানে। কে না চেনে তোমাকে? ওই হিংসুটেগুলো অন্ধ হতে পারে, তা বলে সবাই অন্ধ?'...

'ব্যস্ , এখানেই ভুল করছিস রামী। আমার একমাত্র যোগ্যতা এই যে আমি সিডিউল কাস্ট, বুঝেছিস। ...সিডিউল কাস্ট না হলে এমন হাহুতাশও করতো না ওরা। এতো বছর ধরে কাজ করছি, ওদের ব্যাপারে আমাকে কখনও ইন্টারেস্ট নিতে দেখেছিস? আমার নিজের লোকেরাই যখন আমাকে নিজেদের প্রতিনিধি বলে গণ্য করে না, তখন আচার্য মশাই বললেই বা। সিডিউল কাস্টই চাই যখন, তখন যারা তাদের ঠিকেদারি করছে তাদেরকে চান্স দিলেই পারে। এতে তো আমি ওদের চক্ষুশূল হবোই। কেন হবো না, তুইই বল।'

'বাজে বকিস না'—এতক্ষণে আবার সরব হলেন রামকাকা—'আগে যা ঘটেছে, ঘটেছে। এখন সামনের দিকে তাকা।'

আমি তো সামনের দিকেই তাকিয়ে বলছি রমদা। পেছনে দেখছে এরা। তুমি এর আগে কোনদিন লালাকে এ বাড়িতে আসতে দেখেছো? তোমার মনে আছে, বেসিক ইস্কুলের জন্যে চাঁদা চাইতে গিয়েছিলাম যখন, কী বলেছিলেন?'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি নারান? এখন তো সঙ্গে রয়েছেন। একটু আগে মুনব্বর মিয়াঁও এসেছিলেন। কী হয় তুই দেখে যা শুধু। আরে, মানুষের স্বভাবই এই। আমাদের কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা। আমরা তো এঁদের ডাকতে যাইনি, নিজেরাই ছুটে এসেছেন। তুই এটা ভাবছিস না কেন, বেটার লেট দ্যান নেভার? দেরিতেই সই, লোকে চিনছে তো তোকে? এই হলো রীতি. গাঁয়ের যোগী ভিখ

পায় না। বাইরে যখন তাকে নিয়ে হৈ-চৈ হয়, তখনই কাছের লোকজনের টনক নড়ে। কিন্তু নড়ে তো, এটাই বা কম কিসের? এ শুধু এই অনন্তপুরের ব্যাপার নয়, গোটা দেশের এই হাল। এটাই আমাদের ক্যারাক্টার নারান, মাথা গরম করে লাভ নেই। যা আছে তা আছে।'

বাবাকে মন দিয়ে রামকাকার কথা শুনতে দেখে কুন্দনের বেশ ভালো লাগছিল। অবশ্যি, সব কথা ওর বোধগম্যির বাইরে।

'আর, ওই সিডিউল কাস্টের কথা কী বলছিলি? তুই যে কাস্টেরই হোস না কেন, কী এসে যায় তাতে?'

'এসে যায় না কেন রমদা? বাবা হঠাৎ নড়েচড়ে বসেন, 'রাজনীতিতে সিডিউল কাস্টের অনেক দাম। তুমিই বলো, আমি সোশ্যালিস্ট নই, তবে সোশ্যালিস্ট পার্টির লোকেরা আমাকে চাইছে কেন? কংগ্রেস যেমন ব্রাহ্মণ ক্যাণ্ডিডেট দিয়েছে, এরাও সেটা করছে না কেন? কোনো ঠাকুরকে ধরলেই পারতো।

'তুই যদি ব্রাহ্মণ বা ঠাকুর হতিস, তবু তোকেই ধরতো। তোর ব্যাপারই আলাদা। আমি মানতে পারছি না যে এরা সিডিউল কাস্টের অঙ্ক কষে তোকে নির্বাচন করেছে। আর, ধরে নে, এটাও না হয় একটা ব্যাপার, হলেই বা? রাজনীতি তো সমাজের চালেই চলবে।'

'আমি তা মনে করি না।' বাবা আবার নড়েচড়ে বসলেন, 'এই রাজীতিতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।'

রামকাকার মুখে অসহায় ক্রোধ ফুটে ওঠে। কুন্দন নিজেকে আর চুপ করে রাখতে পারে না—'সিডিউল কাস্টের ব্যাপার নয়। সোশ্যালিস্টরা বাবাকে স্রেফ এইজন্যে বেছেছেন যেহেতু বাবা পাক্কা গান্ধীবাদী, আর সোশ্যালিস্ট পার্টিই গান্ধীজীর আসল উত্তরাধিকারী।'

তিনজনের চোখেই বিস্ময়। মা অবাক স্বরে বললেন, 'আরে, এ যে দেখছি সত্যিসত্যিই সেয়ানা হয়ে উঠেছে! তুই কি করে জানলি রে?'

'সুরেন মামা বলছিল।'—মায়ের প্রশ্নটাকে ভীষণ বাজে আর বোকা-বোকা ঠেকলো কুন্দনের। সত্যি কথা বলাটাও কী বিচ্ছিরি পরবশতা! বাবা দিব্যি না গেলালে, এটাও বলবার দরকার ছিল না।

'ঠিক কথাই বলেছে সুরেন।' মা এবার সুযোগ পেলেন—'তোমাকে দাঁড় করানোর এই হচ্ছে আসল কারণ। সিডিউল কাস্ট হওয়াটা যদি এর সঙ্গে একটু জুড়ে গিয়ে থাকে, তাতে তোমার জ্বলুনি হচ্ছে কেন? তুমি তো সিডিউল কাস্টই। বরাবর আমাকে শুনিয়ে এসেছো তোমার বাবা সিডিউল কাস্ট হওয়ার হাজার রকম ফয়দা তুলেছেন। এখন তুমি যখন সুযোগ পাচ্ছো, তুমিই বা তুলবে না কেন?'

সর্বনাশ! মা গো, এ তুমি কী বলে দিলে! এ তোমার মনের কথা নাকি? বাবাকে

তুমি চেনো না? ওঁর দিকে চেয়ে দেখো, কেমন কালো হয়ে গেছে মুখটা?...পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে যেন!... চতুর্দিক অন্ধকারে ভরে গেছে যেন...মা, তুমি জানো, কী বলে ফেলেছো তুমি? তুমিই হলে সেই ধরিত্রী, যার ওপর মানুষটা দাঁড়িয়ে আছেন। যার ওপর চলাফেরা করেন। কেউ যখন থাকে না ওঁর কাছে, যখন সবাই ছেড়ে চলে যায়, তখন, তখনও মা, একা তুমিই সহায় থেকে যাও বলে সমস্ত সইতে পারেন। এবার কী হবে বলো তো! আমাকে বলো, কী হবে এবার?

কে বলছে এসব? কুন্দন? না, কুন্দন বলতে যাবে কেন?

'ওখানেই তো যত গণ্ডগোল রামী।' বাবার গলার আওয়াজটা যেন এক সুগভীর কূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে! কুন্দন চমকে উঠলো? কেন চমকে উঠলো কুন্দন? ...আর, এখন আবার কে কথা বলছে? রামকাকা? হ্যাঁ, রামকাকাই তো।

'তুই তো নিজেই বলিস যে আমি সিডিউল কাস্ট নই, গোটা হিন্দু-সমাজ আমি। বলিস কি না?'

'হ্যাঁ বলি। তাতে কি? আমি এ কথাও বলি যে সিডিউল কাস্টের আলাদা হয়ে থাকাটা ঠিক নয়, সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ হওয়া উচিত—গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন।'

'এখন ভায়া, গান্ধী কী চেয়েছিলেন, তা নিয়ে আমাদের কি হবে? তুই কথায়-কথায় গান্ধীকে টেনে আনিস কেন বল তো? মোদ্দা কথা, তুই চাস। আর, তুই যা চাস, আমরাও তাই চাই। ঠিক কি না বৌঠান?'

'তা নয়তো কি?'

'ব্যস, রফা হয়ে গেল। গান্ধী তোর সঙ্গে, সোশ্যালিস্টরা তোর সঙ্গে, সিডিউল কাস্ট তোর সঙ্গে, পরমভট্টারক আচার্য রামদত্ত তোর সঙ্গে, রামী বৌঠান তোর সঙ্গে...এবার বল, আর কী চাস তুই? ...আরে, নিছক সিডিউল কাস্টকে দাঁড় করানোই যদি সোস্যালিস্টদের টেনডেন্সি হতো, তাহলে ওরা তোর শ্বশুর মশায়কে গিয়েই ধরতো না কি, যিনি একজন গণ্যমান্য শুদ্র নেতা? তোর মতো অ্যান্টি সিডিউল কাস্ট শুদ্রের কাছে আসতে গেল কেন?'

'বাঃ, বামুন ঠাকুর, বাঃ!' রামকাকার বুদ্ধির বহর দেখে মা একহাত নিতে ছাড়েন না, 'তুমিও রমদা কেমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলছো! দুনিয়া জানে যে বাবা হলেন গিয়ে কংগ্রেসী নেতা। সোশ্যালিস্টরা ওঁর কাছে যাবে কেন? একটা টিকিটের লোভে উনি কংগ্রেস ছেড়ে দিতেন নাকি?'

'বৌঠান, রাগ কোরো না। টিকিটের জন্যে লোকে নিজের ধর্ম, নিজের বউ-ছেলেপুলে পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। কংগ্রেস ছাড়তে কি? কংগ্রেসই ওনাকে টিকিট দিয়েছে নাকি? এ হচ্ছে রাজনীতি, বৌঠান, কলিযুগের রাজনীতি। এখানে পাশা পাল্টাতে

সময় লাগে নাকি? এখন এই অঞ্চলে সোশ্যালিস্টদের পাল্লা ভারি। কংগ্রেসের অবস্থা ল্যাজে-গোবরে। গোটা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন টাম্‌টা সাহেব, আর এটুকু বোঝেন না যে রুটির কোন্ পাশটা ফসকা?'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না রমদা। এই বয়েসে ওনার ইলেক্‌শানে দাঁড়াবার সাধ জাগবে নাকি? সবই তো ভোগ করেছেন। তুমি আমার শ্বশুর মশায়কে ভেবেছোটা কি?'

মা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হেসে ফেলেন। রামকাকার চোখদুটিতেও দুষ্টু হাসি। 'ওহো, আজ যে বড়ো গণতাই করছিস শ্বশুর মশায়ের! ব্যাপার কি গো বৌঠান?'

'চুপ করো বামুন পো। বেশি রগড় কোরো না, হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।' রামদত্ত মাস্টার ঠাণ্ডা মেরে যেতে-যেতে নিজের পিধান থেকে অন্য একটা তীর বের করলেন, 'বেশ, না-হয় মেনে নিলাম তোর শ্বশুর মশায় এই সোশ্যালিস্টদের কাছে টক আঙ্গুরই ছিলেন। কিন্তু ওঁর ছেলেটি তো তা নয়। একে লখনউয়ের এল এল বি, এখানকার সোশ্যালিস্ট পার্টির জয়েন্ট সেক্রেটারি, তায় সিডিউল কাস্ট। ওর মধ্যে এমন কী ছিল না, তুই বল? এরকম আরবি ঘোড়াকে ছেড়ে তোর মতন একবগ্গা টাট্টুকে সামনে রেখে বাজি ধরতে গেল কেন?'

বাবার গাম্ভীর্যের সাপটা আস্তে-আস্তে ফণা নামিয়ে নিতে-নিতে হঠাৎ ফোঁস করে ওঠে, 'টাট্টু! ভালো বলেছো। ছাগল বললেই কিন্তু বেশি মানাতো।...'

কুন্দনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললো, 'আপনি জানেন না রামকাকা, বাবার নামটা আচার্য কৃপালনি নিজে সাজেস্ট করেছেন।'

রামদত্ত মাস্টারের গোটা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'দ্যাখো বৌঠান, তোমার কর্তার র‍্যালা দ্যাখো।'

'তুমি এই কর্তা-কর্তা কোরো না তো রমদা। আমার ভীষণ খারাপ লাগে। স্বামী বললেই পারো।'

'স্বামী মানেও তো কর্তাই, নারান।'

'তা কেন হবে? তোমার সংস্কৃতের বারোটা বেজেছে দেখছি।' বাবা এবার সত্যিসত্যিই হেসে ফেলেন, 'ওই ইংরেজিতে কী-যেন বলে...হাজব্যাণ্ড? ওর মানে কি?'

'ওর মানেও তো ওই ভায়া। কী আর করবে?' রামকাকা বললেন।

কুন্দন ঝট্ করে উঠে গিয়ে ডিক্সনারি পেড়ে আনলো। 'এতে দেখবো কাকাবাবু?' রামকাকা ছোঁ মেরে ডিক্সনারিটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন, 'আরে বাবা, তুই আবার আমার কাছা খুলতে উঠেপড়ে লাগলি কেন? গুরুকে শ্রদ্ধা করতে

শেখ। আমি যখন বলছি, মেনে নিচ্ছিস না কেন? আমার মুখের চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী?'

'ঠিক আছে বাবা, রেখে দে ডিক্সনারি।' বন্ধুর তরফ থেকে বাবাই পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু, না...পরক্ষণে বললেন, 'কিন্তু এটা জরুরী নয় রমদা যে হিন্দীও সংস্কৃত আর ইংরেজির ধাঁচে চলবে। অন্য কোনো শব্দ বানাতে পারো না কেন? এই স্বামী-টামী ছাড়ো।'

'দেখছো রমদা, কেমন কথা পাল্টাচ্ছেন! কোথাকার কথা, কোথায়!'

'হ্যাঁ, বলো তো বরমশাই, বলো কনেবউ। প্রসঙ্গটা কী-যেন ছিল?'

'ছি ছি! আজ কী-যে হয়েছে বামুন পোর। ছ্যাবলামিই যদি করতে হয়, থিয়েটারের দল খুললেই পারো।' 'লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে মায়ের। সত্যি, রামকাকা ভারি দুষ্টু।

'আর কী করি বলো বৌঠান। ইনি সংস্কৃত, উর্দু শুনবেন না। শুনবেন শুধু হিন্দী, বিশুদ্ধ হিন্দী। বিশুদ্ধ হিন্দীতে যা পারি বলছি।'

'বাদ দাও রমদা।' মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার অছিলায় বাবা বললেন, 'মোদ্দা প্রশ্ন হলো, আমি বলির পাঁঠা হতে রাজি আছি কিনা?'

'অ্যাঁ—' রামকাকা চমকে উঠলেন—'এবার এই বলির পাঁঠা কোত্থেকে এসে পড়লো!'

'এই সামান্য কথাটাও তুমি বুঝতে পারছো না রমদা। এ হলো সিডিউল কাস্ট ভোট হাতানোর সোশ্যালিস্টদের একটা চাল। আমাকে শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে ভিড়ানোর চাল।'

'ও বাবা।'...মা চোখ বড়োবড়ো করে বলেন, 'কেমন আড়বুঝ দেখো দেখি। লড়াচ্ছে তো লড়াচ্ছে। তুমি তো আর লড়াচ্ছো না। তোমার আম খাওয়া নিয়ে কথা, আঁঠি গুনছো কি করতে?'

'এর দেখছি আঁঠি গোনার দিকেই মন। দেড় বোঝে আড়াই বোঝে না। যা তোর শ্বশুরও ভাবতে পারেন নি, তুই সেটা চট্ করে বুঝে ফেলেছিস! আরে, সিডিউল কাস্ট ভোট এই এলাকায় আছেই বা ক'টা? তুই জিতলে সবার ভোট পেয়েই জিতবি।'

'আর, হারলে?'

'হারলেও, সবার ভোটেই হারবি। কিন্তু হারবি কেন শুনি? এইমাত্র মুনব্বর মিঁয়া এসেছিলেন, লালাজী এসেছিলেন—ওঁরা কি তোকে হারাতে এসেছিলেন? আর...শ্বশুর মশায় তোর বিরুদ্ধপ্রচার করবেন নাকি? আরে, যাই বলিস না কেন, হাঁটু দুটো শেষপর্যন্ত পেটের দিকেই ব্যাঁকে, কেন গো বউদি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। আর ধরে নাও, লোকলজ্জার খতিরে একটু না-হয় কংগ্রেস-কংগ্রেস করলেন, কিন্তু পাল্লাটা তো শেষপর্যন্ত তোমার দিকেই ঝুঁকবে।'

'কিভাবে রামী, কিভাবে?' বাবা মন্দ-মন্দ হাসেন।

'আমার মন বলছে। তুমি কখনও স্বপ্নে নেতা হওয়ার কথা ভাবতে পেরেছিলে? গোটা বিশ্ব জানে কোন্ ধাতুতে গড়া তুমি। এখন কারও মাথায় বুদ্ধিটা খেলেছে যখন, শেষ পর্যন্ত দেখোই না কী হয়! সবুরে মেওয়া ফলে, বুঝেছো?'

'আমার মনও এই কথা বলছে মা।' কুন্দন হুট্ করে বলে ফেলল, 'বাবাকে জেতাতে সুরেন মামাও আদা জল খেয়ে লাগবে। এই তো পরশুকার ঘটনা, মামা সব্বাইকে এমনি শুনিয়ে দিল যে সবার মুখে কুলুপ এঁটে গেল। দাদু অব্দি চুপ মেরে গেছিলেন। সুরেন মামা কী বললো, জান? হিন্দীতে গরমাগরম বক্তৃতা করার পর ইংরেজিতে এই একটা কথা বলেই সবাইকে কুপোকাত করে ফেলল। বললো, জামাইবাবু ইজ গ্রেট! লং লিভ জামাইবাবু!'

'এর মানে কী রে?' মা-র চোখদুটো চকচক করে উঠলো।

'মানেটা আমি বলছি বৌঠান। এর মানে—জামাইবাবু মহাপুরুষ। ঈশ্বর আমার জামাইবাবুকে চিরজীবী করুন।'

...ঝকঝকে রোদ্দুর আর ঝমঝমে বৃষ্টিকে একসঙ্গে দেখেছো কখনও? ...না যদি দেখে থাকো, তবে ঐ মুখটির দিকে চেয়ে দেখো, যে হাসতে গিয়েছিল ভুলে...যে আবার ভুলে যাবে হাসতে।... আহা, এমন আক্রা মুহূর্ত আবার কখন আসবে?... তুমি বোঝো না কেন বাবা! এ আমার মায়ের মুখ। ...একবারটি চেয়ে দ্যাখো...তুমি যে দেখেও দ্যাখো না...কোনখানে পড়ে আছে তোমার মন?... তুমি কি চেনো না একে? ...তুমিও...

একটা ঝড় বয়ে গেল, হাসির। সবার মুখেই হাসি এখন। একজন তো হাসতে-হাসতে কেঁদেও ফেলেছে। কেউ চেয়েও দেখছে না তাকে, একা ঐ ছেলেটি বাদে, যে হতভম্ব হয়ে ভাবছে শুধু, কী এমন কথা বলে বসলাম রে বাবা যার জন্যে দমছুট হাসি! দ্যাখো, এতক্ষণে কী যেন বলতে শুরু করলেন বাবা। কী বলছেন বাবা?

'সন্তানের কাছে হার মানতে কার না ভালো লাগে ভাই!'

'তবে কি জামাইয়ের কাছে হার মানতে খারাপ লাগে?' মা যেন আপনমনেই বলে উঠলেন।

'হার-জিতের প্রশ্ন নয় রে বাবা,' বাবা বললে, 'এ হলো নীতির লড়াই।'

'কিসের নীতি?' রামকাকা অধীর হয়ে উঠছেন, 'গোটা রামায়ণ পড়ে ফেললি. এখন জিজ্ঞেস করছিস, রাম কে? আরে, কংগ্রেসই যদি তোকে খাড়া করতো,

তখনও তুই নীতি-নীতি বলে চেল্লাচিল্লি করতিস নাকি? সোশ্যালিস্টদের মধ্যে তুই কোন্ দোষটা দেখলি বল্।'

'ওফ!' বাবা দু'হাতে নিজের চুল খামচে ধরেন,—'সোশ্যালিস্টদের দুর্নাম করছে কে? কৃপালনির মতো ত্যাগীপুরুষ যে পার্টির নেতা, তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অনুযোগ থাকতে পারে! আমার কাছে কংগ্রেসও যা, সোশ্যালিস্টও তাই। বরং সোশ্যালিস্টই তুলনামূলক ভাবে ভালো—যেহেতু এই দল বাপুর কাছাকাছি।'...

'তবে কোন নীতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছিস তুই। এতক্ষণ ধরে এতো করে বোঝালাম যে এ তোরই নীতির জয়,... গান্ধী, সোশ্যালিজম, সিডিউল কাস্ট, লালজী, মুনব্বর মিয়াঁ, এই ভুমিয়া বামুন, এই জগন্মাতা...সব তো তোকে দেখেই আজ এক হতে চলেছে। এখন তুই কোন মোহ নিয়ে পড়ে আছিস পার্থ? এতো গীতাপাঠ করালাম তোকে দিয়ে, কী ফল হলো? আর...ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং, ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরংতপ!'... শুনিয়েছি কি না?'

বাবা কয়েক মুহূর্ত ধ্যানমগ্ন থাকার পর বললেন, 'একে তুমি আমার হৃদয়দৌর্বল্য বলে মনে করো রমদা?'

'আলবাত্।'

'না, এ আমার অন্তরাত্মার কথা। এই রাজনীতিকে আমার ভীষণ ভয়। হয় আমি এর যোগ্য নই, কিংবা এই রাজনীতিই আমার যোগ্য নয়। এতে আমি জড়াতে চাই না: ঐ ফাঁদে একবার পা দিলে, আর বেরোতে পারবো না।'

'আশ্চর্য! তুই না গান্ধীর নামের মালা জপিস? গান্ধীজী কি রাজনীতির চোরাবালিতে ঢোকেন নি? পাঁকে আটকে-পড়া রথের চাকাই কি ঐ যোগীপুরুষের আঙুলে সুদর্শন-চক্র হয়ে ঘোরেনি? এই অনাসক্তি টনাসক্তি আশ্রম তো ওঁর চেলা-চামুণ্ডাদের পয়দা করা, যেখানে তোর মতো নির্বোধরাই ফাঁসে। এখন আমার জায়গায় উনি থাকলে কী করতেন জানিস? গায়ত্রীর কিরে খেয়ে বলছি, তোর কান ধরে এমন কষে একটা চড় বসাতেন যে সোজা গিয়ে হামড়ে পড়তিস ঐ ইলেকশানের ময়দানে। এমন কথার শ্রাদ্ধও করতে হতো না। কেন ডোবাচ্ছিস গান্ধীর নাম? উনি লড়াকু পুরুষ ছিলেন, সাধু-সন্নেসি নয়। বুঝেছিস?'

'আমিও লড়াকু, সাধু-সন্ত নই।' বাবা বুক চেতিয়ে বললেন।

'তবে নামছিস না কেন মাঠে?'

কুন্দন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। মাও কম মজা পান নি, উনিও হাততালি দিয়ে উঠলেন। তারপর হেঁশেলে গিয়ে ঢুকলেন।

'তুমি আমাকে গান্ধীনীতি শেখাচ্ছো, না চাণক্য নীতি?' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বাবা আবার মুখ খুললেন।

রামকাকাও দমবার পাত্র নন। কথার পিঠে বললেন, 'আমি যদ্দুর বুঝেছি, এ

গান্ধীনীতিও। না হলেও, কিছু এসে-যায় না। এটা সত্যাগ্রহের যুগ নয়। এখন নেহরু-জমানা ভায়া। গান্ধী-হত্যা এ যুগেই ঘটেছে, সেটা ভুলে যাচ্ছিস কেন? আর, এখন যদি গান্ধীনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাস, তাহলে তাতে অল্পবিস্তর চাণক্যনীতিও ঢোকাতে হবে।'

'কিন্তু রমদা, ভুলে যেও না যে স্বয়ং গান্ধীজীই কংগ্রেসকে বিসর্জিত করার যুক্তি দিয়েছিলেন।'

'থাকতে দে ভাই। যুক্তি বা পরামর্শ এমন হওয়া উচিত যা পালন করা যেতে পারে। দেবতার পরামর্শ দেবতাদের জন্যেই তুলে রাখ, ওসব আমাদের কাজে লাগবে না। দেখলি না, ইংরেজ চলে যেতেই কেমন মারদাঙ্গা বাধলো। কংগ্রেসকে তখন বিসর্জন দিলে কে সামলাতো ঐ কাঁটার মুকুট?'

'সামলাবার দরকার হলে সামলেই নিতো রমদা। এই সোশ্যালিস্টরা ছিলেন কী করতে?'

'অর্থাৎ...তুই বলতে চাস গান্ধীজী সোশ্যালিস্টদেরকে গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছিলেন?'

'অ্যা-হ্যাঁ'...বাবা একটু-যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তারপর নিচু স্বরে বললেন, 'এটাই ধরে নাও'...

'তাহলে...এতো বুঝিস, অথচ এই একগুঁয়েমি কেন? তোকে কি হিন্দু মহাসভা টিকিট দিচ্ছে? তুই তো ওখানে গিয়ে বাপুর কাজই করবি।'

'বলতে পারছি না।' বাবার গলায় এক অদ্ভুত-ধরনের ক্লান্তি ফুটে ওঠে—'এই সোশ্যালিস্ট-টোশ্যালিস্ট আমি বুঝি না। আমি একজন জনসেবক মাত্র। এই রাজনীতি আমার মুরোদে কুলোবে না।'

'রমদা, শুধিয়ে দেখো, এঁর মুরোদে কী রয়েছে?' হেঁশেল থেকে একটু উঁচু গলায় বললেন মা।

'আমি বলছি বৌঠান তোমাকে। এর ক্ষমতায় ব্যস, একটিই জিনিস রয়েছে, তা হলো রামী বউদি। ঘুরে ফিরে সেই তোমার ওপর হুকুম চালাতেই ভালো লাগে ওর। কী, ভুল বলেছি, বৌঠান?'

'ষোলো আনা নিরেট কথাটি বলে দিয়েছো রমদা। কিন্তু আর এ চলবে না। পরিষ্কার বলে দাও রমদা, এই ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে আমি এ-জন্মে আর কথা কইছি না।'

'শুনলি নারায়ণরাম, বৌঠানের কথাটা শুনলি?'

'শুনলাম।' ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস নেন বাবা।

'এবার আমার আল্টিমেটামটিও শুনে রাখ। আমাকেও এতদিন ঢের চরিয়েছিস তুই। এবার কান খুলে শুনে রাখ। এবারেও তুই যদি নিজের ঠ্যাটামি কামড়ে

পড়ে থাকিস আর এই সুযোগ যদি ফসকে যায়, তাহলে বুঝবি তোর-আমার জন্মের মতো আড়ি।... বিকেলের প্রোগ্রাম কী? ওদিকে যাচ্ছিস?'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পান বাবা। সচকিত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, একদম মনেই ছিল না। নীলকণ্ঠেশ্বরের মাঠে আজ বালেশ্বরজীর ভাষণ রয়েছে। আমাকে নিয়েও অযথা টানাটানি করছে। কিন্তু আমি বক্তৃতা-টক্তৃতা কিছু করবো না। ব্যস, বালেশ্বরজীকে শুনতে যেতে পারি মাত্র। তুমি এলে ভালো লাগবে। অবশ্যি গোটা ভাষণটাই কাগজে বেরোবে। সুরেন্দ্র একজন স্টেনোগ্রাফারকে ফুসলিয়ে রাজি করিয়ে রেখেছে।'

রামদণ্ড মাস্টার সিঁড়িতে পা রেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফিসফিসিয়ে জানতে চাইলেন, 'কেন? নির্বাচনী প্রচার এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নাকি? এখন থেকেই?'

'না না, এ তো সাধারণ সভা। কৃপালনিজী আসার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি আর কি। তুমি এসো কিন্তু। দারুণ বিদগ্ধ নেতা। বক্তাও অসাধারণ।'

'আমিও যাবো বাবা, মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।' কুন্দন নিজের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললো।

'তুই গিয়ে কী করবি রে? এতো ভাষণ শুনেও পেট ভরলো না তোর?'

'না, একটুও না।' সহজ উত্তর দিল কুন্দন।

হনুমান উবাচ

'অনন্তপুরের নাগরিকগণ,

আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিনি। এসেছিলাম নিজের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আজ তিনদিন ধরে আমার একটাই কথা বারবার মনে হয়েছে যে, আপনাদের এই শহর দেশের হাজার-হাজার শহরের মধ্যে একটা শহর-মাত্র নয়। এ হলো স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক ভারতবর্ষ! (করতালি)...বন্ধুগণ, আমাকে বলতে দিন। এখানে এসে আমার মনে হয়েছে, এই আমার আসল ঘর। আর এখানকার প্রতিটি মানুষ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি যখন কাল ফিরে যাবো এখান থেকে, এই শহরটাকে গেঁথে নিয়ে যাবো বুকে। আমার এই দুর্লভ অনুভূতির কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতেই এই জনসভার প্রস্তাব স্বীকার করেছি আমি। আপনাদের সঙ্গে এই পরম সুখানুভূতি ভাগ করে নিতে। সৎসঙ্গের মহিমা যে কী অপ্রতিম, তা আমি এই তিন দিন ধরে লাগাতার অনুভব করে আসছি। তুলসীদাস যথার্থ বলেছেন যে, আসল ভ্রমমাণ তীর্থ হলো এই—সাধু-সজ্জনের সমাজ...'মুদ মঙ্গলময় সন্ত

সমাজু, জো জগ জঙ্গম তীরথরাজু।'...বন্ধুগণ, আমি এইমাত্র বললাম, আপনাদের এই শহর স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতবর্ষ। আপনাদের মধ্যে বেশ-কিছু মানুষ হাজার-হাজার বছর ধরে এখানে বাস করছেন, আবার কেউ-কেউ পরে বাইরে থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেছেন। কিন্তু সম্ভবত তাঁরাও নিজেদেরকে এখন আর বহিরাগত বলে মনে করেন না। বন্ধুগণ, আপনাদের এই ভারতবর্ষও পৃথিবীর বুকে এমনি এক বিরল দেশ, যেখানে যুগ-যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতি এসে আশ্রয়লাভ করেছে। এ এক এমন দেশ, বন্ধুগণ, যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ঠাঁই হয়েছে, যেখানে কেউ তিরস্কৃত বা ঘৃণিত নয়। পুরনো মহান সভ্যতাসমূহ এখানে নিজদের কাজ সেরে হাজার-হাজার বছর আগেই চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মানবজাতির এই মহান পরীক্ষাগারটি এখনও যেমনকার তেমনি কায়েম রয়েছে, কেননা তার পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। এর পেছনে কি কোনো কারণ নেই? বন্ধুগণ, এর পেছনে একটা-না-একটা কারণ তো অবশ্যই আছে।

বন্ধুগণ, আমরা রাজনীতির লোক, আমাদের শব্দের অকুলান হয় না কখনও। আমার কথার মধ্যে কোনো কারসাজি আছে কিনা, আপনারা আগে সেইটা ধরার চেষ্টা করুন। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই অনন্তপুর দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত জেলা এবং এখানকার একশো শতাংশ মানুষ সাক্ষর। সুতরাং আমি ভালো করেই বুঝি যে আমি এমন এক শহরের নাগরিকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি যাঁরা নিছক স্নায়ুতে সুড়সুড়ি জাগানো কথায় মজবেন না। যাঁরা একটিও অনভিজ্ঞ বা যুক্তিহীন শব্দ শুনতে চাইবেন না। এ হলো গঙ্গা-যমুনার উৎসভূমি, এখানে যুগ ও কল্পের সাক্ষী নাগাধিরাজ হিমালয় দণ্ডায়মান। এখানে, বন্ধুগণ, মিথ্যে চলে কেমন করে? এখানে সস্তা আর স্থূল ভাষণের দাম কি? এই মানব-সমুদ্রের দেশই, এই মানবজাতির প্রয়োগশালার দেশই হাজার বছর পরাধীন হয়ে থেকেছে, আর আপনারা হয়তো ভাবছেন,—আপনাদের মুখে শঙ্কার ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি, আপনারা হয়তো জবাব তলব করছেন যে, হ্যাঁ, তোমার এই মহান দেশের বুকেই এই শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হলো দু'দিন আগে। তাও ধর্মের নামে হত্যা! এরাই কি তোমার সেই ভারতবাসী, যারা পৃথিবীর বুকে মানুষের বেশে এক দেবতাকে হত্যা করলো আর এমন একটা সময়ে করলো যখন তিনি আমাদের দগদগে ঘায়ে মলহম দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন?

হ্যাঁ, সাথী, আপনারা যথার্থ বলেছেন। আমি আর আপনারা, আমরা সবাই সেই অভাগা আর হত্যাকারী দেশের সন্তান। আমাদের এমনি বহু কলঙ্ক রয়েছে যার কালিমা গঙ্গার সমস্ত জল নিঃশেষ করে দিয়ে ধুলেও ঘুচবে না। মানসিক দিক থেকে আজও কি আমরা দাস বা পরাধীন নই? এই স্বাধীনতা কি নিছক ভাঁওতা, ফেরেব, যে-কোনো মুহূর্তে যা ভেঙে যেতে পারে? এই দেশের ললাটে

এখন কোন্ লিখন খোদাই করা রয়েছে, আপনারা পড়বার চেষ্টা করুন, বন্ধুগণ, আর আমাকে বলুন সেটা কী?

বন্ধুগণ! আপনারা এমনি আর-একটা দেশের নাম জানাতে পারেন, যার অদূর ইতিহাসে একসঙ্গে এতো বিপুলসংখ্যক আর এমন বিলক্ষণ মহাপুরুষের জন্ম ঘটেছে? আর তাঁরা প্রত্যেকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে জিনিয়াসই শুধু নন, তাঁরা নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্য ও জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধি করেছেন? এতে কী প্রমাণ হয়? এতে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে আমাদের মধ্যে এতসব নোংরামি আর মূঢ়তা থাকা সত্ত্বেও এখনও মারা যাই নি, বেঁচে আছি? বেঁচে আছি এইজন্যে যে আমাদের মধ্যে থেকে এখনও বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনারা দেখুন, আমাদের এই চলমান ইতিহাসে সেই প্রতাপী মহাপুরুষেরা কারা, যাঁরা আমাদেরকে আমাদের বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন! আমি আপনাদের সমক্ষে মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। এমনিতে উদাহরণের অভাব নেই। কিন্তু আমি যে দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরতে চাইছি, তা আমার পরবর্তী কথার যোগসূত্রেই এসে পড়ছে। আমার অনুরোধ, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন এবং অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এক দিব্যবিভূতি সিদ্ধ হন, যিনি আমাদের ধর্ম-চেতনার প্রাণবন্ত শক্তিকে সমগ্র বিশ্বের সামনে সপ্রমাণ করেন, যার নজির আমাদের ধর্মেতিহাসে বিরল। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত বিশ্ববিদিত, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না। এরপর আপনারা বিবেকানন্দ মহারাজকে দেখুন, ভারতীয় ধর্ম-চেতনার বাণী গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যাঁকে বেছে নিয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। তিনি কিন্তু ব্রাহ্মণও ছিলেন না, ক্ষত্রিয় বা খুব সম্ভবত কায়স্থই ছিলেন। আপনারা হয়তো তাঁর বক্তৃতা পড়েছেন। আপনাদের ঠাকুরদারা তো শুনেও থাকবেন। এই শহরের সঙ্গে তাঁর সুগভীর সম্পর্কের কথা আপনাদের জানা। তৃতীয় দৃষ্টান্ত গান্ধী, যিনি জন্মেছিলেন এক বৈশ্য কুলে—এক গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে। তাঁর কৃতিত্বের কাহিনী আপনাদের কারুর অজানা নেই! তিনিও এখানে এসেছিলেন, আর এইখানে, এই জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, গীতা-ভাষ্য লেখবার জন্যেও তিনি এই জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এইসব মহামানবের প্রসঙ্গ তুলে ধরে জাতপাতের মতো পচা ব্যাপারকে টেনে আনা, এঁদের অপমান করার সামিল নয় কি? কিন্তু তবু কেন উল্লেখ করলাম, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি আপনাদের এমন কী-আর বলতে পারি, আপনাদের মতো প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের—তবু বলছি, ভারতীয় সমাজ ও তার সংস্কৃতি এখনও যে জীবিত রয়েছে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ

এটাই যে, প্রতিটি শ্রেণী, প্রতিটি জাতির মধ্যে থেকে একের পর এক তিন-তিনজন মহান আত্মা অতি নিকট অতীতে আপনাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। এবার আমি সেই চতুর্থ মহাপুরুষটির নাম করবো যিনি জন্মেছেন শূদ্র-সমাজে। এ নিছক কাকতালীয় ঘটনা বন্ধুগণ যে, ভারতের পুনর্জন্মের ঠিক এই মুহূর্তেই এহেন মহাপুরুষের বিলক্ষণ মেধার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নতুন ভারতবর্ষ গড়ার জন্যে যে প্রজাতন্ত্রকে আমরা স্বীকার করেছি, তার নতুন শাস্ত্র, তার সংবিধান রচনা করেছে কে? তার নির্মাণে আম্বেদকর সাহেবের ভূমিকার কথা আমাদের অজানা নয়। বন্ধুগণ, ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করুন! ইতিহাসবিধাতা এ কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, সেটা লক্ষ্য করুন! ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির মধ্যে থেকে, এখানকার মানব-ভূগোলের প্রতিটি স্তর থেকে একজন মহাপুরুষ উঠে আসছেন, আর তিনি গোটা ভারতবর্ষের মাথা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, অখিল ভারতীয় নেতা হয়ে উঠছেন! জাতপাত—বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড়ো আঘাত আর কী? আমার বন্ধুগণ, আমি বীরপূজা শেখাতে আসিনি। আমি এ কথা কখনই বলি না যে আপনারা মহাপুরুষের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকুন। শুধু বলতে চাইছি, আপনারা সেই মহান সমাজটি গড়ে তুলুন, যার কতিপয় সম্ভাবনা এইসব দৃষ্টান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শুধু সম্ভাবনা, বন্ধুগণ, শুধু একটা সংকেত মাত্র। এর বেশি দাবি আমি করবো না, সেটা মিথ্যে দাবি হবে, আত্মপ্রতারণা হবে। আমরা একটা মহান সমাজ হতে পারি, বন্ধুগণ। ইতিহাসের আকাঙক্ষাই এই। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাটা লক্ষ্য করলে তার লক্ষণ তো দেখতে পাই না। উল্টোটাই চোখে পড়ে। ক্বচিৎ মনে হয় আমরা না এগোচ্ছি, না ওপরে উঠছি। আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি ক্রমশ, আর পেছনের দিকেও সরে যাচ্ছি ক্রমশ। তবে কি আমরা এতই ক্ষুদ্র আর কৃতঘ্ন সমাজ যে আমাদের মধ্যে থেকে উৎপন্ন হওয়া এইসব মহাপুরুষের আমরা যোগ্য নই! আমি চাই, বন্ধুগণ, আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। এ আমার ব্যক্তিগত খামখেয়ালিপনাও হতে পারে। একটা ভিত্তিহীন আশংকাও হতে পারে।

বন্ধুগণ, বিবেকানন্দ কোনোখানে লিখেছেন যে এ-দেশে শুধু নয়, উপরন্তু গোটা দুনিয়ায় এবার শূদ্রদেরই শাসন কায়েম হবে এবং হওয়া উচিত। কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি? কলিযুগের আতঙ্কে ভয় ভেয়ে পুরাণে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তিনি কি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন? মোটেই না। বন্ধুগণ, তিনি এই সমাজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন। সমাজের পুনর্জীবনের কথা ভেবেছিলেন। পশ্চিমী চিন্তাবিদ্‌রাও আজকাল গণসাধারণের জিজীবিষার এই অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ দেখে বিহ্বল ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এক ভোগবাদী, সত্যাকামী সংস্কৃতির মধ্যে প্রাণতত্ত্বের এহেন বিস্ফোরণ দেখে—যাকে বলা হয়েছে 'রিভোল্ট অব দ্য মাসেস'—ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের

এই আহ্বান সব দিক থেকে মাঙ্গলিক মনে হয় না কি? প্রকৃতির এটাই নিয়ম। সবচেয়ে বেশি নিষ্পিষ্ট যে, সেই হয়ে ওঠে ত্রাণকর্তা। অন্যায় আর অসত্যকে সে-ই গভীরভাবে চেনে। তারই আত্মার ভেতরে গভীরতম মানবসত্যটি জন্ম নেয়। সেই সময়টা আজ আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। বন্ধুগণ! আর এই শুভ বার্তাটি বয়ে এনেছেন, আর-কেউ না, আপনাদের সেই অতি তুচ্ছ সেবক, যিনি ছিলেন গান্ধী নামে পরিচিত এবং যাঁকে আপনাদের মতো প্রবুদ্ধজনেরাও—বেজার মনেই সই—জাতির জনক বলে মেনে নিয়েছিলেন।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা! এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে আমি এতক্ষণ ধরে এই একটি কথা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, নিজের সন্দেশ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে ইতিহাস-দেবতা তিন-চারটি বর্ণের মধ্যে থেকে লাগাতার একের পর এক মহাপুরুষ উপহার দিয়েছেন, আপনারা সেটা প্রণিধান করার চেষ্টা করুন। আস্তিক্য চেতনাসম্পন্ন মানুষ এর মধ্যে ঈশ্বরের সংকেত লাভ করেন যদি, আমার তাতে আপত্তি নেই। ইদানিং ইতিহাস-চর্চার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পণ্ডিতপ্রবররা যেন একটা নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছেন, যা যুগ-ধর্মের অনুকূল। আমি সেই কথাটাই মাথায় রেখে এসব বলছিলাম। আমার ভাষার মায়াজালে বন্দী হওয়ার দরকার নেই, আমার যুক্তি যদি সঠিক বলে মনে হয় তবে সেটাই ধরুন আপনারা। দেখুন, এটা যদি এই শতকের ভারতবর্ষেই সংঘটিত হলো, তবে হলো কেন? আমার বিশ্বাস, এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে কোনো জাতি বা শ্রেণী বিশেষের শাসন এদেশে থাকবে না এবং থাকা উচিত নয়। এখন ভারতবর্ষের পুনরুত্থান যদি ঘটে, তা চল্লিশ কোটি জনগণের সম্মিলিত শক্তিতেই ঘটবে। এখন গোটা দেশ ও সমাজকে এক মন এক প্রাণ হয়ে নিজের সম্মিলিত জীবনী-শক্তি সপ্রমাণ করতে হবে। তবেই কাল পর্যন্ত যারা আমাদের ওপর শাসন করে এসেছে এবং আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই করে এসেছে—তাদের চাপানো দোষারোপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। অন্যথায় ইংরেজরাই নির্ভুল বলে প্রমাণিত হবে। কিংবা তাদের ঐ পদানুসারী রাজা-মহারাজ-জমিদার ও তাদের ঐ সাম্প্রদায়িক কাঠপুতুলেরাই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে যারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের খাতিরে তাদের পদলেহন করতো আর এ-কথা প্রচার করতে ক্লান্তি বোধ করতো না যে মহাত্মা গান্ধী গোটা ভারতবর্ষের কেন, গোটা হিন্দু সমাজের নেতা হতে পারেন নি। আমার প্রিয় বন্ধুগণ! ঐসব বিশ্বাসঘাতক আর মিথ্যেবাজ লোকেরাই নির্ভুল বলে প্রমাণিত হবে এবং আপনাদের জাতির জনক ভুল প্রমাণিত হবেন—যিনি ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি—সমগ্র দেশের একবাদ্বিতীয়ম্ কণ্ঠস্বর। বন্ধুগণ, একটু ভেবে দেখুন, আপনারা যদি সময়ের ডাক না শোনেন তবে আপনাদের সমাজ

ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো শত্রু যারা, তাদেরকে সঙ্গ দিতে হবে আপনাদের। আপনারা কি তা চাইবেন? (সমবেত 'না, কখনও না' ধ্বনি)...

তাহলে বন্ধুগণ! আপনারা যদি আমাদের নেতাদের অর্থসিদ্ধিকে ধুলিস্যাৎ করতে না চান, আপনাদের হাতে এই যে নতুন ক্ষমতা এসেছে, তাকে সঠিক ও বিবেকসম্পন্নভাবে কাজে লাগান। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। এ-কথা ঠিক যে রাজনীতিই শেষ কথা নয়। বহু মানুষ, বহু সংগঠন এর চেয়েও বেশি জরুরী কাজ করে চলেছেন এবং তাঁদের এ কর্তব্যও বটে। কিন্তু অন্যদিকে, বন্ধুগণ, আমি একটা ভয়ংকর বিপদের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাই। আমাদের দেশে 'বেল ফাটলে কাকের কী'—গোছের মানসিকতা চলে আসছে, সেটা এ-যুগে সাংঘাতিক বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আমরা যদি এখন থেকেই নির্বাচনের ব্যাপারে সিরিয়াস হতে না শিখি, তাহলে একদিন আসবে যখন সমাজের সবচেয়ে দুর্বৃত্ত লোকেরাই দেশের বিধায়ক আর মন্ত্রী ব'নে বসবে। তখন এই গণতান্ত্রিক রাজনীতি আপনাদের কুষ্ঠের মতো, ক্যান্সারের মতো গিলে ফেলবে। আপনাদের সংস্কৃতি, আপনাদের সমাজকেও গিলে ফেলবে। গণতন্ত্র আশির্বাদই নয় শুধু, একটা অভিশাপও। বন্ধুগণ! সময়ের চাহিদা মনে করে একে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু এতে দীক্ষিত হওয়া এখনও পর্যন্ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখনও এর ভালো আর খারাপ সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা গড়ে ওঠেনি।

অতএব, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে শুধু এটুকু প্রার্থনা করছি যে আপনারা এই নির্বাচন ব্যাপারটাকে সতর্কতা ও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন। এই প্রথম নির্বাচনেই আপনারা আপনাদের মধ্যে থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করে বিধানসভায় পাঠান, যিনি সত্যিকার অর্থে আপনাদের গণপ্রতিনিধি—যিনি আপনাদের সুখ-দুঃখ, আপনাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝেন এবং যাঁকে আপনারা সত্যিকারের শ্রদ্ধা করেন। বন্ধুগণ, আরেকটা কথা আমি আপনাদের বলে দিতে চাই, সেটা হলো, কংগ্রেসের সঙ্গে এমনিতো কোনরকম শত্রুতা নেই আমাদের। কংগ্রেসের মধ্যেও এমন নেতা অবশ্যই আছেন যাঁরা শ্রেণী ও জাতির উর্দ্ধে গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনারা জানেন যে ক'বছর আগে পর্যন্ত আমরা কংগ্রেসেরই অঙ্গ ছিলাম। তবে, আপনারা জানতে চাইবেন, আমাদের আলাদা দল গড়ার প্রয়োজন হলো কেন? বন্ধুগণ, কংগ্রেস যে গান্ধীর নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে এগিয়ে যেতে পারে, যা গান্ধীনীতির পরিপন্থী, তার সমূহ সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি আমরা। ঈশ্বর না করুন, বন্ধুগণ, কিন্তু একমুহূর্তের জন্যেও সেই কুক্ষণটির কথা ভাবুন দেখি যখন গান্ধীর দেহকেই শুধু নয়, তাঁর গোটা জীবনের কাজকর্ম, তাঁর চিন্তাভাবনাকেও খুন করা হবে এই অভাগা দেশে।

বন্ধুগণ, এই অশুভ কল্পনার জন্যে আমি আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা করছি,—কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হলে এ কল্পনা একান্ত জরুরী বলে মনে করি। সেই দিনটির কল্পনা করুন আর নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

অনন্তপুরের প্রিয় ও প্রবুদ্ধ নাগরিকবৃন্দ! বিস্মৃতি আমাদের জাতীয় স্বভাব। আমরা আমাদের এই সজীব ও প্রাণবন্ত বর্তমান ইতিহাসকে পুরাণে রূপান্তরিত করে অব্যাহতি পেতে পারি। কিন্তু ইতিহাস কারুকে করুণা করে না, আমাদেরকেও ছেড়ে কথা কইবে না। আপনারা হয়তো বলবেন, আমি নিজে গান্ধীবাদী হওয়া সত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট পার্টিতে এসে পড়লাম কেমন করে? বন্ধুগণ, আমার মনে হয়, আমরা গান্ধীর সংগ্রাম, তাঁর সাত্ত্বিক কঠোরতা, তাঁর যুযুৎসু আত্মার কথা বিস্মৃত হয়ে চলেছি। আমরা এটাও ভুলে যাচ্ছি যে এই দেশের ধর্মবল যদি একা রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের দ্বারা প্রমাণিত হতে পারতো, তাহলে গান্ধীর বাস্তবিক কোনো প্রয়োজন ছিল না। নিজেকে সত্য প্রমাণ করতে তাঁকে ইতিহাস ও রাজনীতির পাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল। গান্ধী ভালোভাবেই বুঝেছিলেন, যে-যুগে তিনি জন্মেছেন সেটা বুদ্ধ-যুগ নয়, হিটলার আর স্তালিনের যুগ সেটা। নিজের কালকে বুঝে নিতে কোনো ভুল করেন নি তিনি, আর এই কারণেই নিজের অনুগামীদের চেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন সেই সব তরুণদের ওপর কোনোরকম মতাদর্শের ছোঁয়া যাদেরকে বিভ্রান্ত করেনি। আমি বহুবছরের আত্মমন্থনের পর এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছি যে, গান্ধীবাদকে চলতে হবে সমাজবাদের সঙ্গে আর গান্ধীর কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে সমাজবাদকে নিজের স্বাধীন কর্তৃত্বের নির্বাহ করতে হবে।

এই দীর্ঘ ভূমিকা শোনার পর, আমার বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী ধরনের প্রত্যাশীকে আপনারা জয়যুক্ত করবেন। আমি আপনাদের মধ্যে থেকেই একজনকে খুঁজছিলাম, এবং যাঁকে আপনারা সবাই চেনেন। তিনি আপনাদের সমাজের সর্বনিম্ন ও সবচেয়ে শোষিত-নিপীড়িত-স্তর থেকে উঠে এসেছেন। কিন্তু তিনি মাত্র একটি স্তরের নন, গোটা সমাজের প্রতিনিধি। সাবর্ণদের বিরুদ্ধে নিচুবর্ণকে উসকে দেওয়ার সহজ উপায়টি যাঁর কখনও মনঃপূত হয়নি। তিনি ন্যায় ও সমানতায় বিশ্বাসী এবং তারজন্যে বরাবর লড়াই চালিয়ে এসেছেন। এবং সত্য ও অহিংসার আদর্শকে বজায় রেখে। তিনি সত্যিকারের গান্ধীবাদী, সুতরাং সত্যিকারের সমাজবাদীও।

'কিন্তু ভাইসব, আপনাদের এই প্রতিনিধি ও সেবক রাজনীতিতে আসার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত। রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকে তিনি আপনাদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চান। তিনি আমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভোটে দাঁড়ানো গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচীর অঙ্গ নয়। বন্ধুগণ, এ-ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু যে বিপদের কথা আমি এইমাত্র আপনাদের বললাম, সেটা মাথায় রেখে

আমার মনে হচ্ছে এখন 'বাবা বলেছে কেষ্ট'-গোছের কথা দিয়ে কোনও কাজ হবার নয়। আমাদের গান্ধীকে একদিকে যেমন তাঁর হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সেইসব অনুরাগীদের হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে, নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা তাঁকে একটি জড়মূর্তিতে রূপান্তরিত করে ফেলতে চান। বন্ধুগণ, এহেন বিপদ সত্যিসত্যিই দেখতে পাচ্ছি আমি এবং আমার কামনা, আপনারাও দেখুন। আমি আপনাদের বলবো, বিধানসভার জন্যে নারায়ণরাম টাম্‌টার চেয়ে যোগ্য পাত্র আর কেউ নেই। নিজেদের তরফ থেকে আমরা তাঁকে আমাদের পার্টির প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছি, এবার আপনারা যদি তাঁকে রাজি করাতে পারেন—তাহলে আমরা দেখিয়ে দেবো যে এ-দেশের রাজনীতিতে নিছক ধনাঢ্যতা, নিছক নেতাগিরির লালসা, নিছক সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে বিরাট ক্ষতিপূরণ আদায় করার ল্যালঠামোর কোন দাম নেই। এর চেয়ে শুভ আর-কিছু হতে পারে না বন্ধুগণ! আপনারা যদি তাঁকে রাজি করিয়ে নিতে পারেন তবে আপনাদের এই শহর, গোটা প্রদেশে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এমনি নিষ্কাম কর্মযোগীর অন্বেষণ করবে এবং তাঁদেরকেই প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। আপনারা তাঁকে রাজি করান শুধু, তারপর আপনারা স্বয়ং দেখতে পাবেন কোনো সুযোগ-সুবিধে আর ঢোলশোহরত বিনাই আমরা এই অঞ্চলের জনগণের হাত দিয়ে আমাদের অর্থাৎ আপনাদের নারায়ণকে বিজয় মুকুট পরিয়েই ছাড়বো। (করতালি)

...বন্ধুগণ! আপনাদের করতালির করকাপাতই জানাচ্ছে, আপনাদের মন কী চায়! আমরা নির্বাচনের হার-জিতকে প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দিই না। আমরা মোকাবিলা করে দেখতে চাই ঃ একাধিপত্যের বিপদকে, ক্ষুদ্র-স্বার্থের গণিতকে এবং ভড়কানি-দেওয়া ভ্রান্তিসমূহকে দেখতে চাই। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে আমাদের জনগণ যথেষ্ট জাগরুক। তাঁদের প্রতিনিধি কে হবেন, সেটা তাঁরা ভালো করেই জানেন। তাঁরা এখন আর রাজা-রাজড়া, বিত্তবান, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত লোকের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁরা তাঁকেই বরণ করেন যিনি সত্যিকারের যোগ্য। সম্যক যোগ্যতা রয়েছে যাঁর এবং সেই যোগ্যতা যাঁর স্বোপার্জিত, বাইরে থেকে প্রত্যর্পিত নয়।

বন্ধুগণ! আমাদের সহায়সম্বলহীনতার কথা আপনারা অবগত আছেন। কংগ্রেসের কাছে যথেষ্ট সুযোগসুবিধে রয়েছে, বড়ো-বড়ো ত্যাগ আর আত্মত্যাগের কাহিনী রয়েছে। আমাদের কাছে কিছুই নেই। হয়তো আমরা হেরে যাবো। কিন্তু আমাদের পরাজয়ও তাদের জয়ের চাইতে অনেক বেশি গৌরবশালী হবে। আশা করি আমার এ-কথার তাৎপর্য আপনারা অনুধাবন করতে পারছেন—এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! এবার আমাকে আপনারা বিদায় দিন। আমি আপনাদের অনেক

মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেললাম। যে ধৈর্য ও মনোযোগ দিয়ে আপনারা আমার এতোসব উল্টোপাল্টা কথা এতক্ষণ ধরে শুনলেন, তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে সর্বান্তকরণে কৃতজ্ঞ। আপনাদের আরও একবার অভিনন্দন জানাই। জয়হিন্দ!'

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! এদিকে বক্তৃতা-শেষে সোশ্যালিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ, বালেশ্বরজী জিন্দাবাদের স্লোগান শুরু হলো, ওদিকে জনগণের মধ্যে থেকে চেঁচামেচি শুরু হলো, নারায়ণরাম টাম্‌টাকে মাইকে ডাকা হোক।

শ্রোতাদের মধ্যে মা আর রামকাকার সঙ্গে কুন্দনও বসে ছিল। সে দেখল, মঞ্চের ওপরে বাবাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয়েছে, কিন্তু বাবা নড়বার পাত্র নন। বারবার হাতজোড় করছেন। বাবার ওপর ওর ভীষণ রাগ হলো। যেন শূলে চড়াচ্ছে কেউ!... কেমন করছেন!... ওর নিজের বুকটাও একই সঙ্গে হঠাৎ একটু বেশিই ধকধক করা শুরু করে দিল। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কথা না বেরয় মুখ দিয়ে? এতগুলো লোকের সামনে মিছিমিছি মাথা কাটা যাবে।

রামকাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো—উনি এখন পুলকানন্দে বিভোর। যেন কিছুই দেখছেন না, কিছুই শুনছেন না। মায়ের অবস্থাও এমন-কিছু ভালো ঠেকছে না।

হঠাৎ চোখে পড়লো, দু'হাতে জনসমুদ্র ঠেলতে-ঠেলতে ভবাকাকা সোজা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কুন্দনের চোখের সামনে সেদিনের সেই বিকেলের দৃশ্যটা ভেসে উঠল, যেদিন বাবা বাল্মীক টোলায় ভবাকাকা আর ক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে ঢালের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।... তাহলে এখন...ভবা ভাষণ দেবেন নাকি?

সত্যি। ভবাকাকা সত্যিসত্যিই মাইকের দিকে এগিয়ে আসছেন...মাইকে ওঁর নাম ডাকা হচ্ছে...'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন, এখন আপনাদের শহরের একজন প্রবীণ নাগরিক—বাল্মীক টোলার ভবাদা—আপনাদের কিছু বলতে চান...'

'আমার বোন ও ভাইয়েরা,

...আমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতা মহোদয় আমাদের পাটোয়ার মশায় সম্পর্কে এতক্ষণ যে সমস্ত কথা বললেন, আপনারা সবাই তা শুনেছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা যেন ওনাকে ধরে-বেঁধে রাজি করিয়ে নিই। এ আমাদের কর্তব্য...লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন! আমি পাটোয়ার মশাইকে ছোটবেলা থেকে চিনি। আমি ওঁর তুলনায় খুবই নগণ্য, উনি যে কতো বড়ো মাপের মানুষ আপনাদের তা অজানা নয়। আমাদের পাটোয়ার মশায়ের মনে নেতা হওয়ার কোনও বাসনা নেই। ওনার বক্তৃতা করারও ইচ্ছে নেই। আমারও নেই। আমি আপনাদের সকলের তরফ থেকে ওঁর কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি, উনি যেন আমাদের নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন। ওনাকে বাদ দিয়ে আমাদের কাজ চলতে পারে না। ওঁর ওপর আমাদের খানিকটা অধিকারও রয়েছে। উনি এখানে আসুন, আমরা ওঁর কথা শুনতে চাই।

উনি রাজি হচ্ছেন না কেন, সেটা আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন। তারপর আমরাও ওনাকে বোঝাবো। ভাই-বোনেরা, আমি আপনাদের অনুমতিক্রমে পাটোয়ার মশায়কে নিয়ে আসছি।...'

ভবাকাকা বাবার সামনে করজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাইকের সামনে আসার জন্যে অনুনয়-বিনয় শুরু করলেন। এমন সময় কোত্থেকে লালাজীও এসে টপকালেন। বাবার একটা হাত ভবাকাকার মুঠিতে, অন্যটা লালাজীর। ওরা দু'জনে ধরাধরি করে বাবাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে মুহূর্মুহ হাততালি ধ্বনিত হয়ে ওঠে।...ভবা চিৎকার করে বলে ওঠেন,...'আমাদের নেতা!... একটু জোরগলায় বলুন, আমাদের নেতা!'...

'জিন্দাবাদ!'

'আমাদের নেতা!'

'জিন্দাবাদ!'

'নারায়ণদা!'

'জিন্দাবাদ!'

কুন্দনের বুকের ধুকপুকানি অসম্ভব দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে। বাবা বলতে পারবেন তো?.. দেখে তো মনে হচ্ছে ওঁর মাথা ঘুরছে। পড়ে না গেলে হয়...

'শ্রদ্ধেয় বালেশ্বরজী, প্রিয় নগরবাসী বন্ধুগণ!

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে আপনাদের কী বলবো। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার সম্পর্কে আপনাদের কোথাও একটা ভয়ানক ভুল হচ্ছে। আমার অবস্থাটা বড়ো বিচিত্র, আমার ভাইসব!...বিশ্বাস করুন, আপনাদের ভালোবাসার এই জোরজুলুম আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, আমাকে মূক করে দিয়েছে। জীবনে এই প্রথম মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই কেমন অচেনা ঠেকছে! মনে হচ্ছে, এ কে? এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এ কে, যাকে ঘিরে এই শহরের জনগণের এতো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে?... এ কখনও এসবের যোগ্য তো ছিল না!...'

'আহাম্মক!'... কুন্দন পেছন থেকে, রামকাকার চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'উজবুকের মতো এসব কী বলছে, বৌঠান?...'

'আমি তো বাড়ি চললাম।' মা উঠে পড়লেন। হনহন করে এগিয়ে গেলেন। রামকাকা মাকে দেখিয়ে কুন্দনকে বললেন, 'যা, তুইও সঙ্গে চলে যা।' কুন্দন কিন্তু নড়ে না। তেমনি বসে থাকে। এ তুমি কিন্তু ভালো করলে না মা! বাবার যদি চোখে পড়ে থাকে? তবে?...উনি তো নার্ভাস হয়ে পড়বেন!

'...আমার নাগরিক বন্ধুগণ! আপনারা বালেশ্বর মশাইকে জানেন না, আমি জানি। তাঁকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ-দেশে যে-ক'জন বিদগ্ধ নেতা এখনও

রয়ে গেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। বাপুর স্বপ্নের রামরাজ্যকে যাঁরা বাস্তবে রূপ দিতে চান, সেই মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি একজন। নামমাত্র জেল বেড়িয়ে এসে কেউ স্বাধীনতা-সেনানী হয়ে যায় না, ভাইসব। কিন্তু তেমনি লক্ষ-লক্ষ মানুষ রয়েছেন, এবং আমি তাঁদেরই দলে। আমি এই দেশের কোটি-কোটি মূক-বধির জনতার একটি কণা মাত্র। নেতা হওয়ার জন্যে যে-সব গুণের প্রয়োজন, তা আমার মধ্যে আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও আয়ত্ব করতে পারবো বলে মনে হয় না। আমার ছোটোবেলাকার বন্ধু ভবা ভালো করে জানে, আমার এলেম কতটুকু। নিজের মাথার চেয়ে নিজেকে উঁচু ভাবতে আমার ভয় করে, লজ্জা অনুভব করি। এই যে একটা রাজনৈতিক লীলা...নির্বাচন, সংসদ, বিধানসভা, এ-পার্টি সে-পার্টি, এসব আমার বোধগম্যির বাইরে। এখন নতুন করে এসব শেখার মতো বুদ্ধিও আমার নেই, অভিলাষাও নেই। খুব অল্প—একেবারে বুনিয়াদি ধরনের কথা আমার মাথায় ঢোকে—যেসব কথা আগেকার দিনে বলা হতো, এখন হয় না। আমি বন্ধুগণ, ঐ জমানার লোক।... আমার ধারণা, সময়ের দিক থেকে আমি দারুণ ভাবে পিছিয়ে পড়েছি আর এই পরিবেশে আমি একেবারেই বেমানান। এরকম লোককে নির্বাচন করে আপনাদের কী লাভ? এ শহরে শিক্ষিত ও গুণী লোকের আকাল কখনই ছিল না, ...বালেশ্বর মশায় আপনাদেরকে জানিয়েছেন, গান্ধীজিও তারুণ্য ও সবুজের প্রতি উন্মুখ ছিলেন। নিজের অনুচারিদের চেয়ে তরুণদের ওপরই তাঁর ভরসা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। এই সোশ্যালিস্ট পার্টিরও জন্ম ঘটেছে ঐসব টগবগে তরুণদের মুখ চেয়ে। আমার মতো বুড়ো আর পিছিয়ে-পড়া লোকেদের জন্যে নয়।'

বাবা হঠাৎ থেমে গেলেন কেন? ওঁর কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?... এতসব ফালতু কথা বলার কি দরকার ছিল? এর চেয়ে ভালো-ভালো কথা তো কাল বাড়িতে বসে বলছিলেন। ...কুন্দন রামকাকার দিকে তাকায়। উনি কি কান্না চাপবার চেষ্টা করছেন? ওঁর চোখ দুটোও যেন কিঞ্চিৎ আরক্ত! মুখে কষ্টের অভিব্যক্তি, চোখের কোণ বেয়ে বেসামাল অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে।... এ আবার কেমনতরো প্রহসন!

'...নিজের যৌবনের, ছেলেমানুষীর দিনগুলো মনে পড়ছে আমার, আমি যখন পাটোয়ারির চাকরিটা ছাড়ি। পড়াশোনায় আমার মন ছিল না...দীন-দুনিয়াকে চেনার দিকে মন পড়েছিল...সুতরাং আমাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হলো, পাটোয়ার বানিয়ে দেওয়া হলো আর আমাকে জানানো হলো তোমার জীবনের ষোলো কলা পূর্ণ হলো। তুমি লাটসাহেব ব'নে গেলে। বিয়াল্লিশের সেই রক্তঝরা দিনগুলো এলো, গোটা দেশ জ্বলছে দাউ-দাউ করে, দেশজুড়ে চলছে মারণ তাণ্ডব... আমি তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠি যারা পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।... তারপর একদিন সহসা আমারা নিদ্রাভঙ্গ হলো। কিভাবে হলো, কেন হলো—

সেটা এখানে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি না,—আর আমি নিজেকে বললাম, নারায়ণ, তুই মানুষ না কুকুর?...আমি ইস্তফা দিলাম আর বাইরে মুক্ত বাতাসে দম নিয়ে বাঁচলাম। আমার নগরবাসী কাকা, ঠাকুরদা, ভাই, বোনেরা! তারপর সেই যে স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকার নেশায় পেলো আমাকে, সেই নেশা এখনও কাটেনি। এই নেশা নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমাকে জুতোর বাড়ি মারা হতো, নোংরা গালমন্দ করা হতো... কিন্তু আমার কিছুতেই কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না, আমার আত্মা সর্বক্ষণ ডানা মেলে আকাশে বিচরণ করে বেড়াতো। জানি না এই কুকুরের মধ্যে হাতির মদমত্ততা ভরে দিয়েছিল কে! জানি না আমাকে সঞ্জীবনী বুটি খাইয়ে দিয়েছিল কে!

তারপর, বন্ধুগণ, এলো স্বাধীনতা। কিছু-একটা করার চিন্তা আমারও মাথায় এলো। জেলে থাকাকালীন বাপুকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তাতে নিজের সম্পর্কে দু-চার কথা লিখে কী আমার করণীয় তা জানতে চেয়েছিলাম। দু-লাইনের ছোটো একটা চিঠি তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, যেটা আমার জীবনের সবচেয়ে অমূল্য নিধি। তিনি লিখেছিলেন, 'তুমি যেখানে আছো, সেখানে থেকেই আর্তের সেবায় লেগে পড়ো, তাদের মধ্যে সাহস জাগিয়ে তোলো, তাদেরকে ভয়মুক্ত করো, তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে শেখাও। আর যদি সম্ভব হয়, তাদের ছেলেমেয়েদের বেসিক শিক্ষার জন্যে যেটুকু করতে পারো, করো। ব্যস্। বাপুর আশির্বাদ তোমার সঙ্গে রইলো।...'

বলতে-বলতে বাবার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, তিনি চোখ মোছেন। কুন্দনের বেশ লজ্জা-লজ্জা করছে। এসব কথা তো সে নিজেও শোনে নি কখনও। বাড়ির লোকেদেরও কখনও বলেন না, পাবলিকের সামনে বলার কী দরকার ছিল? ...এতগুলো লোক কী ভাবছে! ছি ছি!

...'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাপুকে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা রক্ষা করতে পারিনি। আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো জানেন—আমার পাড়পড়শি আর আশেপাশের লোকেরা অন্তত জানেন যে, সত্যিকারের সেবা করে থাকলে লোকে আমাকে আপন করে নিতই। কিন্তু আমার মধ্যে খুঁত রয়েছে, যে-কারণে আমাকে তারা মেনে নেয়নি। নিজের তরফ থেকে আমি চেষ্টার কসুর করিনি—আবর্জনা পরিষ্কার করেছি, চরকা-অভিযান চালিয়ে দীন-হীন মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। বুনিয়াদি তালিমের ইস্কুল খুলেছি, একটা কাগজ বের করে সমাজের মৌলিক দোষত্রুটির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সাফল্য আমার ভাগ্যে ছিল না, তাই জোটেনি। আমাকে আজ আক্ষেপ করে বলতে হচ্ছে যে, আমার নিজের লোকদের কাছ থেকে—এমন কি আমার স্বজাতিদের কাছ থেকেও—ব্যঙ্গ আর উপহাস ছাড়া এখনও কিছু জোটেনি আমার। আমার নিজের

মধ্যেই কোনকিছুর অভাব থেকে গেছে হয়তো। কিন্তু কেন জানি না আমার এই ধারণা বদ্ধকর হয়ে গেছে যে রাতারাতি হঠাৎ যুগ পাল্টে গেছে আর আমি হয়ে পড়েছি অবান্তর, বেকার হয়ে গেছি আমি। এই ছোট্ট শহর থেকে চারটে খবরের কাগজ বের হয়, এক-একটি জাতির এক-একটি কাগজ। মনে কষ্ট পাই, যখন দেখি খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত দাসত্ব আর বিভেদকেই প্ররোচিত করছে। আমি এমন একটা কাগজ বের করার কথা ভেবেছি যা এই জাতপাতের প্রয়োজনটাকেই শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দেবে আর সবাইকে নিয়ে আসবে এক মঞ্চে। আমি কি ভুল ভেবেছি, নাকি ভুল করেছি? গত দু'বছর ধরে আমি আত্মমন্থন করেছি, নিজের ভুলভ্রান্তিগুলো পরখ করে দেখেছি। আমার নিজের মধ্যেই দুর্বলতা ছিল। আমার মধ্যে নিরাসক্ত আর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কাজ করার ক্ষমতা ছিল না—আর এই অক্ষমতার দণ্ডই আমি ভোগ করেছি।

আমার ভাই ও গুরুজনেরা আমাকে ক্ষমা করবেন। নিজের মনের কথা আমি খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দিলাম আপনাদের। যা আমার ক্ষমতার আওতায় ছিল, যে-কাজ আমি করতে পারতাম তাই যখন করতে পারিনি, তখন এই নতুন গুরুদায়িত্বের বোঝা বহন করবো কি করে? সত্যি বলছি, নিজেকে এর যোগ্য বলে আমি মনে করি না। আমি বালেশ্বরজীর কথা অমান্য করছি না, আশা করি উনি আমার মনের ব্যথা বুঝবেন। আমি রাজনীতির মূল্য বুঝি, তাকে ঘৃণা করবো কেমন করে? কিন্তু রাজনীতিতে যেতে গেলে যে মনের জোর লাগে, যে তাজা শক্তির দরকার, তা আমি আনবো কোত্থেকে? গত তিন-চার দিন ধরে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছি—নারায়ণ, তোর মধ্যে সত্যিকারের সেই সামর্থ্য আছে কি যে তুই বিধায়ক হয়ে নিজের লোকদের সেবা করতে পারবি বলে ভাবছিস, যা তুই আট বছরে করতে পারিস নি? এতে কি তুই শান্তি খুঁজে পাবি? আনন্দ লাভ করবি? ভাইসব, আমার অন্তরাত্মা এতে সায় দিচ্ছে না একেবারেই। আমার কথা শুনে আপনারা হয়তো হাসছেন। ক'দিন ধরে আমি তো নিজেকে দেখেই হাসছি। নিজেকে দেখে কাঁদছি। এমন পাগলের ওপর আপনারা ভরসা করতে যাবেন কোন দুঃখে? কেন করবেন? আমি বালেশ্বর মশায়কে, আপনাদের সকলকে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছি—আপনারা আমাকে মাফ করুন। আমি সত্যিকথা বলতে চাই। নিজের ব্যাপারে কাউকে ধোঁকায় রাখতে চাই না। সমবেত বিদ্বৎমণ্ডলী, আমার তরুণ ও নিষ্পাপ বন্ধুগণ! এর বেশি বলার মতো আমার কাছে আর কিছুই নেই। উল্টোপাল্টা কিছু যদি বলে থাকি, আমার বিশ্বাস, আপনারা উদারচিত্তে এই সেবককে ক্ষমা করে দেবেন। জয়হিন্দ!'

সব মাটি হয়ে গেল

'চল্ ওঠ্'—রামদত্ত মাস্টার ওর হাত ধরে টান মারলেন, 'তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

কুন্দন, কাঠের কুন্দন, এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালো। ওর মুখ দিয়ে বেরলো, 'আর বাবা?' কিন্তু রামদত্ত মাস্টার কিছু শোনেন না, বলেনও না কিছু, কুন্দনকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলেন শুধু। কুন্দন পেছনে ঘুরে দেখতে গেল। কিন্তু রামদত্ত মাস্টারের হাতের মুঠোয় এমন-কিছু আছে যা ওকে পেছন ঘুরতে দিল না। ও কি যেন বলতে চাইলো, কিন্তু রামদত্ত মাস্টারের ঐ তূষ্ণীভাব ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিলো সহসা। ওর নিজের জিবও যেন অসাড় হয়ে পড়েছে। ওর এসব কী হচ্ছে!

মাঠ ছাড়িয়েই বাজার। বাজারে ভিড়ভাড় যথেষ্ট, তবু কুন্দনের কেন-জানি মনে হলো, একজন মানুষও নেই, সবাই ভূত ব'নে গেছে। ওরা ঘোরা-ফেরা করছে। নির্জীব কাঠের পুতুল এক-একটি!!!... তাদের কণ্ঠস্বরও ভেসে আসছে যেন অনেক দূর থেকে। কিছুক্ষণ আগেও তো ও এই বাজারের ভেতর দিয়ে পেরিয়েছিল! কে-জানে বাবা কখন আসবেন! এখন তো লোকজন ঘিরে রয়েছেন।... ওকেই খুঁজছেন না তো? ওকে আর রামকাকাকে? ছি ছি, কী ভাবছেন বাবা!... কেমন লাগছে ওঁর!

'তোর বাপকে বলবি, আমাকে আর নিজের মুখ দেখাবার দরকার নেই। বুঝেছিস?'...

কুন্দন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলো, দেখলো বাজারের মাঝ-বরাবর ডুমৌড়া-গামী অন্ধকার গলিটার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ও। পরক্ষণেই নিজের দু-হাত দিয়ে একটা কঠিন হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ও, যা কখন ও কিভাবে ওর অজ্ঞাতেই আলগা হয়ে গিয়েছিল! এ নিশ্চয়ই সেই হাতটি।

'শুনলি, কী বললাম তোকে?'

কুন্দন গলির ভেতরে পা বাড়ালো। সঙ্গে-সঙ্গে রামদত্ত মাস্টার ওকে একটা হ্যাঁচড়া টান মারলেন। 'বাড়ি চলো রামকাকা। আমি একা যাবো না। আমার ভয় করছে।'

'দূর পাগলা, এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?'

দুজনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। পরস্পরের মুখও ওরা দেখতে পায় না ভালো করে। কিন্তু কুন্দন এতে একটু স্বস্তি পেলো...মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো রামকাকার সঙ্গে নয়, বাবার সঙ্গে ফিরছে...রামকাকার পর্ণকুটির থেকে।...পরক্ষণে মনে হলো—

ধুস্, এই তো রামকাকার হাত ওর হাতের মধ্যে ধরা, আর ক'মুহূর্ত পরেই যেটা আলগা হয়ে পড়বে।

'বলো হরি হরিবোল!'...

গলির শেষ মাথায় এসে ওরা থমকে দাঁড়ালো। একটা মড়া পেরোচ্ছে, সেটা পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করে। 'আবার কে মরলো!' রামকাকা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন। কুন্দনের হাতে ওঁর হাতের চাপ পড়ে। তিনি শক্ত করে ধরেন হাতটা। তবে কি এখন রামকাকাও ভয় পাচ্ছেন? কুন্দনের আর ভয় করছে না। কতক্ষণই বা করবে। সড়কটাই তো শ্মশানঘাট যাওয়ার। দিন হোক বা রাত হোক, সবসময়ই এই 'বোল্' শোনা যায় এখানে। কতো লোক মরে এই ছোট্ট মফস্বলেও।... তবু মফস্বল যেমনকার তেমনি আছে।

'তোরা এখানে বাস করিস কী করে?' রামকাকার এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর এসে ঢোকে ওর কানে। কুন্দনের অবাক লাগে, এও একটা প্রশ্ন হলো! কুন্দনের চোখের সামনে রামকাকার পর্ণকুটির ভেসে উঠলো, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাগীরথী। ইস্, ওদের বাড়িটাও যদি এর কাছাকাছি থাকতো!

'তুই যে চুপ মেরে গেলি কুন্দন! ভয় করছে?'

ভয় তো তুমিই পাচ্ছো রামকাকা—কুন্দন মনে-মনে বললো। 'এ তো রোজকার ব্যাপার। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'অভ্যেস!' রামদত্ত মাস্টার হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। কুন্দনের দিকে ভালো করে দেখেন। অন্ধকার সড়কে কি দেখতে পাচ্ছেন উনি?

'তোদের বাড়িটাই যে ভুলে গেছি আমি। এখানে একটা বাতিও নেই। কেমন গাঢ় অন্ধকার, দেখেছিস!'

'বাতি ছিল রামকাকা, বাবা লাগিয়েছিল। একটা নয়, তিন-তিনটে। কিন্তু কে-জানে কী হয়! মিউনিসি-প্যালিটির লোকেরা এসে মাঝেমধ্যেই খুলে নিয়ে চলে যায়। কেউ কিছু বলে না। বাবা জ্যোলিকোট যাবার পর থেকেই এই হাল।'...

কুন্দনের বাড়ি এসে পড়েছিল। 'মা' বলে ডাকলো ও। মা তো সূর্যাস্তের সময়েই সন্ধ্যাবাতি করে ফেলেন, আজ এতো অন্ধকার কেন? বাড়িতে নেই নাকি?

'আসছি রে, ওখানেই দাঁড়া...' মা-র গলা যেন কতো দূর থেকে ভেসে এলো।

ওরা দুজনে অন্ধকারে অমনি দাঁড়িয়ে রইলো। সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, আর সিঁড়ির ওপরে হ্যারিকেন-সহ একটি আকৃতি। আজ কুন্দনের ভাই আর বোনও এখানে নেই। মামাবাড়ি গেছে কাল থেকেই।

কুন্দন আর রামকাকা সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। রামকাকাকে দেখে মা থতমত খেয়ে যান। 'আরে!' ওঁর মুখ দিয়ে বেরলো।

'অন্ধকারে বসে রয়েছো কেন বউদি? বেচারি কুন্দনের ভয় করছিল, বললাম,

চল্‌ তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। ...ঠিক আছে, এবার চলি। বাড়িতে ভাগী একা রয়েছে।'...

মা যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন। 'একটু চা খেয়ে যাও। এর বাবাকে ছেড়ে এলে কোথায়?'

জবাবে রামদত্ত মাস্টার কিছু বলেন না, কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে এমনি চেয়ে থাকেন, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত-ধরনের ঘরঘরানি আওয়াজও সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল...

'সব মাটি হয়ে গেল বৌঠান। সব মাটি হয়ে গেল।'

চাঁড়ালেরা সব মাতম কর্‌!

'স্বর্গ আর নরক'—আমার বন্ধু আর্থার বলতো, 'না কেতাবি ব্যাপার, না ধার্মিক। স্বর্গ আর নরক তো ভায়া, অভিজ্ঞতার নির্যাস। আমাকে দেখে কে বলবে যে স্বর্গ আর নরক, দুই দেখেছি আমি, তাও মাস কয়েকের মধ্যে!...'

আর্থারের কথাটা আজ হঠাৎ মনে পড়লো কেন? আর্থার কথাটা বলেছিল গ্রীটার সামনে। যে স্বর্গ আর নরকের কথা সে বলেছিল, গ্রীটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল কি? আমি এলিসের সামনে আর্থারকে ঠিক এইভাবে কথাটা বলতে পারতাম? না। অথচ সেক্ষেত্রে কথাটা কেমন অবিকল মিলে যেত। এলিসের সঙ্গে আমিও স্বর্গ ও নরক দুই ভোগ করেছি বলেই কি?

অবশ্যি, এক দিনে নয়। এলিসের সঙ্গে যখন বাস করেছি, তখন হয় স্বর্গসুখ ছিল, নয় নরকযন্ত্রণা। স্বর্গ যতদিন ছিল ততদিন নরক ছিল না, আবার নরক যখন এলো তখন স্বর্গ হাপিস। এই মুহূর্তে তবে আছে কী? এখন না স্বর্গ আছে, না নরক। একটা অনাবাদি রিক্ত মালভূমি পড়ে আছে মাত্র, যা দু-দিক থেকেই সংরক্ষিত। এলিস সঙ্গে থাকতে-থাকতেই ঊষরতার সূচনা ঘটেছিল। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বুঝি একটা সীমা থাকে, সেটা ছাড়িয়ে গেলে নরকভোগের যন্ত্রণা থেকেও বঞ্চিত হতে হয় তাকে।

আপাতত এলিসের কথা বলছি না আমি। এলিসের কথা বলা আমার পক্ষে যে সহজ নয়, সেটা আশা করি আপনি বুঝে ফেলেছেন। আমি সেই দিনটির কথা বলছি, দিনকতক ধরে যা অনুক্ষণ আমার স্মৃতির চারপাশে ঘুরে-ফিরে মরছে—বেশ কয়েক বছর আগেকার সেই উজ্জ্বলতম ও কৃষ্ণতম দিনটির কথা, যার প্রোৎসাদন এ জীবনে সম্ভবত আর ঘটবে না। আমাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে তবেই লোপাপত্তি

ঘটবে তার। কী অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখুন, যে-নরক থেকে সদ্য বেরিয়ে এলাম—বরং বলা যায়, এখনও যুঝে চলেছি—সেটা এইমুহূর্তে বহুযুগ আগে সংঘটিত গল্প বলে মনে হচ্ছে। যেন আমার জীবনে নয়, অন্য আর-কোনো লোকের জীবনে ঘটেছে সেটা! আর বহুবছর, থুড়ি, বহুযুগ আগের সেই ফেলে-আসা দিনটি এমন পেয়ে বসেছে আমাকে, যেন সেই দিনটিই ফিরে এসেছে আমার জীবনে। আমি যেন রয়ে গেছি সেখানেই, আর মাঝখানের এতগুলো বছর নিছক স্বপ্ন, অন্য কোনো লোকের স্বপ্ন।... তাহলে, এই আমি লোকটা কে? এতসব লিখে মরছে যে?

আমি সে-ই—কুন্দন টাম্টা—নীলকণ্ঠেশ্বরের মাঠে বসে বালেশ্বরজীর বক্তৃতা শুনছে যে। ভবার ভাষণ শুনছে...। তারপর নিজের বাবাকে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দেখছে আর শুনছে...

আর...রামকাকার মুখটা রাগে দপ্‌দপ্ করছে। রামকাকার চোখ উপচে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা।

আর, আমি একটা কাঠের পুতুল যেন! রামকাকা হ্যাঁচকা টান মেরে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাকে। টানতে-টানতে একটা সরু গলির মধ্যে নিয়ে গেলেন আমাকে। অন্ধকারে ঢাকা ভুতুড়ে গহ্বর একটা, যা আমাকে গিলে ফেলতে উদ্যত।...আমার ভয় করছে রামকাকা...!

রামকাকার হাতটা আমি শক্ত করে ধরে রেখেছি। আমরা গলি পেরোচ্ছি।...'বল হরি হরি বোল!'

'তোরা এখানে থাকিস কি করে?' রামকাকার গলাটা কেমন অচেনা লাগে! একটা ভয়াতুর কণ্ঠস্বর...রাতের ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত ডুমৌড়ার সড়কে ..ডুমৌড়ার জর্জরপ্রায় বাড়িগুলোর দ্বারা পরিবৃত...।

নৈঃশব্দ সহসা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে যেন! সেই নিঝুম অন্ধকারে ঢাকা একটা দোতলা দালানের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে ডাকি : 'মা! মা!'

অন্ধকারে মাকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। সমস্তকিছু গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। দুজনে নিজের বাড়ির দরজার কাছে ভয়ক্লিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি কেন, পরস্পরের মুখোমুখি?

'সব মাটি হয়ে গেল বৌঠান!...' সেই ভয়বিহ্বল কণ্ঠস্বরটিও এখন কোথায় হাপিস? এখন কোনো সাড়াশব্দ নেই; না কুন্দন, না ওর মা, কারোর মুখেই শব্দ সরছে না। এ কোন্ অভিশপ্ত দিন— কুন্দন ভাবে—এ কোন্ অভিশপ্ত রাত! যেদিন বাড়িতে উনুন পর্যন্ত ধরেনি!

'সকালের রুটি রাখা আছে, খেয়ে নে।'

'না মা, আমার একদম খিদে নেই।' আর মা পুনরায় কিছু বলেন না।

বিছানায় গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে কুন্দন। বাবা এখনও পর্যন্ত ফিরলেন না কেন? ভালো হয়, এখন যদি না আসেন। কাল সকালে এলেই ভালো। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যখন চতুর্দিক, সমস্ত মানুষ জেগে উঠবে, সড়কগুলো সচল হয়ে উঠবে, বাজারে ছুটোছুটি-হুড়োহুড়ি শুরু হবে। রাতের অন্ধকারে বানচাল সমস্ত-কিছু পুনরায় নিজস্ব চেহারায় ফিরে আসার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে যখন। তখন এলেই ভালো। ...আজকের রাতটা একটু অন্যরকম যেন, এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা রাত আগে কখনও দেখেছে কুন্দন? লোমঅলা বিশালদেহী এক কালো বেড়াল যেন! অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আর গা ছমছমে ভাব চারদিকে! বাবা এখন এসে পড়লে জানি-না কী ঘটবে! উনি মাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন হয়তো। মা আরও ক্ষেপে যাবেন। কান্নাকাটি জুড়ে দেবেন, চেঁচামেচি শুরু করবেন, আরও না-জানি কত-কী করে বসবেন।...বাবাও যদি চিৎকার শুরু করে দেন? বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান যদি?...কতরকমের অশুভ চিন্তা মাথার মধ্যে ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে!

দূরে গির্জার ঘণ্টা বাজছে। আধঘুমে বাবার চপ্পলের শব্দ শুনতে পেল কুন্দন। দরজায় কড়া নাড়ার আগেই নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলে দিল সে।

'কী রে, এখনও ঘুমোস নি? তোর মা কোথায়?'

কুন্দন জবাব দিল না। ওর মুখে যেন কুলুপ আঁটা। মায়ের ঘুম ভেঙে যায় যদি! হয়তো জেগেই রয়েছেন। অনুমানেই বলা সম্ভব, তিনি জেগে, না ঘুমিয়ে। এখন বাবাও যদি সুড়সুড় করে বিছানায় গিয়ে চুপটি মেরে শুয়ে পড়েন, তবেই মঙ্গল। বিছানায় গড়িয়ে পড়লেই ঘুমের অতলে চলে যাবেন উনি, তারপর আপনাআপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই না কুন্দন?

কিন্তু বাবা ঘরের এককোণে রাখা হারিকেনের টিমটিমে সলতেটা একটু উসকে দিলেন যে! তারপর সোজা হেঁশেলে গিয়ে ঢুকলেন। সেখান থেকেই জোরে হাঁক পাড়লেন, 'কেন-রে, আজ খাবার-দাবার কিছু হয়নি নাকি?'

এ্যাই রে! কুন্দন ভেবে পেল না, কী জবাব দেবে। মায়ের ওপর রাগ হচ্ছে। ঘুম ভেঙেই গিয়েছে হয়তো, সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

'রামী, ও রামী!'...ওদিক থেকে কোনও উত্তর নেই। বাবা মায়ের খাটের কাছে গিয়ে মাকে ঝাঁকানি দিলেন—'রামী, ও রামী!'...

মা নিরুত্তর। পাশ ফিরে শুলেন শুধু, আর মুখে আঁচল ঢাকা দিলেন। 'আজ যে আখা ধরাসনি! তোরা খেলি কী?'

তবু মা-র সাড়াশব্দ নেই। কুন্দন ভয় পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো, বাবার পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'সকালের রুটি বেঁচে ছিল। কারো খিদে ছিল না। তাই উনুন ধরায়নি। তুমি গিয়ে খেয়ে নাও।'

বাবা অপলক চেয়ে থাকেন কুন্দনের মুখের দিকে। ঐ চোখে চোখ রাখার

ক্ষমতা কুন্দনের নেই, সে ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। 'আমি সব বুঝি। বাড়িতে কেউ মরে গেলে সেদিন আখায় হাঁড়ি চড়ে না। তোদের কাছে আমি বেঁচে থাকতেই মরার অধম হয়ে গেছি। এ-বাড়িতে আমার কোনো ঠাঁই নেই।'

ওদিকে মায়ের ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে। এদিকে কুন্দনের। আর দু'জনের মাঝামাঝি দরজার পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে বাবা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। সহসা চিৎকার করে উঠলেন তিনি'কাঁদ, কাঁদ, আরও জোরে-জোরে কাঁদ! মড়াকান্না কাঁদ! চাঁড়ালেরা সব মাতম্ কর! কিন্তু আমি এখনও মরে যাইনি মনে রাখিস, এখনও বেঁচে আছি।'

মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কুন্দনের দুরাশা, বাবার রাগ বুঝি এতেই জল হয়ে যাবে আর উনি মা-র মানভঞ্জনের চেষ্টা করবেন, তাঁকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু না, বাবা সোজা এগিয়ে গেলেন বৈঠকখানার দিকে। সেখানেই একটা খালি তক্তার ওপর সটান শুয়ে পড়লেন। হারিকেনের আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন তিনি। কেন? এর আগে কখনও এভাবে ফুঁ দিয়ে তাঁকে আগুনের শিখা নেভাতে দেখেছে কুন্দন?

কুন্দনের হেঁচকি-ওঠা হঠাৎ একেবারে থেমে গেছে। এবার একটা অশুভ আশঙ্কা ছেঁকে ধরলো ওকে। কী নিদারুণ ভয়াবহ এই নিস্তব্ধতা! মুহূর্তের জন্যে ওর কেন-জানি মনে হলো এ এক দুঃস্বপ্ন মাত্র। অন্ধকারে চোখ চিরে দেখবার চেষ্টা করলো সে। না, স্বপ্ন নয়, এটা বাস্তব। বাবা, মনে হচ্ছে সত্যিসত্যি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর মা? মা-র ফোঁপানির আওয়াজ এখনও কানে আসছে।...আর. বাবা ওনাকে চুপ না করিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়লেন! নিজরই সৃষ্টি করা কোঁদল, আর নিজেই গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লেন? যে যতই কষ্ট পাক, কিছু এসে-যায় না ওঁর। এ যেন ওঁর নিজের বাড়ি নয়...

...এবং অকস্মাৎ কুন্দনের জগৎ পাল্টে গেল। সকাল হয়ে গেছে। এরকম সকাল অন্য কোনো শিশুর জীবনে এসেছে কি?

বাবা বৈঠকখানায় নিজের খাটে নেই। বাবা বাড়ির কোথাও নেই। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে। আজকের সকালটা রাতের সেই নিঃসীম অন্ধকারের চেয়েও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন।

তোর নারায়ণ

আগের রাতে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত যে-কুন্দন ছিল, পরদিন সকালে জেগে ওঠে যখন সে, তখন আর সেই কুন্দন নেই। রাতারাতি সাবালক হয়ে উঠেছিল সে। মাকে চ্যাঁচামেচি করতে দেয়নি শুধু তাই নয়, দাদুর বাড়ি খবর দিতে যেতেও তাঁকে রুখে দেয় সে। দাদু সোজা পুলিশে রিপোর্ট লেখাবেন, অনর্থক হৈ-হল্লা হবে, এই ভেবে।

সে একরকম ধরে নিয়েছিল, বাবা আর কোথাও না, রামকাকার কাছেই গিয়েছেন। কিংবা, বড়োজোর জ্যোলিকোট চলে গিয়ে থাকবেন। সত্যিই কি—? মাকে কোনোমতে শান্ত করে সে ছুটলো বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। খানিক খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলো, বাস কেন, রাতের বেলা ওদিকে ট্রাক অব্দি যায় না।

সে সোজা রামকাকার বাড়ির পথ ধরলো। জানা গেল, বাবা রাতেই দেখা করতে এসেছিলেন ওঁর সঙ্গে, কিন্তু রামকাকা বাবার সঙ্গে কথা বলেন নি। বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেন নি।...'তুমি তেমন কোনো কথা বলে দাও নি তো, যেটা আমাকে বলেছিলে?'...'কী?' কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন রামকাকা।...'যে, আমি তোর মুখদর্শন করতে চাই না—?' রামকাকা মাথা নামিয়ে নিলেন। অর্থাৎ, হ্যাঁ, বলে তো ছিলাম। এরপর রাতের ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে দিল কুন্দন। রামকাকা বললেন, 'তুই ভাগীকে নিয়ে বাড়ি যা। আমি জ্যোলিকোট গিয়ে ওকে নিয়ে আসছি।'

কুন্দন সাফ মানা করে দিল: 'কেমন কথা বলছো রামকাকা? এখন তুমি সোজা বাড়ি চলো। লোকজনকে সামলাও গিয়ে। মাকে এইসময় একা তুমিই সান্ত্বনা দিতে পারো। তারপর ভাববো কি করতে হবে। জ্যোলিকোট তুমি কাল-পরশু গেলেও চলবে। আর, উনি যদি অন্য কোথাও গিয়ে থাকেন, তবু বাড়িতেই তো ফিরে আসবেন। যাবেন কোথায়? চ্যাঁচামেচি করলে লোকহাসি হবে শুধু। এর চেয়ে ভালো, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হোক, আবার চাকরি করতে উনি জ্যোলিকোট চলে গিয়েছেন, শিগ্‌গির ফিরবেন। ইলেকশান লড়ার জন্যে রাজিও হয়ে যাবেন হয়তো।'

রামকাকা বিস্ময়ভরা চোখে ওকে একবার হাঁটু থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে, অস্ত্রসংবরণ করার মতো করে বললেন, 'বেশ। যা ভাগী, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নে।'

ভাগীরথী ভেতরে গিয়ে ঢুকলে, রামকাকা কুন্দনকে কাছে টেনে নিলেন, কাঁপাঠোঁটে রুদ্ধ গলায় বললেন, 'আমার কেমন ভয় করছে, কুন্দন! যদি...'

ওঁর না-বলা কথা বুঝে ফেলতে অসুবিধে হয় না কুন্দনের। রামকাকাও ঐ একই কথা ভাবছেন—?

কিন্তু পরে, বাস্তবে যেটা ঘটলো, ততটা বুঝি সে নিজেও কল্পনা করতে পারে নি। সত্য হামেশা কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর!

যাই হোক, বাড়ি পৌঁছনোর পর সেদিন অবিকল তাই ঘটানো হলো, যেমনটা কুন্দন চেয়েছিলেন। রামকাকার নাটকীয় ক্ষমতার ওপর কুন্দনের আস্থা সপ্রমাণ হলো। কাকপক্ষীও টের পেল না যে নারায়ণরাম টাম্‌টা রাতারাতি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। সারাদিন একের পর এক লোকজনের আনাগোনা লেগে রইল, আর গোটা শহরটা যেন ঐক্যমনে সেই সন্নেসিকে কর্মপথে টেনে আনার পুরো দায়িত্বটা সঁপে দিয়ে গেল রামকাকার ওপর। রামকাকাও সকলকে আশ্বস্ত করতে কোনো কসুর করলেন না।

তিন দিন ধরে মফস্বলের আনাচে-কানাচে, যে-দিকে চাও, নারায়ণরামের কীর্তন চললো শুধু। রামকাকা কথামতো জ্যোলিকোট চলে গেলেন। ওঁর চলে যাবার চার দিনের মাথায় সকাল-সকাল একটা লেফাফা মিললো ডাক-মারফৎ। খামের ওপর মায়ের নাম লেখা। কুন্দন মাকে পড়ে শোনালো চিঠিটা।

'রামী,

আমি জ্যোলিকোট হয়ে হৃষিকেষ চললাম। সেখান থেকে অন্য কোথাও যাবো। তরলা বেন দেশের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বেশ-কিছু নাম-ঠিকানা দিয়েছে। আমার কোনো কষ্ট হবে না। তুই চিন্তা করিস নে। ওরা এককাট্টা তিনচার মাসের মাইনেও দিয়ে দিয়েছে। কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে চললাম, কিছু ঘরখরচার জন্যে রেখে দিয়ে যাচ্ছি। তরলা বেন তোকে পাঠিয়ে দেবে।

আমাকে মাফ করে দিস রামী, তোকে সারাজীবন শুধু দুঃখই দিয়ে এসেছি আমি। তুই সব সময় আমার ওপরে ভরসা করেছিস, আর এখনও ভরসা ছাড়িস নে। বাড়ি ছেড়ে যখন পালিয়েছিলাম, মনের মধ্যে রাগ ছিল, না কী ছিল জানি-নে। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না, এভাবে যে পালাচ্ছি, কেন পালাচ্ছি! আমাকে একটু ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে দে। ব্যস, তোর কাছে প্রার্থনা আমার এইটুকু যে, আমার ওপর আস্থা রাখিস। নিজের আর ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্ন নিস। আমি অযথা ঘুরে বেড়াবো না, রামী, নিজের কর্তব্য করে যাবো। আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব, তোকে মাঝেমধ্যে পাঠিয়ে দেবো। আমার কুশলসংবাদ তুই হামেশা পাবি—ব্যস্, আমাকে খোঁজার চেষ্টা করিস নে। সফর শেষ হলে আমি আপনি ফিরে আসবো। আমি ঘুরে বেড়াতে চাই রামী— নিজের দেশটাকে দেখতে চাই ; যার সম্পর্কে, এখন মনে হচ্ছে, কিছুই জানা নেই আমার। লোকে জানতে চাইলে সবাইকে তুই একথাই বলবি যে উনি ওয়ার্ধা গিয়েছেন, তরলা বেন পাঠিয়েছেন কাজ দিয়ে। আর, অনেক বড়ো কাজ। এ সত্যি নয় বটে, কিন্তু একেবারে মিথ্যেও নয়। রামী, তুই যখন এতকিছু বরদাস্ত করেছিস আমার, এটুকুও করিস।

যেখানেই থাকি না কেন, তোর কাছেই থাকবো। তোকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমার কোনোরকম অনিষ্ট হবে না। আমি কারও কোনো ক্ষতি করিনি। যেটুকু ক্ষতি করেছি, তোর করেছি। যা-কিছু অপরাধ করেছি, শুধু তোর প্রতি করেছি। তোকে আমি নিজের থেকে আলাদা করে কখনও দেখিনি। দেখতে পারবও না কোনো দিন। নিজের এই পলায়নকে আমি প্রায়শ্চিত্তই বা বলি কেমন করে?... সুরেন্দ্র মনে আঘাত পেয়েছে বোধহয়। গত কয়েকদিন সে খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল আমার। সে তোকে জানায় নি হয়তো, এরমধ্যে জ্যোলিকোট এসে দু-একদিন আমার সঙ্গেও ছিল। সে বেশ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। পারলে, তাকেও চিঠি দেবো। সে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবে আমাকে। আমার একটা কাজ করবি? তুই রাগ করবি না তো রামী? রাগ করিস নে রামী, তোর রাগকে আমার ভীষণ ভয়। আমি মাত্র দু'জনকে ভয় পাই—এক ভগবানকে, আর এক তোকে। দুটোই ঠিক নয়। কিন্তু...যাক্-গে। তুই আমার তরফ থেকে সুরেন্দ্রকে আড়ালে ডেকে বলিস যে তোর জামাইবাবুর একান্ত ইচ্ছা, তুই নিশ্চয়ই ইলেকশানে দাঁড়াস। এ তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ, আদেশ মনে করলে আদেশ। এটা অনেক-অনেক জরুরী। বালেশ্বরজী আর আচার্য মশায়ও এতে খুশি হবেন আর ওঁদের মনোবল জোর পাবে। আমাদের শহর সম্পর্কে ওঁদের মনে যে আশা জেগেছে, তা যেন বৃথা না যায়। নিজে কর্তব্য বিবেচনা করলে সে এটা করলে আমি খুশি হবো। ব্যস্—আমি দড়ি ছিঁড়ে পালাচ্ছি রামী—এতো তাড়াতাড়ি ফিরছি না, এটা অন্তত তুই বুঝে ফেলেছিস। এই চিঠি কুন্দনকেও পড়ে শুনিয়ে দিস অবশ্যই। ওকে এখন আর কী বলবো আমি—ও আমার আর তোর চেয়ে অনেক বেশি সমঝদার। এইটুকুই বলছি—নিজের ভাই-বোনের খেয়াল রাখিস। আর, খুব লেখাপড়া করিস। আমি আমার ব্যর্থ-জীবনে যা-যা করতে পারিনি, ভগবান ওকে দিয়ে সমস্ত করিয়ে নেবেন, ব্যস্, এই আমার বাসনা। এই আমার আশির্বাদ। আর কি লিখি? এটুকু লিখলাম, এটাই অনকে।

তোর
নারায়ণ।'

বৈঠকে ঢুকতেই কুন্দনের চোখে পড়লো 'অধিকারে'র নতুন সংখ্যাটার ওপর। বেশ পেটমোটা সংখ্যা। দেখলো, একা বালেশ্বরজীর নয়, বাবার ভাষণটাও সবটা ছাপা হয়েছে। অ্যাদ্দিন বাদে?... সুরেনমামা জানালেন, দুটো বক্তৃতাই শর্টহ্যাণ্ডে তুলে রাখা হয়েছিল। বাবার বক্তৃতাটা ছাপার ব্যাপারে দাদু পুরোপুরি গররাজি ছিলেন, কিন্তু সুরেনমামার জেদের সামনে তিনি দমে যান। এসবের দরুণ সংখ্যাটা বেরতে এত দেরি হলো। সুরেনমামা আরও জানালেন, কাগজটা এখন তাঁরই এক্তিয়ারে চলে এসেছে আর তিনি একজন স্টেনোগ্রাফারকেও নিয়োগ করে

ফেলেছেন। গোটা কাগজটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার পর প্রথম যে-সিদ্ধান্তটি সে নিল, তা হল, গরমের ছুটিতে এবার এই জাদুটিকে সর্বাগ্রে শিখে ফেলতে হবে। কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করে নিজের ব্যাগে ভরে নিল সে।

ম্যাট্রিকের পরীক্ষার আর দু'সপ্তা বাকি। মামাবাড়িতে পড়ার জন্যে একটা আলাদা ঘর পেয়েছে কুন্দন। জগদীশ মামাও অল্প-সল্প হেল্প করছেন। এবার তাঁকেও যেতে হবে। লখনউ ইউনিভার্সিটিতে লেকচারারশিপ পেয়েছেন। ম্যাট্রিকের পর কুন্দনকেও ওখানে ডেকে নেবেন। দারুন মজার মানুষ মামা—কুন্দনের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন। খুব খাওয়ান। একটাই গণ্ডগোল, বাবার নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। এমনিতে বাবাও খুব-একটা পছন্দ করতেন না জগদীশ মামাকে। তাঁকে 'কমিউনিস্ট' বলে উপহাস করতেন।

গত মঙ্গলবার কুন্দন রামকাকার বাড়ি গিয়েছিল। রামকাকা ফিরে না-আসা পর্যন্ত ভাগীরথীর সঙ্গে গল্প করেছে। ওদের কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় রামকাকা এসে হাজির। বললেন, 'কুন্দন, এবারের পরীক্ষায় শুধু স্টোরি-রাইটিংই আসবে নাকি? আগে পরীক্ষাটা দিয়ে দে, তারপর গল্প করা তো পড়েই আছে।'—মানেটা পরিষ্কার। কুন্দন সব বোঝে। বাবা যাওয়ার পর ক'বার গেছেন ও-বাড়িতে? আগে কতো মনের জোর পেতো সে! রামকাকাই তো বলেছিলেন মাকে, 'আমি থাকতে চিন্তা কি তোমার বৌঠান? কুন্দনকে আমি পড়াবো। আমি।' আর কুন্দনকেও তো বলেছিলেন, 'যখন মন চাইবে, আমার বাড়ি চলে যাস। নারায়ণের জায়গাটা এখন আমিই নিয়েছি, বুঝেছিস?'... সেই রামকাকাই আজ এতখানি বদলে গেলেন! আগে কখনও এভাবে খোঁটা দেননি তো! হঠাৎ কী হলো?...পরীক্ষা-টরিক্ষা সেসব ঠিক আছে। কিন্তু কথাটা পরীক্ষা মাত্র হলে কিছু বলার ছিল না। ভাগীর সঙ্গে আমার মেলামেশা ওঁর চোখে ভালো ঠেকছে না বোধহয়। কেন?... দু'দিন আগে অব্দি দু'জনকে একসঙ্গে বসিয়ে পড়াতেন যে! আজকাল ভাগীকে আর বসতে দেন না। অবশ্যি, এখন একসঙ্গে বসার প্রয়োজনও নেই। ভাগী বিশারদ পরীক্ষা পাস করে সাহিত্যরত্নের ফর্ম ফিলাপ করতে চলেছে। ওর মনের জোরও দিনে-দিনে বেড়ে চলেছে। ক'দিন আগেই তো বললো, একটা গল্প লিখেছে। গল্প, না ছাই! সত্যি-সত্যি লিখে থাকলে, পড়ে শোনাতো না? গুল। একেবারে গুলগল্প!... কিংবা, কে-জানে, লিখেছে হয়তো। আজকাল কেমন পটর-পটর হিন্দী বলতে শিখেছে, দেখছো না! বিশারদ করে যেন বিশ্বজয় করেছে! নিজেকে সুভদ্রাকুমারী চৌহানের চেয়ে কম ভাবছে নাকি? হুঁঃ! ওরকম লক্ষ-লক্ষ বিশারদ ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।...

দাদুর বৈঠকে আগের মতোই বাদবিসংবাদ হয়। কিন্তু আজকাল দাদুও ওকে সেখানে ঘেঁষতে দেন না, তিনিও সর্বক্ষণ 'পড়-পড়' করেন। সকাল-সন্ধ্যে মানুষ

পড়বেই বা কতো! কোনো বন্ধু নেই, কিছু নেই। স্কুলও নেই আর। সারাটা দিন ঘরে বসে থাকতে-থাকতে শরীর-মন দুই ছটফট করে ওঠে। জগদীশ মামা ফাঁকা থাকলে একটু মজা মেলে। মজার-মজার কথাও বলতে পারেন মামা। দারুণ ইংরেজি বলেন। কুন্দন ঠিক এইরকম ইংরেজি চায়। ভাগীরথী ইংরেজির 'ই' জানে না। কপচে নে, যতো কপচাতে পারিস হিন্দী। অনন্তপুরে স্ট্যাণ্ডার্ড খুবই 'লো' বলে মনে হয় জগদীশ মামার। এখন থেকেই ঘোষণা করে রেখেছেন, ম্যাট্রিকের পর কুন্দনকে লখনউয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে পড়াবেন। কিন্তু মা রাজি হলে, তবেই না? ইণ্টারের পর ছাড়লেও ছাড়তে পারেন, কেননা ইণ্টারের পর পড়াশোনা করতে হলে সবাইকে বাইরে যেতে হয়।

কমিউনিস্ট মামা বাবার পলায়ন সম্পর্কে একটা থিওরি গড়েছেন, যা এতদিনে কুন্দনের কাছে সঠিক বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মতে, এ আর কিছু না, একটা দুরারোগ্য হীনমন্যতা। নিজের যোগ্যতার ওপর বিন্দুমাত্র ভরসা ছিল না বাবার। হেরে গেলে হীনমন্যতার ঐ গাঁঠ আরও শক্ত হয়ে উঠতো, আর জিতে যদি যেতেন, তবু হতো। সেইজন্যে সবার চোখে সাধু-সন্ত ব'নে থাকার ভান করেছেন। অথচ এটা সেই 'অগতির গতি' গোছের ব্যাপারই ছিল। মামা তাঁর বক্তৃতার টুকরো-টুকরো অংশ তুলে ধরে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাবা মনে-মনে এম-এল-এ হবার জন্যে ছটফট করছিলেন। তাই তো জ্যোলিকোট থেকে আসার পর ফিরে যাওয়ার নাম করেন নি, এখানেই গ্যাঁট হয়ে বসেছিলেন। নেতা হওয়ার লোভ ওকে পেয়ে বসেছিল। মামা নিজের সিদ্ধান্তের সপক্ষে আরেকটি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন যে, বাবার মনে শূদ্র হওয়ার জ্বালা সবসময় অক্ষুণ্ণ থেকেছে, কিন্তু গান্ধী-ভক্তির আতিশয্য সেই জ্বালাকে ফুটে বেরনোর সুযোগ দেয়নি কখনও। কম্যুনিস্ট পার্টি হলে এ-রোগের চিকিৎসা অসাধ্য ছিল না, বরং অনায়াসসিদ্ধ ছিল, তিনি অবশ্যই নির্বাচন লড়তেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট পার্টির তালগোল পাকানো লোকগুলো—না-এদিককার না-ওদিককার—তাঁরা এমন ফন্দি আঁটলেন যে জামাইবাবুকে গাছে চড়িয়ে মইটাই কেড়ে নিলেন। আর জামাইবাবু ভাবলেন, এখন নিচে নামাটা ঠিক হয়ে যাবে, সমস্ত গুলপট্টি ফাঁস হয়ে যাবে। এর চেয়ে বরং মহাত্মা গান্ধী ব'নে যাই। যে চিন্তা সেই কাজ। নিজের এই গান্ধী-গ্রন্থির কাছে তিনি এমন নাচার হয়ে পড়েছিলেন যে কী অনন্তপুর, কী জ্যোলিকোট, কী সোশ্যালিস্ট পার্টি, কী পলিটিক্স—সমস্তই তাঁর চোখে তুচ্ছ ঠেকেছিল, আর তিনি বাড়ি ছেড়েই পালালেন—মহাত্মা গান্ধী হওয়ার চক্করে।

থিওরিটা কুন্দনের বেশ মনে ধরেছিল। মামা একদিন বৈঠকে সমবেত মণ্ডলীর সামনে থিওরিটা জাহির করে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন। সোশ্যালিস্ট মামা তো ক্ষেপে

ব্যোম, সভা ওয়াক আউট করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর দাদু দু-একটা সওয়াল জবাব করার পর কমিউনিস্ট মামার পক্ষেই ভোট দিয়ে দিলেন। অবশ্যি, লালাজী আর তিওয়ারিজী তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। আর মুনব্বর মিঁয়া ভাবখানা এমন দেখালেন যেন এ তো আগেই জানা ছিল, এতে আশ্চর্যের কী?

পরীক্ষা শেষ। এবার শুধু ছুটি, ছুটি আর ছুটি। বাবার ভূমিকায় এলেন জগদীশ মামা, উত্তমর্ণের ভূমিকায়। কুন্দন ওঁর পার্শ্বচর হয়ে উঠলো। এখন মামাই ওর হিরো। মাঝেমধ্যে রামকাকার পর্ণকুটির চোখের সামনে ভেসে উঠলে, ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছটফট করে উঠতো ওর মন। কিন্তু সেখানে যাবার চিন্তা মাথায় এলে, এক অদ্ভুত সংকোচ ছেঁকে ধরতো ওকে। রামকাকার তবু মাঝেমধ্যে দেখা মিলতো। দু-চারদিন পর-পর তিনি ওদের বাড়িতে আসতেন, বাবার চিঠি এসে থাকলে শুনিয়ে যেতেন। কিন্তু কুন্দনকে আগের মতো নিজের বাড়ি যেতে বলেন না আর। কুন্দনের কেন-যেন মনে হয়, রামকাকার মনে এই ধারণা পাকাপোক্ত ভাবে বসে গেছে যে কুন্দন ওঁর জন্যে নয়, ভাগীরথীর সঙ্গে দেখা করতে যায় সেখানে। আর হরে-দরে বুঝিয়েও দিয়েছেন যে, এসব ওঁর পছন্দ নয়। এখন যদি মাঝেমধ্যে যেতেও বলেন, সেটা এমনি-এমনি অভ্যেশবশতই বলে ফেলেন। আগের সেই রামকাকা আর নেই। এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও কি কুন্দনের হয়নি?...বেশ, সে যাবে না। কী এসে-যাবে তাতে? ভাগীরথী কষ্ট পাবে? ছাই! কষ্ট পেলে আসতো না দেখা করতে? অন্তত পরীক্ষা কেমন হলো সেটা জানতে আসতে পারতো! মায়ের খোঁজখবর নেওয়ার অছিলায় আসতো! রামকাকা কি ওকে পৌঁছে দিতেন না, আসতে চাইলে—?

ইতিহাস পুরাণ

পেপারগুলো তেমন মনোমত না হলেও, কুন্দন একরকম নিশ্চিত ছিল যে, ফার্স্ট সে হচ্ছেই। হোম-পরীক্ষা-গুলোতে সেকেণ্ড-থার্ড হতে-হতে একটা সন্দেহ কখনও না মরে, ওর মধ্যে না-গায়েব বেঁচে ছিলই যে মাস্টারমশাইরা জেনেশুনেই ওকে—একজন নিচুজাতের ছেলে বলে—ফার্স্ট কখনই হতে দেবেন না। কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় এরকম অন্যায় হবার অবকাশ নেই। সেখানে পরীক্ষকের সামনে থাকে শুধু রোল নাম্বারটি।—যাতে ডোম ব্রাহ্মণ বোঝা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে, এতগুলো বছর কুন্দন যেন এই ঘটনাটিরই অপেক্ষায় ছিল। এবার ইস্কুলের সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দেবে সে। শুধু ইস্কুলে কেন, কসবা-জুড়ে ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে সবাই। তারপর আর কেউ ওর দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে পারবে

না। ম্যাট্রিকের এই সার্টিফিকেটটাই ওর রক্ষাকবচ হবে, কেউ ভেদ করতে পারবে না যাকে।

কিন্তু রেজাল্ট বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে কুন্দনের সমস্ত আশা-স্বপ্ন ভোজবাজির মতো উবে গেল। সেকেণ্ড ডিভিসনই ওর জুটল। দিন-দুপুরে জানালা-দরজা বন্ধ করে সে যখন হাউ-হাউ করে কাঁদছিল...এমন সময় ওর নিজের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার ঘটলো। হঠাৎ মনে হলো ওর এই বিলাপ নিছক ডিভিজনের জন্যে নয় ; একটা গোটা দুনিয়া ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল বলে সে এই মড়াকান্না কাঁদছে। সেই দুনিয়াটাকে ওর কাছ থেকে হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এতকাল পরে এই প্রথম বাবা সামনে না-থাকার সম্পূর্ণ ও আমূল নাড়া দেওয়ার মতো চেতনা জাগলো ওর মনে। তিনি যদি এই অসময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে না যেতেন, ওর ডিভিজন মার খেতো না। ওর সবচেয়ে গভীর সুখস্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করার জন্যে তিনিই দায়ী।

পৃথিবীর যে-কোনো বালকের পক্ষে এহেন ঘটনা বজ্রপাতের সামিল। কিন্তু কুন্দন ধৈর্য-সহকারে যেভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করেছিল, সেটা ওর নিকটজনের কাছে তো বটেই—খোদ মা আর রামকাকার কাছেও, বিস্ময়কর ঠেকেছিল। কুন্দন আর ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা সেই প্রাচীরটিকে এক ঝটকায় ফেলে দিতে পেরেছিল কে? স্বয়ং কুন্দন। শুধু ওর দৃঢ় সংকল্প। আর এই কঠোর সংকল্পই ওর সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওকে অবিচলিত রেখেছিল। মাসখানেক তো ওর ভাবভঙ্গি দেখে ঠাহর করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল যে কিছু ঘটেছে। সবই যেন সহজ-স্বাভাবিকই রয়ে গেছে। সম্ভবত এই একটি কারণে, বাবার প্রতি সহানুভূতিবোধের খানিকটা তলানি অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল ওর মধ্যে। ওর প্রাত্যহিক কাজকর্ম এতাদৃশ দুর্ঘটনার পরেও দস্তুরমতো অব্যাহত থেকেছে। পরিবর্তন যদি কিছু ঘটে থাকে, বাহ্যিক ভাবেই ঘটেছিল ; হৃদয় সেই পরিবর্তনকে স্বীকার করেনি।

এখন সেই চিত্তস্থৈর্য, সেই সংকল্প ওর নিজের কাছেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। পলকের ব্যবধানে চোখের সামনে ফুটে-ওঠা বাবার ছবিটি কেঁপে উঠে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বাবার সম্পর্কে ওর সমস্ত মূল্যায়ণই পাল্টে গেল যেন সহসা। আগে যেগুলোকে বাবার গুণ বলে মনে হতো, এখন সেসব দুর্গুণ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। ওর নিজের ওপরই গ্লানি হচ্ছে যে কিভাবে এই লোকটাকে এতদিন ধরে নিজের আদর্শ বলে মেনে এসেছে সে! মূলত নিষ্ঠুর আর দায়িত্বজ্ঞানহীন এই লোকটাকে। মুহূর্তের ব্যবধানে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল যে আগাগোড়াই তিনি ছিলেন এক-নম্বরের বাউণ্ডুলে, সাম্প্রতিক ঘটনাটি তো তার পরিণতি মাত্র। যা-কিছু এতদিন ধরে তিনি চালিয়ে এসেছেন—এ তার চরম পরিণতি।

বাড়ির প্রতি, মায়ের প্রতি, ভাই-বোনের প্রতি, স্বয়ং ওর প্রতি কোন্ দায়িত্বটা তিনি পালন করেছেন? পালন করা তো দূরের, পালন করার অনুভূতি পর্যন্ত তাঁর মনে জাগেনি কখনও। বাবাকে আগে মনে পড়েনি, তা নয়, প্রায়ই মনে পড়ত। আর কখনও-কখনও তো ভ্রম হতো বাবা বুঝি ওর পাশাপাশি হাঁটছেন! ও নিজের সঙ্গে কথা বলতো, আর মনে হতো যেন বাবার সঙ্গে কথা বলছে। নিজেরই কণ্ঠস্বরকে বাবার কণ্ঠস্বর বলে মনে হতো ওর। যেন তিনিই ওর মধ্যে থেকে কথা বলে উঠছেন। কিন্তু এখন বাবার সমস্ত স্মৃতির অর্থ বিপরীত ভাবে ধরা পড়ছে ওর কাছে। এই অনুভূতি ওকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করে রাখতে শুরু করল যে একজন জীবিত মানুষের কথা সে ভাবছে না, ভাবছে একজন মৃত মানুষের কথা। একজন বেঁচে-থাকা বাবার স্মৃতি নয়, একজন দূর সম্পর্কের মৃত ব্যক্তির স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ওর মধ্যে।

এতদিন যে নিজের বাবার সঙ্গে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, একটা তাদাত্ম্য রক্ষা করে এসেছে, এখন না-জানি কোন্ বিষুবক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে তাঁকেই নিজের শত্রু বিবেচনা করতে বাধ্য হচ্ছে সে। বাবার প্রতি যাবতীয় কোমল মনোভাবগুলিকে সে যেন উপড়ে ফেলেছে। এখন তিনি ওর কাছে অসাফল্য, হীনমন্যতা, দারিদ্র আর কাপুরুষতার প্রতীক। সেই দুপুরের পর একদিন সহসা তার মনে উদয় হলো যে বাবাকে মন থেকে মুছে ফেলা না-পর্যন্ত, নিজের জীবন থেকে বের না করে দেওয়া পর্যন্ত বাবার কাছ থেকে সে অসুরক্ষিতই থেকে যাবে। ততদিন পর্যন্ত সে নিজে কিছুই করতে পারবে না, পৃথিবীতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

বাড়ির পরিবেশ আর ইস্কুলের জীবন থেকেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। এটা দেখে সে অবাক হয় আত্মগ্লানিবোধও আঁকড়ে ধরে তাকে যে, কতকিছু রয়েছে, অথচ আগে সেসব লক্ষ্য করেনি সে, যেভাবে করা উচিত ছিল। এখন যেভাবে সেগুলি তাকে ডংকা মারছে, আগে কখনও সেভাবে মারেনি তো? এ নিশ্চয়ই সেই ভোঁতামির কারণে ঘটেছে যার পাগলামি সমস্ত কিছুকে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল। আলবাত সে একজন 'ডোম': নিজের পারিপার্শ্বিক জীবনের যাবতীয় আনন্দ আর নিয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত। এ-বিচ্ছিন্নতা তো আগেও ছিল। কই, তার অনুভূতি তো জাগেনি কখনও। কেন জাগেনি? কে ওর চোখের সামনে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিল এতদিন। বাবা নয় তো! কুন্দনের ভেতরটা তেঁতোয় ভরে গেল। মায়, দাদুও ওর কাছে হাস্যকর ঠেকতে শুরু করল। তাঁর বৈঠকের আড্ডাও। কম্যুনিস্ট মামাই, আজ ওর মনে হচ্ছে, হাভেলিতে একমাত্র মানুষ ছিলেন। তিনি না থাকলে কুন্দনের পক্ষে সামলে-ওঠা সহজ ছিল না। সেই ক্ষত আর ব্যথা ভুলে যেতে মামাই ওকে সাহায্য করেছিলেন। রামকাকার ওখানে যাওয়া তো সেই কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা রামকাকা—থুড়ি রামদত্ত মাস্টার ছিলেন তো সেই বাবারই

ন্যাংটো বয়সের বন্ধু। ওর সঙ্গে দেখা করাও একরকম বাবার সঙ্গে দেখা করার সামিল ছিল। যতই আলাদা ব্যক্তিত্ব হোক তাঁর, ছিলেন তো সেই বাবার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে। বাবারই ঘনিষ্ঠ হয়ে। এতটা অন্তরঙ্গতা, যে, জ্ঞানত কুন্দনের স্মৃতিতে তাঁরা পরস্পর গেঁথে ছিলেন। একজনের কথা মনে পড়লে, দ্বিতীয়জনের মুখ উঁকি মারে। সেই রামদত্ত মাস্টারের সঙ্গে সে দেখা করতে যাবে কেন, যাকে দেখামাত্র অপ্রতিরোধ্য ভাবে বাবাকে মনে পড়ে যায়, যাঁকে ভুলে যেতে সে কৃতসংকল্প!

মাঝেমাঝে এক অদ্ভুত ছটপটানি টের পেত সে আর ভাগীরথীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। সেই ব্যাকুলতার তলায় আজ এক অগাধ নৈরাশ্য। কালে নৈরাশ্য। ভাগীরথী—একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা!... আর কুন্দন একজন ডোমের ছেলে।...এই মেলামেশার অর্থই বা কী?

বেশ কয়েকবার বিকেলের দিকে রাস্তায় নিরুদ্দিষ্টের মতো ঘোরাঘুরি করতে-করতে হঠাৎ-হঠাৎই ওর পা দুটো রামকাকার পর্ণকুটিরের দিকে একরকম জোর করে এগিয়ে গেছে। খুব কষ্টে, অনেক চেষ্টায় বারবার সে নিজের পা-দুটোকে সেখানে যাওয়া থেকে ক্ষান্ত করেছে। তবু মাসে-দশে অন্ততপক্ষে এক-আধবার সে ওখানে গিয়ে ঢুকতই। রামকাকা ওকে দেখামাত্র খুশি খুশি ভাব নিয়ে ওর পড়াশোনার কথা জানতে চাইতেন, ইণ্টার অব্দি ওকে এখানেই আটকে রাখার সিদ্ধান্তও, মা নয়, রামকাকাই গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই কোত্থেকে বইপত্র জোগাড় করে এনে ওকে দিয়েছিলেন। আর জলপানিও দেওয়া করিয়েছিলেন। কিন্তু কেন-যেন এসবের দরুণ রামকাকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি কখনই। প্রকাশ করার কথা ভাবলেই ওর মনে হতো সেটা লোক-দেখানো ব্যাপারের মতো হবে। রামকাকার কথাবার্তায় আগে যে-একটা রস পেত, সেটাও এখন আর পায় না। রামকাকার কাছে প্রত্যেকবারই শোনাবার মতো একটাই কথা থাকতো, সেটা হলো বাবার লেটেস্ট চিঠি। যা তিনি মেকি উৎসাহ দেখিয়ে শোনার অভিনয় করতেন: বেচারা রামকাকা ওর মধ্যে ঘটে-চলা পরিবর্তনকে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেন নি। আগের মতোই খেলো কথা বলতেন। কুন্দনের এটা দেখে অবাক আর বিবমিষা লাগত যে, যে রামকাকা ওর বাবার সামনে ওর এতো সমালোচনা করতেন, সেই রামকাকাই এখন কুন্দনের বড়াই করেন শুধু। রামকাকার এই আচরণটাকে তাঁর বানানো বলে মনে হতো কুন্দনের। তাঁর এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে বাবার কলকাঠি নাড়া অনুভব করত সে। কিন্তু মা ওকে সমস্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, রামকাকার সঙ্গে আজ কী-কী কথা হলো, এইসব। মায়ের নামেও বাবার চিঠি আসতো আর মা ওগুলো সযত্নে তুলে রাখতেন। কিন্তু মায়ের মনে এটা চোট লাগত বোধহয়—লাগবারই কথা, যে, তাঁর স্বামীর সম্পর্কে যত খবরাখবর রামকাকার জানা ছিল, ততটা উনি জানতে পারেন নি, আসলে মায়ের মনোরক্ষা করার জন্যেও

কুন্দনকে মাসে কমসে-কম একবার কি দুবার রামকাকার বাড়িতে হাজিরা দিতে যেতে হতো।

কিন্তু সত্যিসত্যি কি এটুকুই ব্যাপার ছিল? সেই অপ্রিয় কিন্তু অনিবার্য কর্তব্যবোধের বশবর্তী হয়েই কি সে ঐ পাক্ষিক সাক্ষাৎকারে যেতে, তার পেছনে অন্য-এক অনুপ্রেরণাও কি কাজ করতো না। কি ছিল সেই অনুপ্রেরণা?—কুন্দন যা স্বয়ং নিজের কাছেও স্বীকার করতে আড়ষ্ট বোধ করছে। আর যে অনুপ্রেরণা নিছক কর্তব্যবোধ ছিল না, ছিল দুর্দাম আবেগ। গভীর নৈরাশ্য থেকে নিষ্পিষ্ট দুর্দম্য আবেগ আর দুর্দম্য অভিলাষার অনুপ্রেরণা।

হ্যাঁ, কুন্দন সেখানে যেতো ভাগীরথীকে একঝলক দেখতে পাবে বলে। একথা ভিন্ন যে ভাগীরথীকে এক ঝলক দেখে বা ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলার পর যখন সে ফিরত ওর মনটা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ত। আর কেন-যেন মনে হয় ভাগীরথীর আচরণে এখন আর আগের মতো খোলামেলা ব্যাপার নেই। সে আগের মতো কলকল করে ছুটে আসে না—এখন সে ওকে পাঁচ হাত দূরেই রাখে। রামকাকার সামনেও কুন্দনের সঙ্গে সে বেধড়ক কথা বলতো, এখন সেটা করে না। ব্যাস যখন, বাবার পুরাণ খোলা হয়—তাঁর চিঠি পড়া হয়, তখুনি ওর চোখ দুটোতে আগের সেই পরিচিত-চমকটি ফুটে-ওঠে। এমনিতে কুন্দন ওর বাড়িতে গেলেই কি আর না-গেলেই কি। গোড়ার দিকে সে কুন্দনের জন্যে অপেক্ষায় বসে থাকতো, একরকম এটাই ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে সে বুঝতে পারে যে সেটা ওর মনের ভুল ছিল, তাছাড়া কিছু নয়। নিজের অজান্তেই এই দেখাসাক্ষাৎ ক্রমশ সাপ্তাহিক থেকে পাক্ষিক, পাক্ষিক থেকে মাসিক, আর পরে দ্বৈমাসিক ও ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সে নিজেকে পড়াশোনার মধ্যে নিমজ্জিত করে দেয়। দাদুর বাড়ি যাওয়াও ছেড়ে দেয়। থাকে শুধু ডুমৌড়ার এই একটা কুঠরি আর বইপত্রের স্তূপ। মাও এতে দারুণ খুশি। রামকাকাও খুশি। আর ভাগীরথীর কাছে কী ইতর-বিশেষ হয় সে গেলে বা না-গেলে!

ডুমৌড়ার প্রতি কুন্দনের মনে আগের মতো সেই ঘৃণাও আর নেই। যেহেতু ওর বাবা ওকে নিজের তরফ থেকে মামাবাড়িতেই সঁপে দিয়েছেন। সে হাভেলিওয়ালাদের কাছে যাবে না। কেন যাবে? কমিউনিস্ট মামাও তো চলে গেছেন লখনউ। সেখানেই যখন যেতে দেওয়া হলো না, তখন সে হাভেলিতে গিয়ে থাকুক আর ডুমৌড়াতেই থাকুক, কী এসে-যায় তাতে? ব্যাস, একটা বছর আরও কাটাতে হবে। তারপর এ-মফস্বলের মুখ সে দেখবে না। জ্যোলিকোট থেকে লেখা বাবার সেই চিঠিটা কুন্দনের কাছে আছে, একসময় চিঠিটা পড়তে ভালো লেগেছিল, এখন লাগে না। এমন নয় যে হাভেলি ওর ভালো লাগে না। অত ভালো জায়গা, পড়াশোনার কত সুবিধে, ভাল লাগবে না কেন! কিন্তু মাকে একা ছেড়ে যেতে

ওর মন সায় দেয় না। সে এখানে বসেই পড়াশোনা করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।

ডুমৌড়ার বিরুদ্ধে কুন্দনের মনে এখন আর কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ যেটুকু, তা সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে যাদের মুখে দিনরাত, 'তোর বাবা কোথায়? কি করছেন? বাড়ি আসেন না কেন'...এসব শুনতে-শুনতে ওর কান পচে গেছে। আরে, তোমাদের তাতে মতলব?... তার বাদে রকম-রকমের গুজব। লোকগুলোর যেন অন্য কোনো কাজ নেই। কেউ বলে, 'সন্নেসি হয়ে গেছেন, আমরা নিজের গিয়ে দেখে এসেছি। কাছে যেতেই গায়েব হয়ে গেলেন...!' কেউ বলে, 'দেরাদুনে তরলা বেনের এক দিদি থাকেন, ওখানেই চাকরের কাজ করছেন।'...কেউ বলে, 'রোজগার করতে গিয়েছেন, দেখিস টাকার থলি নিয়ে ফিরে আসবেন।' বাজারপাড়ার লোকগুলো তো আরেক কাঠি ওপরে। বলে, 'এখানে নেতাগিরি করে পেট ভরতো নাকি! দেখিস আর-কিছুদিন পরে কী হয়। এরই মধ্যে বড়ো-বড়ো নেতাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছেন।...' সবচেয়ে জোরালো গুজব ছড়িয়েছে ডুমৌড়াঅলারা... 'কোথাও যাননি, এই ধারে-কাছেই কোথাও বসে হয়তো তন্ত্র-সাধনা করছেন। আরে, আমরা নিজের চোখে মাঝরাতে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি। এদিকেই কোথাও গুহা আছে, ওখানেই বাস করেন। রামী সব জানে...'

মোদ্দা কথা, নারায়ণরাম টাম্টা জীবিতবস্থাতেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। আর সমস্ত নীরবে সহ্য করা ছাড়া কুন্দনের গত্যন্তর ছিল না। এখন সে সমাজের দয়া আর উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েছে।

মামাবাড়িতেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত শোকের ছায়া ছেয়ে ছিল। সুরেন মামা নারায়ণরামের যাবতীয় শুভাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নির্বাচন হেরে গিয়েছিলেন। কুন্দনের কানে যাতে ঢোকে, সেরকম করে কত লোকে বলে বেড়িয়েছে—'আরে, এর বাপ হলে জিতেও যেতেন হয়তো। এইটুকুনি ছোঁড়াকে লোকে ভোট দেবে কেন? ওঁর ব্যাপারটা ছিল আলাদা। উনি তো ত্যাগী মহাত্মা ছিলেন।'

ত্যাগী মহাত্মা! আর ভূত-পিশাচ সিদ্ধকারী! দুটোর মধ্যে কোনো মিল আছে? কিন্তু এরই নাম ডুমৌড়া। বরং এরই নাম অনন্তপুর। আর ক'টা দিন বাদে কুন্দন হয়তো বলতে শুরু করবে, দিস ইজ ইণ্ডিয়া!

যাই হোক সুরেনমামা এটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন যে তাঁর জামিন বাজেয়াপ্ত হয়নি আর তিনি কংগ্রেসের কিছু ভোট কাড়তে পেরেছেন। কংগ্রেসের প্রার্থীকে জিততে দেন নি। তিনি এই নির্বাচনে নিজের পরাজয়কে আগামী নির্বাচনে অবশ্যম্ভাবী জয়ের ভূমিকা রূপে দেখছিলেন।

সান্ত্বনা পুরস্কার

উনিশশো তিপ্পান্ন। পনেরই আগস্ট। বিকেলবেলা।

দিনটা হঠাৎ মনে পড়লো কেন? কী ঘটেছিল সেই দিন?

রামসে হলে বিতর্ক-প্রতিযোগিতা কে-জানে কাদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল। রামকাকাই খবরটা এনে দিয়েছিলেন। ওঁর উস্কানি পেয়েই তো কুন্দনের সাহস জেগেছিল। সিডিউল কাস্ট ছেলেকে এসব ব্যাপারে অংশ নিতে দেখেছে কেউ? রামকাকা দিন-কতক হরেকরকমের দাঁওপ্যাঁচ শিখিয়ে তবেই শাগরেদকে আখড়ায় নামিয়েছিলেন। সুরেনমামা তো উল্লেখ পর্যন্ত করেননি ওর কাছে,—অবশ্যি দারুণ অবাক হল যখন দেখল তিনি বিচারকমণ্ডলীরই একজন। সোশ্যালিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানেই বোধহয় আয়োজনটা করা হয়েছিল। স্বয়ং দাদুও শ্রোতাদের আসনে উপস্থিত ছিলেন আর অনুষ্ঠানের শেষে কুন্দনের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। দাদু কিন্তু অত সহজে প্রভাবিত হন না।

কুন্দন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিল যে, প্রথম পুরস্কারটা সে-ই পাচ্ছে। কিন্তু সিডিউল কাস্ট ছেলেকে ফার্স্ট প্রাইজ!... অংশগ্রহণকারীরা সবাই ব্রাহ্মণ আর ঠাকুরদের ছেলে—শহরের মাতব্বরদের সন্তান সবক'টা। তাদেরকে বাদ দিয়ে কুন্দনের ভাগ্যে শিকে কি ছিঁড়তে পারে? যদি ছেঁড়ে, সেটা হবে কাঁঠালের আমসত্ত্ব খাওয়ার মতো ব্যাপার।

ইতিপূর্বেও এহেন সংশয়ের দোলায় বেশ কয়েকবার দুলেছে কুন্দন। কিন্তু প্রতিবারই ঐ লোকটা ওর মনে কোনো সংশয়কে দানা বাঁধতে দেন নি।...কিন্তু আজ সেই সংশয়ের হাত থেকে ওকে রক্ষা করবে কে? একের পর এক সংশয়, দ্বন্দ্ব...রামকাকা আর বুঝবেন কী? রামকাকাকে বলেও কোনো লাভ নেই। ওঁর কাছে এ-রোগের কোনো চিকিচ্ছে আছে? থাকেনও তো কত দূরে! সপ্তা কেটে যায়—দেখা মেলে না এমনিতেও, বেচারা টিউশানি পড়িয়ে ছুটিই বা পান কখন!

বেচারা রামকাকা! কী ভীষণ জোরে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন শাগরেদের। বলেছিলেন, সুরেনমামাকে শুনিয়ে,—'তোর প্রতি অন্যায় হয়েছে, চরম অন্যায়। যাকে ফার্স্ট প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, কায়দা করে, সত্যি বলতে কি, সান্ত্বনা পুরস্কারেরও যোগ্য ছিল না সে। আমি হলে তো সেটাও দিতাম না।'

আর সুরেনমামা বাড়ি ফেরার পথে ওকে বলেছিলেন, যেন দারুণ-একটা গূঢ় রহস্য উন্মোচন করছেন, এমন গলায়, 'আমার মতে তুইই ফার্স্ট ছিলি। কিন্তু না জানি লোকে কী ভাববে, ভাগনের দিকে পক্ষপাত করছি মনে করবে—এই ভেবে আমি জেনেশুনে তোকে বেশি নম্বর দিই নি।'

'কেন মামা, কেন?' কুন্দন আর দম কষে থাকতে পারেনি, 'তাই যদি হয়,

তবে তো সবার আগে জজই হওয়া উচিত ছিল না তোমার। হয়েই যখন ছিলে, তখন সুবিচার করতে!'

মামা হেসেছিলেন, সলাজ হাসি।...'আরে, তাতে কিছু তফাৎ ঘটত নাকি? আমরা তিনজন জজ তো পাশাপাশিই বসেছিলাম। বাকি দু'জন তোকে এত কম নম্বর দিয়েছিল যে আমি একশোর মধ্যে একশো দিয়ে দিলেও থার্ড প্রাইজের বেশি তোর জুটত না। থার্ড প্রাইজ নিয়ে তুই কী করতিস, বল!'

মর্মাহত কুন্দনের মুখে তৎক্ষণাৎ কোনো কথা ফোটেনি। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছিল সে।

'রামদত্ত মাস্টারের কথাগুলো আমার মোটেই ভালো লাগেনি। আমাদের মাঝখানে উনি বলবার কে? নিজেকে কী ভাবেন! তিওয়ারিজীর সঙ্গে অহিনকুল সম্বন্ধ। সেইজন্যেই তো ওনাকে আমরা জজ করিনি। জেনেশুনেই। তুই কন্সোলেশান প্রাইজ নিতে অস্বীকার করে ভালো করিসনি। এটা উদ্যোক্তাদের অপমান ছাড়া আর কি?'

'তুমি উদ্যোক্তাদের অপমানের কথা ভাবছো। আর আমি? আমার অপমানটাকে তুমি অপমান বলে মনে করো না?' কুন্দন বাজেরকম ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু জনান্তিকে। ওর গলি এসে পড়েছিল। ও সোজা ঢুকে পড়ে, সুরেনমামার বিদায় নেওয়ার আগেই। সুরেনমামার ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর। ভারি এসেছেন উপদেশ দিতে! নিজেই আয়োজক, নিজেই বিচারক! বিচারক হওয়ার দরকার কি ছিল? দু-দুটো পাঁঠা যখন জুটে গিয়েছিল, তখন তৃতীয়টিও জুটেই যেত। পাঁঠার অভাব রয়েছে নাকি এই মফস্বলে? বেইমান শালা! লজ্জা করে না?... আর এই মহাশয়কে দ্যাখো, উল্টো ওদেরই পক্ষ নিচ্ছেন। নিজের মধ্যে তো একটুকুনিও সাহস নেই। লজ্জা করে। আরে, এই ব্রাহ্মণ-রাজপুতদের লজ্জা করে না যখন, তোমার করে কেন? ভাগনে বলে শূলে চড়িয়ে দেবে? খুব যে সোশ্যালিস্ট বলো নিজেকে, এই কি তোমার সোশ্যালিজম? চুলোয় যাক ন্যায়, চুলোয় যাক অধিকার আর সততা! পাঁচজনকে দ্যাখো, আর নিজের মান বাঁচিয়ে চলো। একেও সন্তুষ্ট রাখো, ওকেও। এ কি ভীরুতা নয়? ভণ্ডামি নয়? ভারি এসেছো লোকলজ্জাঅলা! হয় তুমি লোককে গ্রহণ করো, কিংবা লজ্জাকে। এরকম ঘাপলাবাজি করো কেন? বড়ো-বড়ো বুলি কপচাও কেন? এটুকু সাহসও যদি না থাকে, তবে?'

সভা-ভরতি লোকের মাঝখানে রামদত্ত মাস্টার মশাই চিৎকার করে বলেছিলেন— 'নানা, কোনো প্রয়োজন নেই কুন্দন! এই কন্সোলেশান প্রাইজটাকে এইসব জজদের জন্যেই থাকতে দে। এঁরাই এর যোগ্য।'

মঞ্চের ওপর থেকে বার-তিনেক ডাকা হয়েছিল কুন্দনের নাম। কিন্তু সে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি পর্যন্ত। যেন জড় ব'নে গিয়েছিল সে। হতবুদ্ধি। রামকাকার তর্জনগর্জন কানে আসার পরই নড়াচড়া শুরু হয়েছিল ওর মধ্যে।

অনুষ্ঠান-শেষে রামকাকা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন। মায়, দাদুও। যে-দু'জন কখনও ঐক্যমত হতে পারেন নি, কোনো ব্যাপারেই, তাঁরা আজ এই একটি সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন যে কুন্দনের ভাষণটিই সবচেয়ে জোরালো হয়েছে, আর ফার্স্ট হওয়ার যোগ্য তো সে ছিলই।

কিন্তু তাতে কি? দাদু আর রামদত্ত মাস্টার হলেই-বা একমত। তাঁরা ওকে ওর আধিকার তো দেওয়াতে পারলেই না, ওর তরফ থেকে ন্যায়যুদ্ধ নড়ার ক্ষমতা তো দু'জনের একজনেরও হয়নি! লোকে তো তারই গুণগান করলো, ফার্স্ট প্রাইজ পেল যে। যতই বলুন এঁরা যে নিত্যানন্দ কাণ্ডপাল কণ্ঠস্থবাগীশ, ওর ভাষায় প্রাণ নেই। তাতে কি হয়? লোকে তাকেই চেয়ে দেখে, যে সফল হয়, সবার সামনে প্রথম পুরস্কার লাভ করে যে। আর, সিডিউল কাস্ট ছেলেকে ফার্স্ট প্রাইজ দিলে এইসব উঁচু জাতের লোকেরা মুখ লুকোবে কোথায়? আগেও তো কতবার ডিবেটে অংশ নিয়েছি,—কখনও প্রাইজ পেয়েছি?... আর, বাবা বলতেন, 'নিজের গুরুদেব সম্পর্কে এরকম ভাবিস না। গুরু তো গুরুই। পক্ষপাত করতে যাবেন কেন।' আর,...'ফলের চিন্তা করিস না—ফল তো ভগবানের হাতে। নিজের হাতে আছে শুধু কর্তব্য। কর্তব্য করে যা শুধু।' একেবারে বাজে কথা। সব ভালো করে দেখে নিয়েছি। বোকা বানাবার সর্বোত্তম উপায়—অন্যকে নিষ্কাম কর্মের পাঠ পড়িয়ে যাও আর নিজের আখের গুছিয়ে নাও। কুন্দন সব বোঝে। ওকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না।

আর ভাগীরথী?... সেও তো এসেছিল রামকাকার সঙ্গে। কুন্দনের জাদু দেখতে। দেখে নিলে জাদু? ...ছি-ছি, কী ভাবছে সে মনে-মনে? নিজেকে কেমন সংকুচিত মনে হচ্ছিল কুন্দনের, রামকাকা যখন ওর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলেন আর ও নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল—আনত চোখে। ভাগীরথী কি বোঝে যে ওকে সামনে দেখেই এতখানি ভালো বলতে পেরেছিল সে, যেমনটা আগে কখনও বলতে পারেনি? আর, এতখানি আত্মবিশ্বাসও আগে কোনোদিনও জেগেছিল নাকি? সে তো এই সুখস্বপ্নে বুঁদ হয়ে ছিল যে আর ক'মিনিট পরেই ওর নাম ডাকা হবে আর ভাগীরথী করতালির করকাপাতের মধ্যে ওকে ফার্স্ট প্রাইজ গ্রহণ করতে দেখবে! আর, সেও ওকে দেখবে—ওর খুশিতে উচ্ছ্বল মুখটাকে।... বরং সে একটা কাজ করবে—কাপটা ওরই হাতে তুলে দেবে, তারপর ওর হাত থেকে গ্রহণ করবে।

...আর এখন? এখন..আজ যে ভাগীরথীর সামনে তৃতীয় শ্রেণীরও অধম জীব বলে পরিগণিত হলো। রামদত্ত মাস্টার যাই বলুন না কেন, ভাগীরথী মুখ খুলে একটা কথাও বলেনি। চেয়েও দেখেনি ওর দিকে।... তবে ভাগীরথীও কি মনে-মনে ওকে সান্ত্বনা পুরস্কারের যোগ্য বলেই মনে করে না?

অনাথালয়

দাদু আমাদের বাড়িতে!...

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কুন্দন। জ্ঞানত সে দাদুকে এ বাড়িতে আসতে দেখেনি। আজ হঠাৎ এমন কী ঘটলো?

মায়ের মুখ দেখে মনে হলো, মেজাজ সুবিধের নয়। খটাখটি বাধেনি তো?

'লেখাপড়া কেমন চলছে, কুন্দন?' দাদু জানতে চাইলেন। ও মাথা নামিয়ে নিলো। খুব-একটা ভালো তো আর চলছে না। যারা পড়াশোনায় ভালো, তারা নিজেদের সঙ্গে কথাই বলতে দেয় না ওকে। কী যে মনে করে নিজেদের!

'এখানে পড়াশোনা আর হবেই বা কি!' দাদু যেন কুন্দনের মনের কথা আঁচ করতে পেরেছেন—'না আছে বিল্ডিং, না স্টাফ। সেই গঙ্গাদত্ত, সেই নন্দাবল্লভ, সেই জন মাস্টার আর সেই চিক্কি!...ইণ্টার খুলে দিলেই কি আর ইণ্টারের পড়া হয়ে যায়? ...নতুন মাস্টার এসেছে কেউ?'

'একজন এসেছে, আগরওয়াল। অঙ্ক পড়ান। কিন্তু...' নিচু গলায় বললো কুন্দন, 'উনি নিজেই অঙ্ক জানেন না। একদিন আমি মেথড বলে দিতে আমাকে ক্লাস থেকে বের করে দিলেন।'

দাদু হাসি চাপতে পারলেন না। ওঁর হো-হো হাসি শুনে বেশ মজা পায় কুন্দন। বেশ জোরালো মানুষ দাদু। ওঁর হাঁটা, বলা, হাসা সব-কিছুতেই নিজস্ব খাস স্টাইল রয়েছে, যা কুন্দনের দারুণ ভালো লাগে।

'দেড়শো টাকা দিয়ে তিনশো টাকার কাজ চাইলে মূর্খগুলো আর পাবে কাদেরকে।...শোন, লখনউয়ে পড়তে চাস তুই? তোর মামার চিঠি এসেছে।'

লখনউ! কুন্দনের বুকটা আনন্দে নেচে উঠলো। লখনউ, জগদীশ মামা যেখানে পড়েছেন, আর ওখানেই তো উনি প্রফেসারি করছেন। কুন্দন নিজেও তো প্রফেসার হতে চায়। ইউনিভার্সিটি প্রফেসর!

'তোর মাকে তো এই কথাই বোঝাচ্ছিলাম, যে, লখনউয়ে তোর যে-পড়াশোনা হতে পারে, এখানে সেটা কোনো মতেই হতে পারে না। তোর মা বলছিল, এখন নয়, ইণ্টার পাশ করার পর। আরে, আমি হলে তোকে ম্যাট্রিকের পরেই পাঠিয়ে দিতাম। যাক-গে, ফার্স্ট ইয়ারটা এখানে করলি, বেশ করলি। ফাইন্যালটা লখনউ গিয়ে দে। জগদীশ যখন আছে, ক্রাইস্ট চার্চে অ্যাডমিশনও হয়ে যাবে। সবচেয়ে ভালো কলেজ। ঐ কলেজের ছেলেরাই প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয়, তুই জানিস নিশ্চয়ই!'

কুন্দন মা-র মুখের দিকে তাকায়। মা আগের মতোই আনত মুখে বসে।

'মা, দাদু ঠিক বলছে। জগদীশ মামারও হেল্প পাওয়া যাবে। মামা সব বিষয়ে

ওস্তাদ। এখানে তো কিছুই পড়ায় না। ছেলেরা আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। আর টিচাররাও জানি-না কেন, খচে থাকেন আমার ওপরে!'

'হলো রামী, এবার বল। ছেলের কথা তো তুই শুনলি। পরীক্ষা একে দিতে হবে, না তোকে?'

মা তেমনি নীরব। কুন্দনের বুক দুরুদুরু করছে। মাকে খুব ভয় করে সে।

'নারানের কথা শুনতে হবে না তোকে। পড়াশোনার মর্ম ও বোঝেটা কী। আর এতোই যদি চিন্তা, বাড়ি ছেড়ে পালালো কেন? নেতাগিরির আশ এখানে বসেই মেটাতে পারতো না কি? নিজের ভুষ্টিনাশ তো করেইছে, এখন দেখছি ছেলেটার জীবনও ছারখার করে ছাড়বে। ওর কিসের মতলব! আমি আবার বলছি রামী,কুন্দনকে লখনউয়ে পাঠিয়ে দে আর তোরা সবাই হাভেলি চলে আয়।' মায়ের জবাব শোনার জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন দাদু, তারপর আর দম কষে থাকতে পারেন না—'তোর এখানে আছেটাই বা কী শুনি? কার জন্যে এই শ্মশান আগলে পড়ে আছিস?'

মা মুখ তুলে তাকান, 'আমার যে আর কোথাও মন বসে না বাবা! আমি কী করি?'

দাদু ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'বেশ বলেছিস! বাপের বাড়ি কি আর বাড়ি নয়? ওখানে তোর ভালো লাগবে কেন?... এরও ভালো লাগে না বল?'

'একে আমি বারণ করেছি নাকি? একেও শুধোও—' মা বললেন।

'এইজন্যেই তো বলেছিলাম, তোরা সবাই ওখানে গিয়ে থাক। অত বড়ো দালানে থাকার অভাব? জগ্গুর রুমটা খালি পড়ে রয়েছে। কুণ্ডী, গোরা, নন্দ সবাই তো চলে গেছে।'

'বাবা, আমার আসা-যাওয়া তো এমনিতেই লেগে আছে। নিজের দেউড়ি ভুলি কেমন করে? তুমি আমার জন্যে ভেবো না বাবা, আমার কোনো কষ্ট নেই...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোনো কষ্ট নেই তোর।' দাদু গর্জে উঠলেন, 'আমি সব জানি।' বলতে-বলতে আটকে গেলেন। ফাঁসা-ফাঁসা গলায় বললেন, 'আমাদের কষ্টের কথাটাও তো একটু ভেবে দেখ, নিজের মায়ের কথা ভাব।'

'বাবা, জগ্গুর বিয়ের কথা কিছু চলছে—' মা কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন।

'হুঃ!' দাদু উঠে দাঁড়ালেন, পিছমোড় করে পায়চারি শুরু করলেন, 'তুই ভাবছিস জগ্গুর বউ এলে হাভেলির শ্রী ফিরে আসবে? আমাদের দু-দুটো ছেলে-বউকে তো দেখছি। আরে, মেয়েরাই যখন আপন হয় না, বউদের কাছে কিসের আকাঙ্ক্ষা?'

মা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন দাদুর দিকে। বাবা আজ হঠাৎ এরকম কথা বলছেন কেন? আগে কখনও বলেন নি তো!

'এবার শোনা, কী ফয়সালা করছিস।'

'বাবা।' মাকে একটু চিন্তিত মনে হয়। ধীর গলায় বললেন, 'তুমি কুন্দনকে নিয়ে যেতে চাও, যাও, নিজের কাছে রাখো।... কিন্তু আমি বাড়ি ছাড়ি কি করে?'

'তোর আছেটাই বা কী এখানে?' আবার মাথা গরম হয়ে উঠলো দাদুর, 'নারানকে এতো ভয়? ঐ ছন্নছাড়া লম্পটটাকে—যার না লজ্জা আছে, না শরম—যার না নিজের মান-মর্যাদার খেয়াল আছে, না আমাদের...'

এ আবার কী হলো! মা যে কাঁদতে শুরু করে দিলেন! ওঁর খারাপ লেগেছে।

'ওঁকে কিছু বোলো না বাবা। উনি যেমনি হোন, নিজের জন্যেই নিজের বাড়ির জন্যে। তোমার কী বিগড়েছেন?...কুন্দন তোমার কাছে থেকে কিছু শিখুক, এ তো উনিও চান। সব ক'টা চিঠিতে তোমার কথা লেখেন।'

'কে সে?' দাদু এবার সত্যিসত্যিই সংযম হারিয়ে ফেললেন, 'আমার খবর জানবার সে কে? ভবঘুরে কোথাকার! ওখানে বসেও হুকুম চালাচ্ছে! আমি ওর মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চাই না। তুই যেতে চাস তো চল। যেতে না চাস, চুলোয় যা। সে ভেবেছেটা কি? আমার ঘর অনাথআশ্রম নাকি?'

আর হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন দাদু। মা চেয়েই রইলেন।

'শুনলি তো তুই! তোর দাদু কী বলে গেলেন!'

'ঠিকই তো বলেছেন—' মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল কুন্দনের, 'তুমিই তো ওঁকে মিছিমিছি রাগিয়ে দিলে। উনি আমাদের ভালোর জন্যে বলছিলেন। ইণ্টারে যখন থার্ড হবো, তখন হুঁশ হবে তোমার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তোর খারাপটা চাই কিনা। সবার শত্রু আমি—' আবার ফুঁপিয়ে উঠলেন মা, 'তোর বাবাই তো লিখেছে।'

'বাবা কী জানে। যতো রাজ্যের ফালতু কথা বলে শুধু। কুন্দনের বুকের ভেতরটাও গুমরে ওঠে। কিন্তু সে কাঁদতে পারে না মায়ের মতো। 'তুমি আর কী বুঝবে, কতো-কী দুর্ভোগ পোহাতে হয় আমাকে। বাবাকে নিয়ে কতো-কী শুনতে হয়...'

'তো আমি কী করি, তুইই বলে দে না!'

'তুমি আমাকে লখনউ যেতে দাও, ব্যস। জগদীশ মামা আমাকে বলে গেছেন। উনি কতো ভাবেন আমার কথা! যদি ফার্স্ট না হই, সত্যি বলছি, ডুবে মরবো।'

সিঁড়িতে হঠাৎ পায়ের শব্দ শোনা গেল। 'ডুবে মরার কথা কে বলছে ভাই?'...আরে, রামকাকা আবার কোত্থেকে এসে পড়লেন? এই সময় তো আসেন না কোনোদিন!

'নিজের ভাইপোকে বোঝাও রমদা। লখনউ যাবে বলে জেদ ধরেছে।'

'ওহো, লখনউ!'...রামকাকা একটা বড়োসড়ো নিঃশ্বাস মোচন করে মোড়ার ওপর বসে পড়লেন। 'আমি ভাবলাম বুঝি কী-যেন হয়ে গেল! আরে ভাই ফার্স্ট ইয়ার তো তুই দিয়েই ফেলেছিস। আর একটা বছরের তো ব্যাপার। তারপর বি এ করতে তো যেতেই হবে তোকে। এখানে আবার অসুবিধেটা কি হলো?'

'অসুবিধে বলে অসুবিধে!' কুন্দন এবার রামকাকার ওপর খিঁচিয়ে উঠলো, 'আমার ডিভিজন মার খায় যদি?'

রামদত্ত মাস্টার সজোরে হেসে উঠলেন, 'ডিভিজন! তোর কী হয়েছে বল তো বাপু! তোর মতো হাল হলে আমি নির্ঘাৎ ফেল মারতাম, অথচ তুই ফার্স্ট ডিভিজনের কাছাকাছি মার্ক্স এনে দেখিয়ে দিয়েছিলি। মাত্র দশ নম্বরই তো কম পেয়েছিলি। তুই যা বই চাস, আমাকে বল, বইয়ের পাহাড় জমিয়ে দেবো। ভাবছিস কেন? পুরো বছরটাই তো পড়ে রয়েছে। শুধুশুধু ভয় পাচ্ছিস। ফার্স্ট ডিভিজন কি বলছিস ডিসটিংকশান পাবি তুই। আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারিস। লখনউ তো তোকে যেতেই হবে। ব্যস, একটা বছরের ব্যাপার। নারায়ণও আশ্বস্ত রয়েছে এই ভেবে যে তুই বাড়িতেই আছিস, আর আমার আণ্ডারে আছিস। তাই না বৌঠান?'

মা কোনো জবাব দিলেন না। এখন যা করবার, কুন্দনকেই করতে হবে। রামকাকা নিজের তরফ থেকে ওর জন্যে যথেষ্ট করেন। সমস্ত বই তো উনিই কিনে দিয়েছেন। কিন্তু...ক্যারিয়ারের প্রশ্নটা বড়ো।

ও দাদুর কাছে যাবে, এখুনি। জগদীশ মামাকেও চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে ও ফয়সালা নিয়ে ফেলেছে। আমি লখনউ আসছি।

'দরকার নেই।' মা হঠাৎ ফেটে পড়লেন। কুন্দনের মনোভাব যেন আঁচ করতে পেরেছেন। 'জগ্গু অনাথ আশ্রম খুলে রেখেছে নাকি? যাদের মামা লখনউয়ে থাকে না, তারা কি আর লেখাপড়া করে না? না, কোনো প্রয়োজন নেই, কুন্দন। বলে দে তোর দাদুকে। নিজের দেমাক নিজের কাছে রাখুন।'

রামকাকা হতবাক। উনি একবার মার দিকে তাকান, একবার কুন্দনের দিকে। 'ব্যাপারটা কী বৌঠান! অনাথআশ্রমের কথা এসে পড়লো কোত্থেকে?'

মা যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলেন—'ও কিছু না। এমনি বলছিলাম। তুমি থাকতে রমদা, কুন্দনের ভাবনা কী? ওর বাবা বলেন তোমার মতো জ্ঞানীপুরুষ এ শহরে দ্বিতীয়টি নেই। তাহলে...'

রামকাকার দমফাটা হাসিতে গমগম করে উঠলো গোটা বাড়িটা। 'ঐ পাগলের কথা বাদ দাও বৌঠান। আমি কিরকম জ্ঞানী পুরুষ, তা আমিই জানি। তোমার কুন্দনই আমাকে পড়াতে পারে, বুঝেছো!'

'হয়েছে!' রাখো তোমার বামুন-বুদ্ধি, তোমাকে পড়াবে কুন্দন! ওর মাথায় এখন ফার্স্ট ডিভিজনের ভূত চেপেছে। ফার্স্ট ডিভিজন যে পায় না, তার পড়াশোনা কি বৃথা যায়?'

কুন্দন যেন আকাশ থেকে পড়লো।...একা বাবা কেন, মাও দেখছি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সামিল।...আর রামকাকাও।...ঠিক আছে, ও সবাইকে দেখিয়ে দেবে। দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবে, কুন্দন কী বস্তু!

লিট্‌ল কমরেড ও জামাইবাবু

নে খা—খেয়ে দ্যাখ।' জগদীশ মামা একটা প্যাকেট কুন্দনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন।

'না মামা, আমি খাই না।' কুন্দন দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

জগদীশ মামা দাদুর মতো হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'বোকা পেয়েছিস আমাকে? আমি তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে দেখেছি। আড়ালে খাওয়ার কি দরকার? আমাকে ভয় পাস নাকি?'

'না তো...' কুন্দন সজোরে মাথা নাড়ে। সত্যিই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে সে। একবার..., সেই প্রথম একটা মাত্র টান দিয়েছিল, সেটাও দেখে ফেলেছেন?

'তবে, লজ্জা পাচ্ছিস বল। তোর মামা বলে? কতো বার বলেছি তোকে আমি বন্ধুর মতো ট্রিট করি। তবে? এখানে আসার পর প্রথম-প্রথম তোর কি হাল হতো, মনে আছে? আমার বন্ধুদের সামনে তোর গলা শুকোতো, এমন মুখচোরা ছিলি তুই! এখন আমি সঙ্গে না থাকলেও ওদেরকে বেশ ভালোই এণ্টারটেইন করতে পারিস—আমাদের আড্ডাতেও ভিড়ে যাস, একেবারে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিস তুই! এতো সুন্দর ইংরেজি বলতে পারিস!

অনন্তপুরে পড়ে থাকলে এসব হতো?'

অস্বীকার করতে পারে না কুন্দন। মামার কথাগুলো সর্বাংশে সত্যি।

'তোর কাছে এখন মাছ-মাংসও জলভাত। মনে আছে, আমার অনেক বলার পর প্রথম একটু স্যুপ খেয়ে কী হাল হয়েছিল তোর?'

কুন্দন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে উঠলো। ইস্, মামা কেন-যে ঐ প্রসঙ্গটা বারবার তোলেন! সব ওলোট-পালট করে দিয়েছিল সে। পরে ক্রমশ সব কেমন শিখে ফেলে। বেশ তো, কিন্তু সেটা মনে করিয়ে দেওয়ার কি আছে?

'সিগারেটের স্বাদ ভাল্লাগে তোর?' মামা ওর চোখে চোখ রেখে জানতে চান।

'স্বাদ কি বলছো, মামা! ভীষণ তিতকুটে। লোকে এতো মজা পায় কেন সেটা দেখতেই আমি একবার টেনে দেখেছিলাম। কাশতে-কাশতে দম বেরিয়ে গিয়েছিল। সত্যি মামা, কি করে যে খায় লোকে!'

মামা আবার অট্টহাস করে উঠলেন। 'প্রথম জুস খাবার পরেও এইরকমটাই ভেবেছিলি, তাই না?'

কুন্দনের মুখে কুলুপ এঁটে যায়।

'জোর করে খেতে বলছি না তোকে। বলছি যে কোনো ব্যাপারে ইনহিবিশন থাকাটা ঠিক নয়। তাতে পার্সোন্যালিটি মার খায়। সবকিছুর এক্সপিরিয়েন্স থাকা উচিত, পরে না-হয় ছেড়েই দিলি। স্বেচ্ছায়। বুঝেছিস? অন্তত আমার সামনে তোর

সংকোচ করার দরকার নেই। যখন ইচ্ছে আমার প্যাকেট থেকে বের করে আমার সামনেই খেতে পারিস। বুঝেছিস?'

কুন্দন মাথা হেলিয়ে দিল—বুঝেছি মামা, বুঝেছি।

'আমরা ড্রিঙ্ক করি, তোর সেটা বদভ্যাস ঠেকে, তাই না?'

'না, আমি কিছু ভাবিই না। তুমি সেরকম ভাবছো কেন মামা?'—কুন্দন অবাক হয়।

'আরে ভাই, কে জানে! তুই সাধু-সন্নেসির সন্তান কিনা। কয়েকটা ব্যাপার তো বাজে লাগেই তোর।'

আহত দৃষ্টি তুলে কুন্দন মামার মুখের দিকে তাকালো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলো সে। এক মুহূর্ত ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরলো না। পরক্ষণে বললো, তুমি বারবার বাবার রেফারেন্স দাও কেন বলো তো? আমার নিজস্ব কোনো পার্সোন্যালিটি নেই?'

মামা মৃদু হেসে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে কুন্দনের পাশে এসে বসলেন। সস্নেহে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'নেভার মাইণ্ড মাই বয়। আমি এমনিই ঠাট্টা করছিলাম। তুই বুঝিস না যে ঐ পচাগলা সংস্কার ছাড়িয়ে কতো ওপরে উঠে এসেছিস তুই। পার্সোন্যালিটি কি বলছিস, ব্র্যাণ্ড নিউ পার্সোন্যালিটি বল। এবার ছুটিতে বাড়ি যাবি যখন, সবাই ভেবড়ে যাবে, এ আবার কোন্ কুন্দন! সেই কুন্দনই, না অন্য কেউ?'

'মামা!'—একটু ইতস্তত করে বললো কুন্দন, 'এবারের ছুটি আমি যদি এখানেই কাটাই? না-জানি কেন, বাড়ি যেতে মন চাইছে না।'

'অফকোর্স। তোর যদি মন না চায়, যাস না। কোনো জবরদস্তি নাকি? আমি তো ভাবলাম, একবছর হয়ে গেল, বাড়ির জন্যে তোর মন আনচান করছে বুঝি।'

'আনচান তো করেই।... কিন্তু জানি না কেন...' কুন্দন বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে বলবে।

'নেভার মাইণ্ড। তোর ইচ্ছে নেই যখন, গিয়ে লাভ কি? বোর হয়ে পড়বি। কোনো কম্পানি নেই, কিছু নেই। আমার তো ইচ্ছে তুই এখানে থেকেই ছুটিটা কাজে লাগা। খানকতক পার্টি লিটারেচার পড়ে ফ্যাল। কিংবা ফটোগ্রাফি জয়েন করে নে। অনন্তপুরে শুধুশুধু রট হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে তো ভালো।'

'ঠিক আছে মামা।' যুক্তিটা বেশ মনে ধরলো কুন্দনের, উৎসাহিত হয়ে বললো, 'আমার উপন্যাস পড়তে খুব ভালো লাগে। ভাবছি এবারের ছুটিতে সবক'টা উপন্যাস পড়ে ফেলি। যতোগুলো পড়া বাকি।'

'বেশ, বেশ।'—মামা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দার দিকে গেলেন, নিচের

দিকে ঝুঁকে তাকালেন, তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, 'শালা দুটো এখনও এসে পৌঁছলো না।'

'কাদের আসার কথা মামা?' কুন্দন জানতে চাইলো।

'আরে ভাই, ঐ নাগর আর মাথুর। আমার কনফার্মেশন হয়েছে কিনা, সেটা সেলিব্রেট করার ব্যাপার ছিল। হতভাগাগুলো সেই কবে থেকে পেছনে লেগেছে। ভেবেছিলাম এই ফাঁকে ওদের সঙ্গে একটু বিয়ার-টিয়ার খাওয়া যাবে! তোকে বলেছিলাম না?'

'না তো!' কুন্দন বললো, 'সেলিব্রেশানের ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝলাম না!'

'আরে, আমার লেকচারারশিপ কনফার্ম হয়েছে, সেটাই।'

'ওহো, কনগ্র্যাচুলেশন মামা! আগে বলো নি তো?' কুন্দন হাত বাড়িয়ে দিল।

'থ্যাংক ইউ কুন্দন!' মামা হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'যা কুঁদরুকে বলে আয়, আমাদের চারজনের জন্যে কিছু বানিয়ে দেবে। মাংস-টাংস...আর শোন্, আমার তো ভাই গলা শুকোচ্ছে। একটা বোতল তুলেই আন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

কুন্দন দ্রুত ভেতরে চলে গেল। চাকরটাকে অর্ডার দিয়ে বরফের বাক্স খুলে দেখলো, হ্যাঁ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাপ্‌রে! এতগুলো বোতল আনলেন কখন মামা। কুঁদরুকে দিয়ে আনিয়েছেন হয়তো।

রান্নাঘরে গিয়ে কাঁচের গ্লাস বার করতে-করতে ওর খট্‌কা লাগে, মামা আবার যদি সেই প্রসঙ্গটা তোলেন!... যাক-গে, তুলুক না। আজ সে মামাকে দেখিয়ে দেবে সেও তাঁর চেয়ে কম যায় না। ভেবেছেটা কি কুন্দনকে? সাধু-সন্নেসির ছেলে। হুঃ!...

'আরে, একটাই গ্লাস যে নিয়ে এলি! আমাকে একা খেতে দেখেছিস কখনও।'

কুন্দন ফ্যাসাদে পড়লো। 'তোমার বন্ধুরা আসুক আগে...'

'তাতে কি? আমায় সঙ্গ দিবি না তুই? আরে ভাই, এ তো চিরতার জল—চিরতা। বাচ্চাদের ড্রিঙ্ক। যা, আরেকটা গ্লাস নিয়ে আয়।'

কুন্দন ছুটে গিয়ে আরেকটা গ্লাস নিয়ে এলো। ওর বুক এমন ধড়ফড় করছে কেন? যেন মাইল দুই দৌড়ে ফিরছে!

'চিয়ার্স!' মামা গ্লাসে গ্লাস ঠেকান।

কুন্দন এক চুমুক খেয়েই বুঝলো, এর স্বাদটা তেমন-কিছু খারাপ নয়, যতোটা ভেবেছিল। টকটক, ভালোই লাগছে।

'যা, একটু টম্যাটো-পেঁয়াজ কেটে নিয়ে আয় দেখি। আর যদি কিছু ভাজাভুজি থাকে, তাও।'

কুন্দন রান্নাঘরে গিয়ে টম্যাটো-পেঁয়াজ কাটতে-কাটতেই ঠাহর করলো মামার বন্ধুরাও এসে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই হৈ-হুল্লোড় বাধিয়ে দিয়েছেন।

'হ্যালো কুন্দন, হাউ আর ইউ?'

'গুড ইভিনিং লিট্‌ল কমরেড!'

কেন-যেন কুন্দনের মুখ দিয়ে 'গুডমর্নিং' বা 'কমরেড' কিছুতেই বেরতে চায় না চট্ করে। নিজের ওপর রাগ হয় ওর। দুজনকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে নিজেকে খুব বোকা-বোকা ঠেকলো।

'নাগর, আমাদের পাট এবার চুকলো বলে।'

'কেন ভাই? আবার কি হলো?' মামা স্মিতমুখে বন্ধুর দিকে তাকান।

'কমরেড কুন্দন জিন্দাবাদ। এখন আমাদের দরকার কী?' নাগর সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন। আর অন্যজন—কী যেন নাম ওঁর—মাথুর সাহেব? হ্যাঁ, মাথুর সাহেবও।

কুঁদরু পকৌড়ার রেকাবি নিয়ে এসে রেখে গেল। সঙ্গে একটা বোতল আর দুটো গ্লাসও।

'চিয়ার্স!'

'থ্রি চিয়ার্স ফর প্রফেসার তামতা!'

'ফোর চিয়ার্স ফর কমরেড কুন্দন।'

'নাগর, আজ ভাং চড়াও নি?'

'এই তো চড়িয়ে এলো, আমার সামনে।' মাথুর সাহেব হাসলেন।

'ওহ্, আই হেট ইট!' মামা মুখ বেঁকালেন, 'আমি ভেবে পাই না যে ভাঙের সঙ্গে মদের কী সম্পর্ক! কোনদিন শালা রিয়্যাকশান করলে বুঝবে ঠ্যালা।'

মাথুর সাহেব সজোরে হেসে উঠলেন, 'আরে ভায়া, রিয়্যাকশনারিকে রিয়্যাকশান করলেই বা!'

'আরে, আমার কিছু হবে না বন্ধু।'— নাগর সাহেব ঢক-ঢক করে গ্লাসের অর্দ্ধেকটা গিলে ফেললেন, 'অমৃতলাল নাগরকে দেখেছো?'

'কোন্ অমৃতলাল নাগর?' মামা জানতে চাইলেন। আশ্চর্য! এরই মধ্যে নেশায় পেলো নাকি? অমৃতলাল নাগরকে চেনেন না?

'বুন্দ অওর সমুদ্রের লেখক মামা।' গ্লাসে বিয়ার ঢালতে-ঢালতে নাগর সাহেবের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো কুন্দন, 'উনিও বিয়ার খান নাকি?'

'বলতে পারছি না।' নাগর সাহেব হাসলেন, 'তবে, ওঁর আসল নেশা হলো ভাং।'

'তাই তো বলি'—মাথুর সাহেব মাঝখানেই নেমে পড়লেন, 'বুন্দ অওর সমুদ্র মনে হয় ভাং খেয়েই লিখেছেন।'

'শাট আপ!' নাগর সাহেব চটে গেলেন, 'জগ্গী, খেদ এই যে তুমি হিন্দী লিটারেচার পড়ো নি। নইলে তোমাকেই জজ বানিয়ে দিতাম। জানো, সারাটা রাস্তা আমরা ঝগড়া করে এসেছি...'

কুন্দন ঝোপ বুঝে কোপ মারলো, 'ঝগড়া আবার কী নিয়ে আংকল? বুন্দ অওর সমুদ্র নিয়ে?'

নাগর সাহেবের চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠলো, 'এবার বলো তো বাপু! কমরেড কুন্দনের আদালতে আজ হয়েই যাক ফয়সালাটা।'

'কিসের ফয়সালা হে? বোর কোরো না।' জগদীশ মামা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন, 'কুন্দন রে, এখনও অন্তত চারটে বোতল পড়ে রয়েছে। নিয়ে আয়— বোতলই সাবাড় করি। এ শালা গ্লাসে ঢেলে খেয়ে মজা নেই।'

মাথুর সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, 'একে বিতর্ক আর কী বলবে, এ হলো পাক্কা জাতিবাদ। বলে কিনা, অমৃতলাল নাগর যশপালের চেয়ে বড়ো নভেলিস্ট। তুমিই বলো, এর পরেও বিতর্ক চলে? কোথায় যশপাল আর কোথায় অমৃতলাল নাগর। এটা কোনো কম্পোজিশান হলো?'

'আমার তো মাইরি দুজনকেই মিডিওকার মনে হয়।' মামার গলা শুনতে পেলো কুন্দন। বোতল বার করতে-করতে ও চমকে উঠলো। আশ্চর্য, না-পড়েই এ-রকম মন্তব্য করার মানে? ও দ্রুত পায়ে দু'হাতে দুটো করে বোতল নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো, প্রশ্ন করলো, 'মিডিওকার আবার কী জিনিস মামা?'

বন্ধু-দুজন সজোরে হেসে উঠলেন। মাথুর সাহেব বললেন, 'কমরেড জগ্গী, এমন কোনো হিন্দী লেখকের নাম করো, যিনি তোমার চোখে মিডিওকার নন!'

'ভাই, দ্যাখো, আমি হিন্দী লেখালেখি তেমন-কিছু পড়িনি। যেটুকু পড়েছি, মিডিওকার বলেই মনে হয়েছে। তবে বলবো না কেন? আমার তো, সত্যি বলতে কি, তোমাদের ঐ প্রেমচাঁদকেও মিডিওকার ঠেকে।'

'ব্যস, ব্যস থাকতে দাও।'—মাথুর সাহেব উঠে পড়লেন, 'কমরেড জগ্গী, মাতৃভাষার এই অপমান আমি বরদাস্ত করবো না।'

'ইট্‌স টু মাচ।' নাগর সাহেবও যোগ দিলেন, 'এ ক্ষেত্রে আমি মাথুরের সঙ্গে আছি। সেণ্ট পারসেণ্ট। কুন্দন, মাইরি, তুমিও কিছু বলো।'

কুন্দন মামার দিকে তাকালো। আবার ক্ষেপে না ওঠেন!...'মামা তো ইংরেজি নভেলই বেশি পড়েন।' পরক্ষণে হঠাৎ কথা পাল্টে—'আমার কিন্তু যশপালের চেয়ে অমৃতলাল নাগরই বেশি পছন্দ।'

'দ্যাট স্যাটিল্‌স্ ইট—' নাগর সাহেব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কুন্দনের পিঠে সজোরে একটা ঘুসিই বসিয়ে দিলেন। মাথুর সাহেব বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে থাকলেন শুধু।

'যশপাল গল্পকার তো মন্দ নন,' কুন্দন সাফাই দিল, 'কিন্তু ওঁর মধ্যে সেই লাইফ, সেই কালার নেই যা নাগরজীর রচনায় যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। দুজনেই লখনউয়ের লেখক, অথচ'...

'এ আবার কোনো কথা হলো!' মাথুর সাহেব ভড়কে গেলেন, 'চুলোয় যাক লখনউ। লেখায় লোকাল কালার কতোটা রয়েছে তা দিয়ে লেখকের মান বিচার হবে? যশপাল ইউনিভার্সাল, বুঝেছো?'

'আরে, রাখো তোমার ইউনিভার্সাল!' নাগর সাহেব নাক সিঁটকোন, 'লোকালেরই যার পাত্তা নেই, তিনি আবার ইউনিভার্সাল হবেন কী? ছাই!'

'লোকাল কালার থাকাটা তেমন-কিছু দোষের তো নয় বন্ধু!' জগদীশ মামা বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার বলে উঠলেন, 'লেখা পড়ে তো বোঝা যাবে যে জীবিত মানুষের কথা পড়ছি! যারা আমাদের মতোই জীবন কাটায়, একই রকম ফিলিং...'

'যশপালের চরিত্রগুলো জীবন্ত নয় কে বলেছে?' মাথুর সাহেব বিগড়ে গেলেন, 'তুমি জঙ্গী কিছুই পড়ো নি যখন, খামোকা মুখ খোলো কেন?'

'ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। আমি উইদড্র করে নিচ্ছি।' জগদীশ মামা পুনরায় গা এলিয়ে দিলেন, 'আজ শালা এই লিটারেচারের ফ্যাঁকড়া কোত্থেকে এলো? আর কিছু পেলে না তোমরা?'

'এ সবই ভাঙের চমৎকার ভায়া!' মাথুর সাহেব বললেন। মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। চাইবে বিয়ার-পার্টি, আর ডেকে আনবে ভাঙাড়িদের!'

'আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে—' নাগর নিজের ফয়সালা জাহির করলেন, যশপাল-সাহিত্যে যে কোল্ডনেস রয়েছে, তার সবচেয়ে বড়ো ফ্যাক্টার হলো, লখনউয়ে বাস করা সত্ত্বেও উনি কখনও ভাং চেখে দেখেন নি। অন্যদিকে নাগরের মধ্যে যে মদমত্ততা, মদিরতা, যে সহৃদয়তা রয়েছে...তার পেছনে ভাঙের ভাঙরবাজির বড়ো রকম ভূমিকা রয়েছে।'

'ইজ হি অলসো কমিউনিস্ট?' মামা জানতে চান।

'মোটামুটি।' নাগর সাহেব বললেন। কুন্দন হাসি চাপে। কমিউনিস্ট আবার মোটামুটিও হয় নাকি!

'এবার পড়েই ফ্যালো ভায়া।' নাগর সাহেব বললেন। পরক্ষণে মাথুরের দিকে ফিরে দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টি সহ, 'আর যশপালও।'

'তোমরা কেউই পাঠক নও, বুঝেছো, পাঠক নও।' মাথুর সাহেবের কণ্ঠস্বরকে কুন্দনের কানে দারুণ ক্ষুব্ধ ঠেকলো। কতো দূর থেকে ভেসে আসছে যেন! নেশা চড়েছে, বোঝা যায়। ওর নিজেরও। চিরতার জল এরকম হয় নাকি?

তখুনি বাইরে থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'জগদীশ! জগদীশ!'

'কে ডাকছে ভাই?'

'বয়স্ক লোকের গলা মনে হচ্ছে!'

'উঠে দ্যাখ্ তো কুন্দন! আরে, দাঁড়া, দাঁড়া। আমিই দেখছি।' মামা দু'পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, 'কুন্দন, মনে হচ্ছে জামাইবাবু এসেছেন!'

'জগদীশ!...কুন্দন!...' গলাটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ঠিকই। দরজার কাছাকাছি এসে পড়েছেন বাবা!

কুন্দনকে যেন বৃশ্চিকে দংশন করলো সহসা। সত্যি-সত্যিই...বাবা! সে পাগলের মতো রুদ্ধশ্বাসে ভেতরের দিকে পালালো।

তারপর?...পরবর্তী দৃশ্য কুন্দন স্বচক্ষে দেখেনি বটে, কিন্তু কল্পনায় অবশ্যই ধরে নিতে পেরেছে। মামা পরে যা বিবরণ দেন, তারও মদতে।

জামাইবাবু ওরফে নারায়ণরাম টাম্‌টা তাঁর শ্যালকের বৈঠকে প্রবেশ করেন এবং মামা নিজের বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ'... 'হাউ ডু ইউ ডু'...ইত্যাদির পর 'আপনিও একটু নিন না'...'মাফ করবেন' ইত্যাদি-ইত্যাদি। এবং নারায়ণরাম টাম্‌টার চক্ষুদ্বয় বন্ধু-দুজনের ওপর থেকে সরে ক্রমশ নিজের শ্যালকের মুখমণ্ডলের ওপর এসে স্থির হয়। জিজ্ঞেস করেন, 'কুন্দন কোথায় জগদীশ?'

কুন্দন এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, এরপর আরও ভেতরের দিকে পালিয়ে গেল। ওর ভেতরে তখন ঐ দেড় বোতল বিয়ার নিজের খেল্ শুরু করে দিয়েছে। ভেতরের ঘরে খাটের ওপর সটান শুয়ে পড়লেও, বুকের ধুকপুকানি একটুও কাটেনি। কান খাড়া রেখে সে ওঁদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলো। দরজা ভেজানো রয়েছে, সব কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

'কুন্দন ওর এক বন্ধুর বাড়িতে কম্বাইণ্ড স্টাডি করতে যায় রোজ।' মামা ঢোঁক গিলে বললেন, 'কখনও-কখনও ওখানেই শুয়ে পড়ে। ওর বন্ধুর বাড়িটা ঠিক কোথায়, বলতে পারবো না।'

নারায়ণরাম টাম্‌টা যেন হতাশ হলেন। বললেন, 'কাউকে দিয়ে ডাকিয়ে আনতে পারবে না? কতো দূরে? আসলে, ব্যাপারটা হলো জগদীশ, আমার হাতে দু'ঘণ্টা সময় আছে। সফরের ফাঁকে এখানে এসে পড়েছি। এখান থেকেই ট্রেন পাল্টাবো। ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। আমার চিঠি পেয়েছো নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম বটে—'জগদীশ মামা বললেন—'কিন্তু ওতে আপনার আসার কথা কিছু লেখা ছিল না।'

'আরে ভাই, আমিই জানতাম নাকি? সে এক কাকতালীয় ব্যাপার।...যাক-গে, পারলে ওকে তুমি ডেকে আনাও। কিংবা ওকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে চলে এসো। আমি দু-নম্বর প্লাটফর্মে থাকবো। সঙ্গে কয়েকজন রয়েছেন।'

একটা দিন না-হয় থেকেই যেতেন।' মামা বললেন। যদিও উনি ভালোভাবেই জানেন যে বাবা থাকবেন না, থাকতে পারবেন না।

'তুমি বললে কম্বাইণ্ড স্টাডি...সেটা ঠিক বুঝলাম না ভাই। কম্বাইণ্ড স্টাডি মানে?' বাবা কেটে-কেটে বলেন কথাগুলো, 'পড়াশোনা আবার একসঙ্গে হয়·নাকি? সাহায্যের ব্যাপারে তুমিই যথেষ্ট ছিলে না কি?'

'ছিলাম না বলেই তো। আচ্ছা বেশ, আমি চেষ্টা করছি ওকে স্টেশনে নিয়ে আসার জন্যে। আপনার ট্রেন ছাড়ার আগেই পৌঁছে যাবো। কিন্তু আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাবার খেয়ে যাবেন, রেডি আছে।'

'না জগদীশ।' বাবা উঠে দাঁড়ালেন, 'খাবার সঙ্গে রয়েছে আমাদের। আমাকে এবার যেতে দাও। তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো কিন্তু।...পারলে কুন্দনকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে এসো।' নারায়ণ রাম টাম্‌টা সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন, ঘাড়মাত্র ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোনো হস্টেল নেই?'

'কেন বলুন তো?' মামা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, 'হস্টেল দিয়ে কী হবে?'

'ভাবছিলাম, কুন্দনকে হস্টেলে ভরতি করে দিলেই হয়। একা থাকলে মানুষ আত্মনির্ভর হতে শেখে। বছর খানেক হলো তোমার সঙ্গে রয়েছে, এবার ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও।' তারপর একটু থেমে, 'তুমি যে মদও খাও জগ্গু, জানতাম না তো! এ তোমার নিত্যকর্ম নাকি?'

মামা একটু ক্ষুণ্ণ হন।' দেখুন জামাইবাবু, এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কী করছি না-করছি, তা নিয়ে আপনার ভাবার দরকার নেই।... কুন্দনের কথা আলাদা। আপনি ওকে আমার কাছে রাখতে চান না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। আমার সঙ্গে থাকলে আপনার ছেলে খারাপ হয়ে যাবে—এই ভয়ই তো পাচ্ছেন আপনি? ঠিক আছে...'

'না জগদীশ, না।' অশক্ত প্রতিবাদ জানান বাবা।

'আমার সম্পর্কে আপনার অ্যাটিচ্যুড কী, সেটা আমি ভালোভাবেই বুঝি জামাইবাবু। সেই দিনগুলোর কথা ভুলিনি; যখন 'কমিউনিস্ট' বলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন আপনি।...ঠিক আছে, কুন্দন আর এখানে থাকবে না। এই সেশনেই ওকে হস্টেলে ভরতি করিয়ে দেবো।'

'জগদীশ, তুমি মিছিমিছি রাগ করছো। আমার কথার এ অর্থ ছিল না...'

'অর্থ-টর্থ সব বুঝি জামাইবাবু। শিশু নই। কুন্দনও অবশ্য শিশু নয়।...যাকগে, সেটা আপনার ব্যাপার।...আমার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই ওতে।'

'জগদীশ, এখানে একটা হরিজন হস্টেলও আছে না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওতেই পাঠাবো কুন্দনকে?'

'তুমি যেখানে ভালো বোঝো। ও মাসে ষাট টাকা জলপানি পায় না?...ভালো হস্টেলে খরচও তো অনেক বেশি।... আমি ঠিক বুঝি না, এমনিই জেনে নিলাম...'

'আপনি যখন কিছু জানেনই না, তখন, যে জানে তার ওপর তো ভরসা রাখতে পারেন! কুন্দন, জানেন, ফার্স্ট ক্লাস ছেলে, আর এবারেও টপ হতে চলেছে। ওরকম গুণী ছেলেরা যে হস্টেলে থাকে, ওকে সেখানেই রাখা কি উচিত নয়? যাক্, এটা আমাকে ছেড়ে দিন। ভরতি করার পর সেখানকার ঠিকানা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, যাতে আপনি সরাসরি কণ্ট্যাক্ট করতে পারেন—আমার মাঝে থাকার দরকার নেই। ঠিক আছে?...আপনি নিজের ঠিকানাও আমাকে দিয়ে দেবেন।'

'এবার বল'—সবিস্তারে গোটা গল্পটা বলে জগদীশ মামা জানতে চাইলেন কুন্দনের কাছে, 'তোর ঐ মুক্তপথিক মহাপ্রাণের সঙ্গে দেখা করতে স্টেশনে যাবি, না বাদ দিবি?'

মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল কুন্দনের। পেটের মধ্যেও এক বিচিত্র মাতন চলছে সেই কখন থেকে। পাক্কা ছ'বছর পর বাবার এই আকস্মিক আবির্ভাব! তাও, এই দিনটিতেই আবির্ভূত হতে হয় তাঁকে? এই অবস্থায় স্টেশনে গেলেই হলো? ...কিন্তু, উনি তো ওর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন! কতো দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন কুন্দনকে, এই তো মাস ক'য়েক আগে! তার জবাব পর্যন্ত দেয়নি সে। কেন দেয়নি?... ঐ অমন নীরস আর মাথামুণ্ডহীন চিঠির জবাব দিতে ওর মন চায়নি..., বেশ তো, কিন্তু এখন দেখা করে নিতে দোষ কী?

'আমার সমঝদারি বলছে, এখন স্টেশনে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।' মামা বললেন, 'আমার ওপর ক্ষেপেই আছেন। তোকেও প্যাঁদাবে। দশ জনের সামনে। তার বাদে দিদি আর বাবাকেও আলফাল লিখে পাঠাবে। গুলপট্টি যখন দিয়েই ফেলেছি, তখন সেটাকেই না-হয় রক্ষা করা যাক। কি বলিস?... কিন্তু এটা একরকম নিশ্চিত জেনে রাখ, তোকে আর আমার সঙ্গে রাখবে না।... আরে, এ কী! কাঁদছিস কেন? কী হলো তোর?'

কী যে হয়েছে, কিভাবে বোঝাবে কুন্দন! মামা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, 'তুই কেন আপসেট হচ্ছিস? এ আমার-ওঁর ব্যাপার!...আরে ভাই, তুই ওঁকে নিয়ে চিন্তা করিস না।... হি ওয়াজ লুকিং কোয়াইট হেল অ্যাণ্ড হার্টি...বরং বাড়িতে যেমন দেখাতো, তার চেয়ে ভালো চেহারা হয়েছে। আর, উনি তো দেখা করবেনই তোর সাথে। দেখে নিস। তুই কী করছিস, কী পড়ছিস সমস্ত নাড়ি-নক্ষত্র খবরাখবর রাখেন। ব্যস, আমার ছোঁয়া থেকে তোকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাতে আমার কি?'

কুন্দন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় আর ওয়াশ বেসিনের দিকে ছুটে যায়। সমস্ত উগরে দেয় সে।

'আয়্যাম সো সরি মামা।'

'আরে, তাতে কি। দোষটা তোরই। প্রথম-প্রথম খাচ্ছিস, এক গ্লাসই তো যথেষ্ট ছিল! তোকে বারণ করবো-করবো করছিলাম। পরে ভাবলাম, এক্সপিরিয়েন্স হোক। এরপর থেকে তুই নিজেই বুঝেশুনে খাবি। তাই না? আচ্ছা এবার তুই শুয়ে পড়। আমি চটপট স্টেশন হয়ে আসছি। জামাইবাবুর ট্রেনের সময় হয়ে এলো বলে!'

'আমিও সঙ্গে যাবো মামা। আমি এখন পুরোপুরি ফিট্।'—কুন্দন চট্‌জল্‌দি তৈরি হয়ে নিল।

মামা-ভাগনে স্টেশনে পৌঁছে দেখলো ট্রেন এসে গেছে। প্লাটফর্ম জুড়ে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি। ওরা ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান বার তিনেক ছুটোছুটি করেও, ভিড়ে ঠাসা কম্পার্টমেণ্টগুলোর কোনটাতেও নারায়ণরাম টাম্‌টা বা তাঁর সঙ্গীদের কাউকেই দেখতে পেলো না। ইঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠলো। দুজনে অসহায় চোখে ট্রেনটাকে আস্তে-আস্তে ছেড়ে যেতে দেখে। হঠাৎ পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া একটি কম্পার্টমেণ্টের জানালা দিয়ে হাত-সহ একটি মুখ বাইরে উঁকি মেরে চিৎকার করে ডেকে উঠলো—'কুন্দন!'

কুন্দন ছুটে গেল। কিন্তু ট্রেন ততক্ষণে গতি ধরে ফেলেছে। বাবার চেহারাটা ও চিনতে পারলো না বটে, কিন্তু মনে মনে আশ্বস্ত হলো, ওটা বাবার মুখই ছিল। আর ও নিজে নাই-বা দেখতে পেলো, উনি তো ওকে দেখে নিয়েছেন!

অন্তর্কথা

আমি লোককে প্রায়ই বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা মানচিত্র থাকে এবং ঘটনা-পরম্পরাও থাকে পূর্ব-নির্ধারিত। তার একচুলও এদিক-ওদিক হবার যো নেই। মজাটা হলো, এ-কথা শুধু যে নিয়তীবাদীদের মুখেই শোনা যায়, তা নয়; ততাকথিত মোক্ষবাদীরাও একই কথা বলে থাকেন। মোদ্দা কথা, প্রতিটি জীবনের কোনো-না কোনো বিশিষ্ট ক্রম-বিন্যাস থাকে অবশ্যই।

কথাটাকে আমি সত্য বলে মানতে চাই। যদিও আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলে জীবন এক অতি অন্তঃসারশূন্য ও সঙ্গতিহীন বস্তু। তা সত্ত্বেও, কেন-যে, ভেতরে-ভেতরে এক অদ্ভুত জেদ আমার মধ্যে সক্রিয় থাকে সারাক্ষণ—এই অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতি খোঁজার জন্যে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানান বিচিত্র বস্তুর মধ্যেও একটা পদ্ধতি, একটা সঙ্গতি খুঁজে বার করার জন্যে!...

যাবতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই প্রত্যয় থেকে আমি অব্যাহতি পাই না

যে আমার এই সর্বনাশের মূলে কোনো-না-কোনো তাৎপর্য রয়েছে এবং তাকে যদি কোনো উপায়ে খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে হয়তো এই বেঁচে-থাকার একটা তাৎপর্যও পেয়ে যেতে পারি। হয়তো এও জানা যাবে যে ঐ অপ্রতীয়মান ও অধোলোকে প্রোথিত তাৎপর্যের সঙ্গে আমার অনাসক্তি বা আত্ম-বিরাগের তেমন কোনো অনিবার্য সম্পর্কও নেই। এহেন অর্থহীন জীবনের যদি সত্যিই কোনো অর্থ থেকে থাকতো তাহলে আমার অভিজ্ঞতা বা মস্তিষ্কজাত হট্টগোলে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তো না। তার সত্তা আমার চেয়ে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত ছিল, একেবারেই স্বতন্ত্র।

শ্রীমান, জানি না আমি ঠিকমতো বোঝাতে পারছি কিনা। আমি যা বলতে চাই, আর বাস্তবে যা বলতে পারি—দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। মুশকিল হলো এই যে প্রায়ই আমি নিজেই ঠিক করে উঠতে পারি না যে ঠিক-ঠিক কী বলতে চাই। আমার এক বন্ধুর কথা আপনাকে সম্ভবত ইতিমধ্যে শুনিয়েছি, যে আমাকে বলেছিল, 'তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের অভাব আছে।' এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ, জানি না আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, বছর-পাঁচেক আগে আমাকে ঠিক এই কথাগুলোই প্রায় এইভাবেই একটি মেয়েও বলেছিল। ঐ সময় অদ্ভুত লেগেছিল শুনতে, কেননা পাঁচ বছর সময়টা কম নয়। পাঁচ বছরে মানুষ কোত্থেকে কোথায় চলে যায়! আমার বিশ্বাস, ওই সময় আমি শুধু আত্মমর্যাদা কেন, আত্মবিশ্বাসেরও তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিলাম, সুতরাং মেয়েটির কথাগুলো আমার অসহ্য ঠেকেছিল। অবশ্যি, আমাকে উসকে দিতেই সে ঐ কথাগুলো বলেছিল। সে চেয়েছিল, আমি যেন আত্মতুষ্টি লাভ করে বসে না থাকি, আমি যেন আরও এগিয়ে যাই। অতএব সেদিক থেকে সে একেবারে ঠিক ছিল, যতটা ঠিক ছিল আর্থার। এমন অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি আমাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, সে-কথা ভিন্ন। হয়তো-বা সে ভেবেছিল আমাকে বিয়ে করে আমার এই আত্মমর্যাদাহীনতা ঘুচিয়ে দেবে। আর এই ভাবাটা বিশেষ অমূলকও ছিল না।

নিজের সমস্যার কথাটা আমি আপনাকে জানালাম স্যার, যে আমি যা বলতে চাই আর যা বলি—দুয়ের মধ্যে রয়েছে এক হাস্যকর ব্যবধান। আপনিই বলুন, যার মধ্যে কোনও আত্মমর্যাদাবোধই নেই, সে নিজের কথায় বিশ্বাস রাখবে কী করে? আপনি এও বোঝেন নিশ্চয়ই যে নিজেকে উপহাস করাটাও সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা বা বিনয়ের পরিচয় নয়। সেটা প্রায়ই নিজের দুরারোগ্য দুর্বলতাগুলোকে লুকোনোর জন্যেই করে থাকে অনেকে।

ক্বচিৎ মনে হয় আমার অবস্থাটা ঠিক আমাদের সেই প্রাচীন সভ্যতার মতো, যা কখনই চিরতরে বিনষ্ট হতে পারেনি এবং যা আমাদের অনন্ত জীবনযাত্রায় শতকের পর শতক অপ্রয়োজনীয় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আপনি সম্ভবত এও বোঝেন

যে সভ্যতার এই অন্ধকার কোণটি বাইরের মানুষই দেখতে পায়, ভেতরের মানুষ তো অজানাই থেকে যায়।

কালের এই সুদীর্ঘ ও অন্তহীন আস্তাকুঁড় নিয়ে হবেটাই বা কী? কোন্ উপায়ে এর সম্পূর্ণতা ধরা সম্ভব যাতে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খণ্ড-খণ্ড সম্পর্কগুলোকেও শনাক্ত করা যাবে এবং একই সঙ্গে ধরা যাবে তার ভিত্তিভূমিটিকেও?

ছ' সপ্তাহের এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কিছু-একটা উদ্বৃত্ত তো আপনার সামনে রয়েছেই। আমি নিরন্তর লিখে গেছি—নিজের সাফাই গাওয়ার সূত্রে, এবং, অবশ্যই প্রয়োজনে। খুব কম বয়েসেই বাবা আমাকে একটা দিব্যি কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন—সত্য বলার। আমি বহুবছর যন্ত্রবৎ পালন করে গেছি সেই শপথ। পরে একদিন হঠাৎ অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কেন এই সত্যপরায়ণতা? কেন? সত্যনিষ্ঠ হওয়াটা বেশি জরুরী, না সত্যভাষণ? আমাকেই দেখুন, আমার ভেতরে না-জানি কবে থেকে পরস্পর-বিরোধী দুটো সত্য ঘাপটি মেরে বসে আছে—ওরা আমাকে এগোতে দেয় না। প্রথম সত্যটি হলো, আমি গোলাম, পরাধীন, দাস ; দ্বিতীয় সত্য হলো আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমার কাছে দুটি অনুভূতিই মৌলিক ঠেকে। আমি সমস্ত-কিছু থেকে মুক্ত হতে চাই ; পরিবার থেকে, প্রতিবেশী থেকে, শহর থেকে, জাতি থেকে, সমাজ থেকে, দেশ থেকে, দুনিয়া থেকে, নিজের কাছ থেকে। আমি দাতব্য নই, সমর্পণযোগ্য নই... অথচ এই সৃষ্টি একটা ফাঁদের মতো সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে ; আর আমি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় অভিচরের মতো নিরন্তর পালিয়ে-পালিয়ে ফিরছি। এ এক অদ্ভুত চেতনা, যা ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয়টি হলো আমার দাসত্ববোধ। পরবশতা। সবসময় নিজেকে বন্ধনের মধ্যে রাখতে চাই। কিন্তু কেউ আমাকে বাঁধলে তো? আসলে আমি লোকটা যদি কোনো ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, তা হলো আমার ঐ স্বাধীনতা, যার উল্লেখ আমি একটু আগে করেছি। হ্যাঁ, এটিই আমার দ্বিতীয় ও অবিকল প্রথমটির মতোই মৌলিক চেতনা। বলা যায়, আমার মধ্যে একজন গোলামের গোলাম বসে রয়েছে, যে নিজের জন্যে বেঁচে থাকার—এমনকি নিজের জন্যে ভাবতেও গররাজি।

আপনি গোলাম বলবেন কাকে, স্যার? দাসত্বের সংজ্ঞা কী, সেটা আপনি জানাবেন আমাকে? নিজের দাসত্বকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে নিজের জীবনকে গভীরভাবে দেখবার চেষ্টা করেছি আমি—তা আপনি দেখেছেন। সম্ভবত আপনি এটাও দেখেছেন যে সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি।

কিন্তু কী-বা এসে যায় তাতে! ঐ দাসত্ববোধ নিয়েও যা করবার আমি করেছি। একে আমার মোক্ষলাভ বলবেন কি? সফল হওয়া আর কাকে বলে? পৃথিবীর সঙ্গে যুযুধানে মত্ত থেকেছি আমি, স্বেচ্ছা মতো তার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছি, দশজনকে

প্রভাবিত করেছি, ঘটনাসমূহের মুখ নিজের দিকে ঘুরিয়েছি, নিয়তিকে জয় করেছি, সবই কি অকারণে ঘটেছে?

তবু, কী কারণে, সমস্ত সংগ্রাম এবং যাবতীয় সাফল্য সত্ত্বেও এই গহ্বরে পড়ে রয়েছি আমি, আর সেই কখন থেকে চিৎকার করে-করে আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছি যে আপনি আসবেন, এসে আমার হাত ধরে আমাকে এই গর্ত থেকে উদ্ধার করবেন। কেন? এ কিসের দ্যোতক?

পাঁচ বছর পর

প্রথম-প্রথম, কুন্দনের মনে আছে, কেউ জানতে চাইলে মা এই কথাই বলতেন যে উনি এখানে থেকেই বা কী করতেন! পরদেশে নিজের মনোমতো কাজ করেন, সসম্মানে বাস করেন। মাসকাবারি খরচা পাঠান। ছেলেকে পড়ানোর নেশায় পেয়েছে ওঁকে। এই কৃচ্ছ্রসাধন তারই জন্যে। আগে ইণ্টার পাশ করুক, তারপর উঁচু ক্লাশে পড়ানোর জন্যে নিজের কাছেই ডেকে নেবেন। কুন্দন এই সাজানো কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। মনে হতো, মা এখানো পর্যন্ত লোকটির সাফাই গেয়ে চলেছেন, যিনি বাড়ির সর্বনাশ করে ছেড়েছেন।

কিন্তু মায়ের এই মিথ্যাভাষণও শেষাবধি সত্য বলে প্রমাণিত হলো যখন মাস কয়েকের মধ্যেই একদিন ডাকপিওন এসে বাবার পাঠানো মানি-অর্ডার মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। এরপর থেকে ফি মাসে টাকা আসতে থাকে। কুন্দন না মানতে চাইলেই বা, মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, নারায়ণরাম টাম্‌টা স্বয়ং সশরীরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। পুরো পাঁচ বছর, এই পাঁচটা বছর কুন্দন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের এম. এ. পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। খবরটা যেদিন প্রথম পৌঁছিলো, কেন-যেন গুজব বলে মনে হয়েছিল ওর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি গুজব ছিল না, ছিল সত্যি। অবশ্যি, পাঁচ বছরের এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে কুন্দনের কাছে এই সত্য গুজবের চেয়েও অর্থহীন ঠেকেছিল। ম্যাট্রিকের পর থেকে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে সে, আর বৃত্তি যা পেয়ে এসেছে তাতে ওর বাড়ি বা মামাদের কাছ থেকে কখনও কিছু চাওয়ার দরকার পড়েনি। বাবার মনে যে ভুল ধারণাই বাসা বেঁধে থাকুক না কেন, সে নিজের পড়াশোনার কৃতিত্ব বাবাকে দিতে রাজি নয়। আর এইরকমটা ভাবা এমন কিছু অসংগতও ছিল না।

বরং বাবার অনুপস্থিতি সব দিক থেকে তার পক্ষে ভালোই হয়েছে। অসুবিধেজনক কিছু-যদি থেকে থাকে, সেটা হলো এতা বছর পর অকস্মাৎ তাঁর দৃশ্যে অবতারণা। এখন পিতা-পুত্র সম্পর্কের তলানিটুকুও যে অবশিষ্ট নেই আর। বাবার বিরুদ্ধে

যে-প্রতিরোধ মনের মধ্যে সে জিইয়ে রেখে যতদূর এগিয়ে এসেছে সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বা আর আছে নাকি? একে-একে সে যাবতীয় অভ্যেস, সংস্কার ও চিন্তাধারা পাল্টে নিয়েছে যেগুলো সে তার বাবার সূত্রে লাভ করেছিল। উপরন্তু বাবার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদগ্র লালসায় বাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপার্শ্বিকতাসমূহ থেকেও নিজেকে সম্পূর্ণত পৃথক করে রেখেছে। ইণ্টার পাস করা পর্যন্ত গত্যন্তর ছিল না যদি বা, কিন্তু পরে কসবা ছাড়ার পর তিন বছর বাড়িমুখো হয়নি। মা বা ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করতেও যায়নি। ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা নিছক ফরম্যাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ পরিবেশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত রাখা যেন স্বীয় অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অস্তিত্বের প্রশ্নেই নয়, ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্যেও। এই ব্যক্তি স্বয়ং তার নির্মিতি। তার ধারণা, এতে কোনো বাহ্যিক যোগের প্রভাব নেই। সে পূর্ণত স্বনির্ভর। পরে কোনো ব্যাপারে কারও পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি সে।

তার পরিশ্রম ক্রমশ তাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ইণ্টার আর বি.এ-তে ফার্স্ট তো সে হয়েই ছিল, এম-এ-তেও মেরিট লিস্টে তার নাম ছিল সবার শীর্ষে।

এম এ-র রেজাল্ট যেদিন বেরলো, সেদিন হঠাৎই বাড়ির জন্য উতলা হয়ে ওঠে সে। বন্ধু-বান্ধবের অভাব তখন আর নেই বটে, কিন্তু এতো বড়ো অ্যাচিভমেণ্টের আনন্দ নিছক বন্ধুদের বা মামাদের সঙ্গে ভাগ করে সে তৃপ্তি পায়নি। তাতে বাড়ির লোকেদের অংশীদার করাটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিজের এহেন ভাবাবেগের কাছে সে ঋজু হয়ে পড়ে এবং পরের দিনই অনন্তপুর রওনা দেয়। তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকছিল যে গত চার বছরে মাত্র একবারই সে বাড়ি গেছে, বাবার প্রত্যাগমনের খবর পেয়ে।... কী যে বাজে কেটেছিল দিনগুলো..., কোনো উপায়ে দিন সাতেক মাত্র থেকে, পড়াশোনার ছুতো করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল।

নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে বা পড়তে-পড়তে কুন্দন আড়চোখে লক্ষ্য করতো বাবা ওর দরজার কাছাকাছি এসেও ভেতরে ঢুকতেন না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন ছেলের দিকে। কিছু যেন বলতে চাইতেন, যেন ওর অনুমতির অপেক্ষা করছেন। না, কুন্দন ওঁর দিকে চেয়েও দেখতো না—দেখেও না-দেখার ভাণ করে পড়ে থাকতো সে। ওই ক'টা মুহূর্ত ওর কাছে মনে হতো এক যুগ। তারপর একসময় বাবার ফিরে যাবার পদশব্দ কানে আসতো ওর। ও স্বস্তি বোধ করতো।

একদিন মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দেখতে পেল, বাবা ওর বিছানার ওপর বসে ওর বইগুলো উল্টোপাল্টে দেখছেন। কেমন-যেন মনে হলো, ও পালিয়ে এলো। ব্যাপারটা মোটেও ভালো ঠেকেনি ওর। বাবাও ওকে দেখে ফেলেছিলেন, তবু তেমনি ওখানে বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এসে দেখলো

বাবা আর ওর ঘরে নেই, ও আশ্বস্ত বোধ করলো। কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠলো। ওর বইপত্রের পাশে গোটাপাঁচেক মোটা-মোটা খাতা দেখতে পেলো ও।

আচ্ছা, এই ব্যাপার! বাবার অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিতে লেখা পাঁচ-পাঁচটি ডায়েরি এইজন্যেই চুপিচুপি এসেছিলেন উনি? কুন্দনের মনে কৌতূহলও হলো, আবার একই সঙ্গে এক অদ্ভূত ধরনের বিতৃষ্ণায় ভরে গেল ওর মন। ডায়েরিগুলো সামান্য উল্টেপাল্টে দেখার চেষ্টাও করলো সে। কিন্তু মনে এই কথা উদয় হতেই, যে, বাবা এই ছুতোয় ওর সঙ্গে কথা বলতে চান, ও নিরস্ত হয়ে পড়লো। দুপুরের খাওয়ার পর রোজকার মতো বাবা বাজারের দিকে বেরিয়ে পড়তেই ডায়েরিগুলো রেখে দিয়ে এলো।

সেদিনটা গেল। পরের দিনও...কুন্দন মনে-মনে আশঙ্কা করেছিল বাবা কিছু বলবেন, জিজ্ঞেস করবেন কিছু। কিন্তু বাবা এদিন আর ফিরেও তাকালেন না। কিছুই যেন হয়নি, ভাবখানা এই। যেন কুন্দনের কাছে ওঁর কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো নালিশও নেই। স্ববাবতই কুন্দন এতে খানিকটা অবাক হয়, আবার জ্বলুনিও হয় ওর।

এরপর আর কোনোদিন বাবা কুন্দনের ঘরে ঢোকেনি। বাবাকে আর কোনোদিন কুন্দন নিজের ঘরে পায়নি।

ভাগীরথী ঃ পুনশ্চ

কুন্দন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসে কাটানো সত্ত্বেও প্রত্যাবর্তনের পর নারায়ণরাম টাম্‌টার মধ্যে তেমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আগের তুলনায় বাইরে কাটাচ্ছেন একটু বেশি, সে কথা ভিন্ন। বাড়ির মধ্যেও আচরণ একটু অন্যরকম ঠেকছে। কথা বলছেন কম, হাসি-ঠাট্টাও করছেন কম—এ-বাদে সমস্ত আগের মতোই আছে। ওঁর কাছে আগে কুন্দনের যে ভূমিকা ছিল, সেই স্থানটি এখন ওর ভাই রাজেন দখল করে নিয়েছে। রামকাকার বাড়িতে আবার আগের মতোই মজলিশ বসতে শুরু করেছে। এখন যেহেতু দাদু নেই—সেখানে সুরেন্দ্র মামার কর্তৃত্ব—সুতরাং ঐ হাভেলিও চলে যান যখন-তখন। সেখানেও, রাজেনের মতে, ভালোই প্রতাপ ওঁর। রাজেনের মতে, কেননা বাবার সঙ্গে কুন্দনের আর সরাসরি কোনো কথা হয় না, দুজনের মধ্যে এখন ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। বাবার সম্পর্কে ওর যেমন কোনো উৎসাহ নেই, বাবারও ওকে ছাড়া কোনো কাজ আটকায় না।

কুন্দনের একরোখামি দেখে মা-র রাগ হয়। প্রায়ই বলেন, 'ওঁর সামনে বসিস

না কেন? কত উৎকণ্ঠা আর আশা নিয়ে তোর পথ চেয়ে বসেছিলেন! আরে. রাজ্যের ভোগান্তি ভুগেছি আমি, তা'র ওঁর সঙ্গে শত্রুতা করে বসলি তুই? যেমনই হোন, তোর বাবা। মায়া-মমতা না থাকলে ফিরে আসতেন? সমস্ত তীর্থ ঘুরে ফিরেছেন। হাত-পা গুটিয়ে বসেও থাকেন নি—বাড়ির খরচাপাতি কে চালিয়েছে শুনি? ঈশ্বরই ওঁর মতি পাল্টে দিয়েছেন, ওঁকে বাড়ি ফেরার সুমতি দিয়েছেন। তোর সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্যে ছটফট করেন। তোর কী ক্ষতি করেছেন? যা ক্ষতি করবার নিজেরই করেছেন।... আর এমন কী-বা ক্ষতি করেছেন? তোর নিজের জীবনটা নিয়ে তো আর ভাবতেই হবে না। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন। নিজের নিজের ভাগ্য। কতো কী দেখলেন উনি! স্বর্গ-নরক দুই দেখেছেন...'

'তা আমি কী করবো?' নিজেকে সযত রেখে জবাব দেয় কুন্দন, 'স্বর্গ-নরক দেখে বেড়াবার দিব্যি দিয়েছিল কে? ছেলেমেয়েদের বেওয়ারিস ফেলে রেখে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কে বলেছিল? তাতে আমরা কী পেলাম? দুনিয়ার অপবাদ জুটলো, সেটা আলাদা। কথা বলার কথা বলছো, ওঁর সামনে যেতেও মন চায় না আমার। তোমার কী? তুমি শুধুশুধু জেদ করো কেন? জানি, আমি কথা বললেই ঝগড়া বাধবে। সেটা তোমার ভালো লাগবে?'

'তুই যা ভালো বুঝিস, কর গে যা।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'তোর এই একগুঁয়েমি আমার একদম ভালো লাগে না।'

দিন কেটে যায়। কুন্দন মাঝে একবার লখনউ গিয়েছিল, ওর প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে। বেশ কয়েক বছর উনি আমেরিকায় ছিলেন, আবার ফিরে যাচ্ছেন। কুন্দনকে এক-আধ বছর এখানকার কোনো কলেজে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরামর্শ দিলেন, তারপর উনি নিজেই ওকে বিদেশে ডেকে নেবেন, রিসার্চ ফেলোসিপ জুটিয়ে দেবেন। শুধু তাই নয়, জার্মানির এক নামকরা বিদ্বানের কাছে কুন্দনের হয়ে সুপারিশও জানিয়ে রেখেছেন উনি। কুন্দনের চোখের সামনে এখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার, ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্নের জাল ঝলমল করছে। এক-দু বছরের মধ্যে ওর বিদেশ-যাত্রা সুনিশ্চিত।

এক সন্ধ্যায় দীর্ঘ ঘোরাঘুরি করে ফিরছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। হ্যাঁ, ঠিকই, ভাগীরথীর গলা। কী-এক অবচেতন-প্রেরণার বশবর্তী হয়ে রামকাকার পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

ভাগীরথী বাড়িতে একা। বারান্দায় পায়চারি করছিল। কুন্দনকে এতো কাছ থেকে পেরিয়ে যেতে দেখে সে থাকতে পারেনি, ডেকে উঠেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে কুন্দনের মনে হলো, ভাগীরথী নিজের দুঃসাহস দেখে নিজেই একটু ব্রীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যেন!

কতো বছর পরে হঠাৎ-হঠাৎই ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কিছুটা বিব্রত, কিছুটা সন্ত্রস্ত। দুজনের কেউই ভাবতে পারছিল না কীভাবে, কোত্থেকে শুরু করা যায়! এই অসম্ভব অপ্রতিরোধ্য মৌনতাকে কোনো শব্দ দিয়ে ভাঙা সম্ভব!

'রামকাকা কোথায়?' কিছু না পেয়ে এটাই জানতে চাইলো কুন্দন।

ভাগীরথী ঠোঁট না খুলে হাসে। স্মিত হাসি। ঐ অসতর্ক হাসি আর রক্তাভ ঠোঁটের পাউটিং কুন্দনকে একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল কি? ও যেন ধরা পড়ে গেছে। ও তো জানতে চাইলেই পারতো, 'ভগীরথী, বল, কেমন আছিস?'...সহসা ও আবিষ্কার করলো ওর বুকের ধকধকানি অসম্ভব বেড়ে গেছে, আর, ও স্বাভাবিক হতে পারছে না।...

'আপনি আজকাল আমাদের বাড়িতে আসেন না কেন?'

কুন্দনের বুকের গতি কম হবে কোথায়, আরো বেড়ে গেল। ভাগীরথীর 'আপনি' শুনে একটু খট্‌কা লাগে ঠিকই, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা ভালো-লাগাও টের পায় সে। সে যে 'বড়ো' হয়ে উঠেছে, এ তারই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি।

কিন্তু, একটু আগে ও আগের মতোই 'কুন্দন' বলে ডেকেছিল না? কী অদ্ভুত মিষ্টি আর গভীর ছিল সেই ডাক।—যাতে ছিল ওর সমস্ত অস্তিত্বের মাখামাখি। আর এখন এই 'আপনি'! খুব কাছে টেনে হঠাৎ যেন দূরে ঠেলে দিলো এই সম্বোধন ; কেন-জানি মনে হলো কুন্দনের।

এবং হঠাৎই সংবিৎ ফিরে পায় সে। ইস্, এখনও ভাগীরথীর প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে। ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললো, 'আমি এখানে ছিলাম কোথায় ভাগীরথী?'

'কেন?' চোখের মধ্যে চোখ ঢেলে ভাগীরথী বললো, 'পনেরো দিন ধরে তো এখানেই আছেন। অন্তত মিষ্টি খাইয়ে যেতে পারতেন! ইণ্টারে ফার্স্ট হওয়ার সময় মনে আছে, কাকিমা কতো কী বানিয়েছিলেন! এখন বি এ. এম এ সব হয়ে গেল, সোনার মেডেলও পেলেন। অথচ কিছুই...'

কুন্দন মনে-মনে হাসে। এরই মধ্যে ভাগী সব জেনে ফেলেছে! তার মানে, আগের সেই টানটা এখনও রয়ে গেছে। সে হঠাৎই ঠ্যাটা হয়ে উঠলো, 'বাড়িতে চেয়ার-টেয়ার নেই নাকি? কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে শুনি?...' বলার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ খেয়াল হলো, সে নিজেই এবার অন্য সম্বোধন করে ফেলেছে, 'তুমি' বলে ফেলেছে। এ ছাড়া একটু অনুতাপও হলো ওর,...কতো বার তো এই সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়েছে!...আজও কেন বসে পড়লো না আগের মতো?...চেয়ার চাইতে গেল কেন?...কিন্তু আর ভেবেই বা কী হবে! ভাগীরথী এরই মধ্যে দুটো চেয়ার টেনে এনে পেতে দিয়েছে। দুজনেই বসে পড়লো, মুখোমুখি।

কতবছর পর আবার সেই দৃশ্য!... দুনাগিরির পেছনে সূর্যটা সেই আগের মতোই লাট খেয়েছে। সোনালি ঝালর সেই আগের মতোই ঝলমল করছে। পাখিদের

কলরবে আগের মতোই গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে সাঁঝের বেলাটা। আগের মতোই নিচের সড়ক থেকে একটা-দুটো গাড়ি পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর বাতাসে ভেসে আসা পথচারীদের টুকরো-টুকরো কথাবার্তা...সব আগের মতো।

কুন্দন হঠাৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, ভাগীরথী কতো সুন্দর! আগে কখনও এরকম সুন্দর মনে হয়েছে ওকে? হ্যাঁ। ভাগী তো আগাগোড়াই এরকম, এমনি সুন্দর। কিন্তু...কিন্তু কী?

'কী ভাবছো কুন্দন?' ভাগীরথী জানতে চায়। কুন্দন দেখলো, এক অদ্ভুত মদির দৃষ্টি নিয়ে ভাগীরথী ওর দিকে চেয়ে আছে, অপলক। ওই অতিবিলোল দৃষ্টিবর্ষণের মোকাবিলা করতে সে অপারগ। সে চোখ নামিয়ে নিলো। তারপর হঠাৎ কী হলো, সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালো সে, অতি ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ভাগীরথীর দিকে, তারপর আচমকা তার পায়ের কাছে বসে পড়লো, এবং তার অভিনিবেশযোগ্য দুটি কোমল বাহুই গ্রহণ করলো নিজের হাতের মুঠোয়। আহা, এই প্রথম একটি আনকোরা কুমারী-হাতের স্পর্শ। আপত্তি ছিল যদি-বা, কিন্তু মুক্তির ছটফটানি? উহুঁ। হঠাৎ তার মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। সে অস্ফুটে ডেকে উঠলো, 'ভাগীরথী!...ভাগীরথী!'

'কী?' হাত ছাড়ানোর চেষ্টা মাত্র না করে অতি ধীর গলায় বললো ভাগীরথী। কুন্দনের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরতে চায় না, তার কণ্ঠা শুকিয়ে কাঠ। কেমন-যেন অবশ হয়ে পড়ছে সে। তার মাথা নুয়ে পড়তে থাকে ক্রমশ। ভাগীরথীর দুই হাঁটুর মাঝখানে নিজের মুখ গুঁজে দেয় সে। ভাগীরথী তেমনি পূর্ববৎ শান্ত আর স্থির বসে আছে। আলতো হাতে কুন্দনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সে, 'এই, কুন্দন, কী হলো তোমার?'

কুন্দন ক্রমশই আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার মনে হলো, এ স্বপ্ন। এমনটা তো স্বপ্নেই ঘটতে পারে। কিংবা, স্বপ্নেও না। আগে কখনও ভাগীরথীকে এতো কাছে পায়নি সে। মনে হয়েছে, সে কখনই কাছে আসবে না, অলভ্যই থেকে যাবে চিরদিন।

এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ! হঠাৎ যদি ভাগীরথী ওকে দেখতে না পেতো?... কতবারই তো সাঁঝের আলো-আঁধারিতে এই বাড়ির পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেছে সে। কখনও এমনি হয়নি। আগে কখনও এভাবে ডেকেছে ও? কেমন উল্লসিত আর অধীর আবেগ ছিল সেই ডাকে—'কুন্দন!'...

তার কেন-জানি মনে হচ্ছে, সময় আজ হঠাৎ থম্ মেরে গেছে—কয়েক বছর আগে ফিরে গেছে সে।...সত্যি, কিছু বদলায়নি। ভাগীরথী কতো বড়ো হয়ে উঠেছে! কিন্তু সেও বদলায়নি একফোঁটা! ...আর কুন্দন, নিজেও বদলেছে নাকি?...

কুন্দন হঠাৎ চমকে ওঠে। এ কেমন ভাবাবেগে বয়ে চলেছে সে! অজান্তে যেন নির্জ্ঞানেই ক্রমশ ঢুকে পড়েছে সে এক অদ্ভুত ভালো-লাগা অনুভূতির জগতে!..

ভাগীরথীর মধ্যে একটা জাদু টের পায় সে! মন চায় এভাবেই সারাটা জীবন ভাগীরথীর কাছে বসে থাকে সে!...ওর কোলে মাথা রেখে...আর ওর হাতের কোমল স্পর্শ অনুভব করে যাবে শুধু...

'তুমি আজকাল বাবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছো কেন?'—ভাগীরথীর গলা ভেসে আসে ওর কানে, 'জানো, উনি কতো দুঃখ পেয়েছেন!'

কথা বলার ইচ্ছে করছিল না কুন্দনের। কিন্তু ভাগীরথীর কথা শুনতে ভালো লাগছিল।... ওর কোমল হাতের মতো ওর গলার মধুর আওয়াজও ওকে এক অদ্ভুত সুখানুভূতি দিচ্ছে। ও কি জিজ্ঞেস করছে, তা নিয়ে ভাবলো না সে। কিছু বললে যদি সেই জাদু ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে চুপ করে তেমনি বসে থাকে। ভাগী কি ওর মনের কথা বুঝতে পারছে?

'বাবা বলছিলেন, তুমি বিলেত যেতে চাও। আরও পড়াশোনা করতে। সেটা কি সত্যি?'

'হুঁ...ভাগী!' কুন্দন মৃদু গলায় জবাব দিলো, 'এখানে যে কোনো স্কোপ নেই।'

'স্কোপ!' ভাগীরথীর সামান্য ধাঁধা লাগে, 'স্কোপ আবার কী কুন্দন?'

'স্কোপ—মানে স্কোপ।' কুন্দন ভেবে পায় না, ভাগীরথীকে কিভাবে বোঝাবে। ওর হাসি পেল। ভাগীরথী কতো সরল! কতো মিস্টি মেয়ে!

'তুমি তো তাহলে আর ফিরবে না? ওখানেই থাকবে, বিদেশে?' ভাগীরথী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

'জানি না।' কুন্দন বললো। অদ্ভুত সুড়সুড়ি লাগছিল ওর। মাথা তুলে ভাগীরথীর মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'যেখানেই থাকি না কেন, তাতে কার কি এসে-যায়?...' বলে সে আবার চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো।

ইচ্ছে করেই সে নিজের কণ্ঠস্বরে আত্মকরুণা ফুটিয়ে তুলেছিল। দেখলো, ভাগীর মুখ উদাস আর থমথমে হয়ে উঠেছে। যেন গভীর-কিছু ভাবছে। হয়তো কুন্দনের কথার জবাব খুঁজছে। কিংবা জবাব দেওয়া আদৌ ঠিক হবে কিনা, তাই ভাবছে।

'তুমিই বলো'—কুন্দন হঠাৎ কোত্থেকে সাহস জুটিয়ে ফেলল, দুম্ করে বলে বসলো, 'তুমি আমার সাথী হতে রাজি আছো?'

তার স্থির মর্মভেদী দৃষ্টি সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ে ভাগীরথীর মুখে, ভাগী তবু অবিব্রত। অবোধ শিশুর মতো নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে সে। যেন চিন্তা করার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে।

'একটা কথা বলবো ভাগীরথী? কিছু মনে করবে না তো?'

'কী?' ভাগীরথীর মুখ দিয়ে বেরলো। কুন্দনের কানে একটু-যেন ভয়াতুর ঠেকলো তার গলা।

'তুমি কি...তুমি কি আমাকে চাও?... আমাকে বিয়ে করতে পারো?'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে কুন্দনের মনে হলো কোনো পাহাড়ের অত্যুগ্র চূড়া থেকে অতলে ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে সে এবং এখন সে খণ্ড-খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ভাগীরথীও কেমন-যেন, মূর্তিবৎ, স্থির ও নিশ্চল হয়ে পড়েছে। এ কী হয়ে গেল! এ কী করে ফেললো কুন্দন? এতো অধৈর্য হয়ে ওঠার প্রয়োজন কি ছিল?...কুন্দনের মনে হলো মাটি ফুঁড়ে সে সেঁদিয়ে যাবে পাতালে। ছি ছি, কী ভাবছে ভাগীরথী!...কিন্তু... নিজেও কি সে জানতো? আর ক'টা দিন পরেই তো এখান থেকে চলে যাবে, তারপর কে-জানে কবে ফিরবে। ভাগীরথীরও যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। এ তো নিছক সংযোগ যে ও এখনও অনূঢ়া রয়ে গেছে।...

'বাবা এসে গেছেন।'...ভাগীরথীর গলায় হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে দারুণ ভাবে চমকে উঠলো কুন্দন। সে দেখলো, নিচের দেউড়ি থেকে উঠে আসছেন বাবা আর রামকাকা।

কুন্দনের গলা শুকিয়ে কাঠ। এখন কী হবে? ভাগীরথী বলেই নি যে বাবা এখানেই এসেছেন আর মন্দিরের দিকে গেছেন, এখুনি ফিরবেন। ও তো এমন ভাণ করছে যেন ভয়ের কিছুই নেই। আরে...আজই তো মঙ্গলবার! আগে মনে পড়েনি কেন?

'কুন্দন যে!' দেখা-মাত্র রামকাকা একটা চাপড় মারেন ওর পিঠে, 'আজ হঠাৎ রাস্তা ভুল করে নাকি?'

'আজ্ঞে...' প্রায় তোতলামির মতো গলা হয় ওর, 'অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। ভাবলাম আজই দেখা করে আসি।'

'বেশ করেছিস, বেশ ভালো করেছিস।' রামকাকা বললেন, 'কিন্তু তোরা এই অন্ধকারে বসে কী করছিস? আয়, ভেতরে আয়। চা-টা দিয়েছিস ভাগী?'

রান্নাঘর থেকে ভাগীরথীর ঠুং-ঠাং ভেসে এলো। কুন্দন যেন এখনও স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। সমস্ত কিছুকে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর। এ সব স্বপ্নেরই এক একটি খণ্ড-দৃশ্য যেন! সে সজোরে চোখ ডলে। রামকাকা ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'শুনলাম নাকি বিদেশে যাচ্ছিস?'

'আজ্ঞে'—কুন্দন যেন তখনও বাস্তবে ফিরতে পারেনি, নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা করে বললো, 'এখানে কোনো স্কোপও যে নেই।'

'হুঁঃ!' নারায়ণরাম টাম্‌টা যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন—'রমদা, ওকে জিজ্ঞেস করো, বিদেশে গিয়ে ও কী করবে? স্বদেশকে ওর জানা হয়ে গেছে?'

কুন্দন নিরুত্তর থাকে। বাড়িতে রেষারেষি তো আছেই, এখানেও ছাড়ান নেই? রামকাকার বাড়িতে মওকা পেয়েছেন, ছাড়বেন কেন? বললেন, 'একটা ছেলের পড়াশোনার পেছনে এই গরীব দেশের কতো খরচা, বিনিময়ে দেশ কী পায়?

সমস্ত বুদ্ধিমান লোকই যদি এইভাবে বিদেশে পালায়, তাহলে দেশের থাকবেটা কী শুনি? আমি বলছি রমদা, নিজের দেশ আর দেশবাসীদের সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে কি? আরে, এতো বড়ো দেশ, স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা বিশ্ব। কতো কি দেখবে, কতো কি করার রয়েছে এখানে! কয়েক জন্মেও সম্পূর্ণ হবার নয়। পড়াশোনা করেছো যখন, তখন ভাবো তা দিয়ে কী করলে দেশের মঙ্গল হবে, কী উপায়ে দেশবাসীর সেবা করা যায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা? বিদেশ যাবো। বিদেশ গিয়ে কচু হবে! আরে, নিজের দেশেই যা-কিছু পড়েছিস, তা কি দেশী? সবই তো বিদেশী। বিদেশে গিয়েই বা কোন পাহাড়টা জয় করবি শুনি? সরল সাদা-সিধে দেশবাসীদের ঠকাতে, তাদেরকে বোকা-বানাবার হয়তো-কিছু টেকনিক শিখে ফিরবি। আমি ভুল বলছি রমদা?'

'ঠিক আছে ভাই,'—রামকাকা বেশ উভয়সংকটে পড়েছেন বোঝা যায়, আমতা-আমতা করে বললেন, 'আসা-মাত্র বক্তৃতা দেওয়া শুরু করে দিলি তুই? এইজন্যেই তো বেচারি তোকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। নতুন জেনারেশনকে আগে বোঝার চেষ্টা কর, ওদের মনের কথা জান, কী ওদের সমস্যা, কী ওদের আকাঙ্ক্ষা! তা না করে নিজের বুকনি শুনিয়ে মরছিস। এভাবে হয় নাকি! এভাবে ডায়ালগ গড়ে উঠবে ভাবছিস?'

'হুঁ!' বাবা মাথা ঝাঁকানি দেন। কুন্দনের দিকে তর্জনী তুলে ধরে বলেন, 'ও ভাবছে ফার্স্ট ক্লাশ এম এ করে এসেছে বলে বৃহস্পতি ব'নে যাবে? ওর চোখে আমি যেন আস্ত একখানা বোকাপাঁঠা।'

বাবার শেষ কথাটায় রামকাকা হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'তুই মিছিমিছি রাগ করছিস, নারান। কার রাগ কার সামনে পাড়ছিস? আরে ভাই, বৃহস্পতি তো তুই নিজে। এখন তোর ছেলে যদি পাতালপুরিতেই গিয়ে কিছু শিখে আসতে চায়, তুই মেনে নিতে পারছিস না কেন? কে জানে, ওখানে গিয়েও যে একজন শুক্রাচার্য জুটিয়ে নেবে না তা কে বলতে পারে? কচের মতো তার পেট চিরে সঞ্জীবনী বিদ্যাও তো নিয়ে আসতে পারে! আরে, দেবতাদেরও যখন আসুর-বিদ্যার প্রয়োজন হতে পারে, আর তার জন্যে কতো কী-না ছলচাতুরি, তো ভায়া, মানুষ তো কোন্-ছার! তুই ভালোবেসে আর আশির্বাদ দিয়ে একে বিদায় কর।'

নারায়ণরাম টাম্‌টা এই প্রথম সত্যিসত্যিই হতভম্ব হন। ক্রোধ মেশানো একটা চাপা হাসি ফুটে ওঠে ওঁর ঠোঁটে, তাকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে বললেন, 'হুঁ! আমার আশির্বাদের অপেক্ষায় বসে রয়েছে কে? পনেরো দিন হলো এসেছে একবারও জানতে চেয়েছে, বাবা তুমি ছ'বছর বাড়ির বাইরে ছিলে কেন? এই ছ'বছরে তুমি কী কী করেছো? না। উল্টে আমারই সঙ্গে উনি কথা বন্ধ করে দিয়েছেন, আমি যেন ওনার পা ধরে সাধাসাধি করি। ওনার খোসামোদ করি। আরে, যে-বিদ্যা

বিনয় শেখায় না সেই বিদ্যায় লাভ কী? তা সঞ্জীবনী হোক আর যাই হোক, আমার কাছে তার কোনো দাম নেই।'

'তুই নিজের পুঁথিপত্র দেখিয়েছিস কুন্দনকে?' রামকাকা প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলেন।

'একে?'—বাবা তালু উল্টে দেন, 'সময় আছে দেখার? একদিন এমনি হাসির ছলে বললাম, যে ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ডি-লিট্ করে ফিরেছি, তার কাছে তোর লখনউ কী এমন! শুনে ক্ষেপে গেল। বললো, তোমার ডি-লিট্ নিয়ে তুমিই থাকো। তারপর থেকে আমি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। একদিন, এমনই ওর বইপত্র উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। দেখি যে সমস্তই ইংরেজিতে। মনে হলো বলি, আরে নিজের সমাজটাকে নিজের ভাষায় জান আগে, তারপর তো সমাজশাস্ত্রী হবি! অ্যাত্তোসব বই রটে কী হবে?'

'দ্যাখো, যা তুমি বোঝো না, তা নিয়ে কিছু বোলো না।' কুন্দন আর চুপ করে থাকতে পারে না।

'নাও। শুনলে তো রমদা? নারায়ণ নিজের সমাজটাকে বোঝে না, আর ইনি পেটে থাকতেই সমস্ত বুঝে ফেলেছেন! এখন আমাকে পড়তে হবে ওনার সমাজশাস্ত্র। উঃ অসহ্য!' বাবা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

রমদা সজোরে হেসে উঠলেন। 'তোরা দেখছি দুজনেই ভয়ানক জেদি। কেউ কম যাস না। আরে বাবা, ওর কাছে যদি থিওরি আছে, তোর কাছে রয়েছে প্র্যাকটিক্যাল। এর চেয়ে ভালো মেল আর কী হতে পারে? তুই যা জানিস, ও তা জানে না। আবার ও যা জানে, তুই তা জানিস না। কিন্তু মেল হবেটা কেমন করে? তোর তো দৃষ্টি পড়ে আছে একশো বছর ওধারে। জমানা বদলে গেছে নারায়ণরাম, দেশের ভাগ্য এখন আর তোর বিনোবাজীর হাতে পাল্টাবার নয়। কুন্দনের মতো নতুন ব্রেন দিয়েই তাকে পাল্টানো যেতে পারে। তুই ছেলেমানুষের মতো বলছিস কেন? তোদের এতো-এতোসব নেতা বিলেত-ফেরৎ নয় কি? গান্ধীজী যদি বিলেত গিয়ে না পাল্টান, তোর ছেলে পাল্টে যাবে? আরে ভাই, এ-যুগের যতো বিদ্যে, যতো বিভূতি, সব বিলেতের প্রোডাক্ট। তোরা দেখছি এসব চিন্তা করে ভারতবর্ষকে এক নতুন রকমের ছুঁৎমার্গে নিয়ে গিয়ে কোতল করে বসবি। এর চেয়ে এটাই ভালো নয় কি যে ওদের জ্ঞান লুটেপুটে খা আর নিজের দেশটাকে উদ্ধার কর? ওরা যেভাবে তোদেরকে লুটেছে তেমনি তোরাও ওদেরকে লুটে খা। উন্নতির পথ তো এটাই।'

বাবা নিবিষ্টচিত্তে রামকাকার এক-একটি কথা শুনছিলেন। বললেন, 'সেসব ঠিক আছে রমদা, কিন্তু আমার মনে এইসব পড়াশোনা-জানা লোকদেরকে নিয়ে, কেন-জানি, বেশ নৈরাশ্য রয়েছে। একের পর এক গ্রাম উৎখাত হয়ে চলেছে, তালিমের

নামে যা গেলানো হচ্ছে তা কোনো কাজেরই নয়। যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারাই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। সরকারের কাছে নালিশ জানানো বৃথা। আমাদের রাজনীতির চেয়ে লোকনীতিকে বড়ো করে দেখতে হবে। নইলে তুমি যা বললে, ঐ বিদেশী বিদ্যাকে যতোই লুটেপুটে খাও, তাতে অন্ধকারের সাম্রাজ্যই হবে স্ফীত। আমি দেশের প্রায় সমস্ত আশ্রমে ঘুরেছি। বড়ো-বড়ো সন্ত-মহারাজদের সঙ্গে মিশেছি...'

'বাহ্।' কুন্দন এবারও আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো, 'অদ্ভুত প্রেসক্রিপশান তোমার! একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে সাধু-সন্নেসিদের কী কাজ? বাবা, তুমি যে কী-সব আলফাল বলো না।'...

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বাবা এবার এদিকে মুখ ফেরালেন, 'আলফাল তো তোর মনে হবেই। তোর মতে, সঠিক উপায় হলো, জনা-কয়েক ইংরেজি-জানা লোক, যারা না এদিককার না ওদিককার, তারাই দেশের লাগাম ধরে নাচাক আর আসল জনগণ যাক জাহান্নামে! আমি তো বলি রমদা, বছর দশেকের জন্যে একটাও কলেজ, একটাও বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দেওয়া উচিত নয়। আগে থাকতেই যতগুলো রয়েছে, প্রয়োজনের বেশিই রয়েছে। সকলকে আগে সাক্ষর ক'রে তোলো, সকলকে মৌলিক শিক্ষা দাও, তারপর গণতন্ত্র-টনতন্ত্রের কথা ভেবো। গ্রামের ছেলেদের গ্রামের কাজেই লাগাও, শহরের কাদা মাখতে ওদের এনো না। এই যে বিলেতি সংস্কৃতির গরল চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সময় থাকতে একে যদি বাধা না দাও, তাহলে এই দেশ আর বাসোপযোগী থাকবে না। আমরা আমাদের নিজেদের মানুষগুলোর প্রতি যে অন্যায় শোষণ করে এসেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হোক আগে।—তারপর বাদবাকি ব্যাপার আপনাআপনি হয়ে যাবে। আমি তো সাধু-মহারাজদের কাছে এমন পর্যন্ত প্রার্থনা জানিয়েছি, এই জাতপাতের বিষ আপনারাই বিনষ্ট করতে পারেন, আর, এ আপনাদের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত।'

'কথাগুলো তুই ঠিকই বলেছিস নারান, কিন্তু এখন সংস্কারকের যুগ আর নেই। এখন তো সরকারই সর্বশক্তিমান। সমাজবাদ ছাড়া মুক্তির অন্য আর কোনো পথ নেই। তোদের গান্ধীর ট্রাস্টিশিপের আইডিয়াটা মার খেলো কি না?'

'কে বলছে মার খেয়েছে?' বাবা রুখে দাঁড়ান।

'আরে ভাই, এতো সব দেখে-শুনে এলি। সব তো লিখেছিস তুই নিজের ঐ রেজিস্টারগুলোতে। জেনেশুনে অন্ধ সাজছিস কেন? তুইই তো বলতিস জমিদারী উন্মূলন করে কিছু হবার নয়। একদিকে এক-একজনের কাছে হাজার-হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে, আর অন্যদিকে পুরুষের পর পুরুষ অন্যের জমিতে জনমজুরী খেটে মরছে! এর বিহিত হবে কী দিয়ে? নতুন করে জমি বণ্টন হওয়া উচিত কিনা?'

'তা তো হতেই হবে।' নারায়ণরাম বললেন, 'এরজন্যে দরকার হলে জোর-জবরদস্তিও করতে হবে। সেটাও সত্যাগ্রহের দাবি।'

রামকাকা সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, 'দেখছিস কুন্দন! তোর বাবার চিন্তাধারা পাল্টাচ্ছে কিনা? এবার বুঝতে পারছিস তো, এমনি-এমনি অজ্ঞাতবাসে কাটায়নি। সব পড়াশোনা করে, শিখে এসেছে। শুধুহাতে ফেরে নি।'

জবাবে একটা শুকনো-হাসি হাসলো কুন্দন, মুখে কিছু বললো না। রামকাকা আবার বললেন, 'এবার বল, যে ডক্টরেটটা হাসিল করার জন্যে তুই যাচ্ছিস, তাতে তোর বাবার কাজ এগোবে কি না?'

কুন্দন একমুহূর্ত বিব্রত বোধ করলো। আড়চোখে দেখলো, ভাগীরথী দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হঠাৎ মনে-মনে উদ্দীপিত হয়ে উঠলো, বললো, 'কথাটা হলো রামকাকা, বাবার পথ আলাদা, আমার পথ আলাদা। আমি একেবারেই নতুন একটা সাবজেক্ট বেছে নিয়েছি—অ্যানথ্রপলজি। তাতে আদিবাসী সমাজ নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় আর তাতে গোটা মানব-সমাজের উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন আলো পাওয়া যায়।'

'কিন্তু তুই যে বলছিলি'—বাবা মাঝপথে বাধা দিলেন, 'এখানে কোনো স্কোপই নেই? অথচ তোর যা সাবজেক্ট, তার যতো স্কোপ এখানে রয়েছে, ততোটা বিশ্বে আর কোথাও নেই। এতো রকমের উপজাতি আর কোথায়? গোটা মানবজাতির এ হলো পরীক্ষাগার, বুঝেছিস? একে বাদ দিয়ে'...

'সে ঠিক আছে,'—কুন্দনের গলায় শ্লেষ ফুটে উঠলো, 'কিন্তু আমরা আমাদের আদিবাসীদের সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি, সব বিদেশীদের মাধ্যমেই জেনেছি। মিশনারিরা ওদের মাঝখানে কাজ না করলে তুমি জানতেও পারতে না যে এখানে আদিবাসীরাও বাস করে।'

'মিশনারিদের আমি ঘৃণা করি।' বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, 'ওদের কাজকর্ম আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওদের কথা আর বলিস না তুই।'

'ঘৃণা করে কী হবে বাবা?' কুন্দন বললো, 'সমস্ত ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞান তো ওরাই সংগ্রহ করেছে। বেদ থেকে শুরু করে গোষ্ঠী পর্যন্ত ওদের মাধ্যমেই আলোকপাত ঘটেছে। তোমার হিন্দুদের অবদান কী শুনি? ছাই। তুমি তো আদিবাসীদের চেয়েও ন্যক্কারজনক। এমন কি নিজের সম্পর্কে, নিজের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারেও জিরো।'

'তুইই রাখ না সেই অবদান!' রামকাকা বললেন, 'তুই আছিস কী করতে?'

'রাখবো। কিন্তু তার আগে যেসব লেটেস্ট নলেজ পাওয়া গেছে, আদিবাসীদের মাঝে কাজ করার যে-সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, সেসব তো জানতে

হবে। সৌখিন কাজ করে আজকাল কিছু হয় না। এখন চাই বিশেষজ্ঞতা, তারই দাম রয়েছে। বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্যেই বিদেশে যেতে চাই।'

'এ তো ভালো কথা।' রামকাকা বেশ মনোযোগ সহকারে কুন্দনের কথাগুলো শুনছিলেন। বললেন, 'কি নারান, আমার ধারণা আমাদের জেলাতেই কেন, গোটা প্রদেশে কুন্দন প্রথম বিশেষজ্ঞ হবে এই নতুন ফিল্ডে। তাই না?'

'বিষয়টা তো মন্দ নয়,'—নারায়ণরাম টাম্‌টা এক একটি শব্দে থেমে-থেমে বলেন, 'কিন্তু একটা বিষয় নিয়েই পড়ে থাকাটা ঠিক নয়। মানুষ নিজের বিষয়ে, সৃষ্টি বিষয়ে, অন্যান্য বিষয়ে এযাবৎ যে জ্ঞান আহরণ করেছে, সমস্ত জানা দরকার। তবেই বোঝা যাবে এই বিষয়টা কতোটা নির্ভুল। আর এতে মানুষের কোনো উপকার হবে কিনা, তার আত্মজ্ঞানে মদত মিলবে কিনা। জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই, কিন্তু সেটা যদি আত্মজ্ঞান হয়, তবেই। নইলে সবই বন্ধন, বিষয়বাসনা, জঞ্জাল। আমি তো বলি রমদা, তুমি বিলেতের যাবতীয় বিদ্যা আহরণ করে নিয়ে আসতে পারো, কিন্তু আগে নিজের মাটিতে পা পুঁততে হবে, অঙ্গদের মতো। আগে তোমার, তোমার দেশবাসীর প্রয়োজন কী, তা জানো। অপ্রয়োজনীয়, বেমেল, নিছক অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্ঞানের পাহাড় গড়ে তুলে লাভ কী? মৌলিক শিক্ষার নাম নেই, চললে বিশেষজ্ঞ হতে। আরে বিশেষজ্ঞ হতে চাও, হও। প্রয়োজন অনুসারে। মৌলিক কাজগুলো তো আগে সারো। লোকে তো জানুক, আমরা কোন্ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ! এঁরা ফিরে এসে আমাদেরকে নিয়ে কী করবে?...আমার মতে, রমদা, যারা বিশেষজ্ঞ হতে এখান থেকে যায়, তাদেরকে খুব করে বেদ-পুরাণ পাঠ করিয়ে সেখানে পাঠানো উচিত। শেকড়ের সঙ্গে একটু-আধটু যোগ তো থাকা দরকার। কী বলো?'

বাঁকা হাসি খেলে গেল কুন্দনের ঠোঁটে। 'সমস্ত জিনিসের পথ্য বেদ-পুরাণ নয় বাবা! গোড়ায় আমারও ওসবের প্রতি কৌতূহল ছিল। পড়ার পর বুঝেছি, বাজে কথার ভাণ্ডার। জ্ঞানের সঙ্গে ওসবের কী যোগ?'

'বটে!' বাবার চোখদুটো ফ্রেম ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যায়। বললেন, 'তুই আবার কখন পড়লি বেদ-পুরাণ?'

'সবই পড়তে হয় আমাদের।' কুন্দন বললো, 'সোশ্যাল সায়েন্স আর লিডারশিপের ছাত্রদের যাবতীয় মানবসভ্যতার মূল পর্যন্ত যেতে হয়। তুমি কিছুই জানো না, আর তর্ক করছো। জানো তোমার ধর্মশাস্ত্রগুলো কতো অমানবিক? বেদপাঠ শ্রবণমাত্রে শুদ্রের কানে গলানো সীসে ঢেলে দেওয়ার বিধান আছে তোমার মনুস্মৃতিতে। আর বলছো বেদপুরাণ পড়, সায়েন্স পড়ার কী দরকার! আর, তুমি না বেদপুরাণ বোঝো, না সায়েন্স। সায়েন্সই এমন এক বিদ্যা যা এই উজবুকি

অন্ধবিশ্বাস থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে। এই দেশের এরকম মুক্তিই দরকার, বুঝেছো? বেদপুরাণের মুক্তি দরকার নেই।'

কুন্দন দেখলো, ভাগীরথী, যে এতক্ষণ চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে ছিল, চুপি চুপি ঘরের ভেতরে এসে ঢুকেছে। বাবার পাশে এসে বসলো সে। কুন্দনের কথা শুনতে ওর নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। কিন্তু মুখের ভাবখানা এই, যেন কিছুই শুনছে না।

দুই বুড়ো নীরব। কেন? কুন্দন কি ওঁদেরকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে? রামদত্ত মাস্টার একটু-যেন ক্ষুণ্ণ।

'বেদ-পুরাণে তুই শুধু এটুকুই পেয়েছিস কুন্দন?'—ওঁর গলা একটু আহত শোনায়। ভাগীরথী এক ঝলক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্দনের দিকে চোখ ফেরায়। কুন্দন কী বলবে এবার? সে তো আর পণ্ডিত নয়!

'ক'জন হিন্দু বেদ-পুরাণ পড়ে?' সে একটা প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় রামকাকার দিকে।

'বেশ, বেশ...' বাবা খামোকাই মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'আমি এ কথা বলিনি যে পুরনো যা-কিছু সবই ভালো আর নতুন যা-কিছু সব খারাপ। ধর্মও তো মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতিফল। তাতে পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক। তাতে বাধা দিচ্ছে কে? পাল্টাও,—তোমার জীবন, তুমি পাল্টাবে না তো কে পাল্টে দেবে? ভগবান যদি তোমাকে বন্ধন ডোরে বেঁধেই থাকেন, তো মস্তিষ্কও তো দিয়েছেন সেই বন্ধনডোর ছিন্ন করার জন্যে। সেই স্বাধীনতাও দিয়েছেন। কিন্তু এ কোথাকার স্বাধীনতা, কোথাকার ন্যায়, যে, চারজন মিলে চার কোটি মানুষকে পরিচালনা করবে? জীবন তো কারও একার নয়। ঈশ্বর কম-বেশি প্রত্যেককেই কাজ করার মতো মাথা দিয়েছেন। যা-কিছু নতুন করতে চাও, বদলাতে চাও, সকলে মিলে কারো। সকলের প্রয়োজনের কথা ভেবে করো। নিজের সমস্যার সমাধান স্বয়ং করো। অন্যের মুখাপেক্ষী হচ্ছো কেন? অন্যের হস্তক্ষেপ সহ্য করছো কেন? হাজার-হাজার বছর ধরে আমরা বেঁচেবর্তে রয়েছি যখন, তখন ধরে নিতে হবে আমাদেরও বুদ্ধি আছে, আমাদের কাছেও কৌশল আছে, আরে আমরা যখন আমাদের বেদপুরাণ আমাদের নিজেদের বুদ্ধি দিয়েই পড়তে পারি না, যা আমাদের নিজের হাতে তৈরি, নিজের বিশেষ বিদ্যা, তখন অন্যে তা কী বুঝবে? তারা যে নিজেদের পদ্ধতি দিয়ে, নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে কিছু করতে পারবেন তার কী গ্যারান্টি? আমাদের লক্ষণ তো দেখতেই পাচ্ছি। ভুল বলছি রমদা?'

রমদা সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। ভাগীরথীকেও মাথা হেলাতে দেখলো সে। ও আবার বোঝেটা কী? বিজ্ঞান আজ কোথায় পৌঁছে গেছে, জানে? ঘরের চৌকাঠই ডিঙোয় নি কখনও।

নারায়ণরাম টাম্‌টা উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দেখাদেখি, অন্যরাও। রামদত্ত মাস্টার একহাতে নিজের বন্ধুকে আর অন্যহাতে কুন্দনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এইজন্যেই বলছি ভাই, তোরা বাপ-বেটা মিছিমিছি রেষারেষি করে মরছিস। কুন্দন যে একদিন তোর কাজই করবে, এতে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তুই চিন্তা করিস না নারায়ণ, নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে করে দ্যাখ, আর আজকের তরুণদের ওপর একটু বেশিই আস্থা রাখ।'

বৈঠক চুকেবুকে যাওয়ার পর পিতা-পুত্র বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পাশাপাশি হাঁটতে দুজনেই কেমন-কেমন করছিল। দুজনের মনেই আজ ভাঙাগড়ার খেলা।

হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডাকলো, 'কুন্দন-দা, কুন্দনদা!'

কুন্দন যেন হঠাৎ বিদ্যুতের শক খেলো। ভাগীরথীকে ছুটে আসতে দেখলো সে। এক হাতে একটা বই। বইটা ওর হাতে দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'তুমি তো এটা ফেলে দিয়ে এসেছিলে!'

'আরে, পরে নিয়ে নিলেই হতো। এভাবে ছুটে আসার কী দরকার ছিল তোর?'—বাবা সস্নেহে হাসেন। ভাগীরথী ফিরে গেল।

'বেড়াতে বেরিয়েও বই সঙ্গে থাকে তোর?'

কুন্দন জবাব দেয় না। তুমি জেনে কী করবে?

'মেয়েটাকে নিয়ে রমদার খুব চিন্তা। কোনো ছেলে পাচ্ছে না। তোর চেয়ে এক-আধ বছর বড়োই হবে ভাগী।...তোর নজরে কোনো ছেলে থাকলে বলিস। উপকার হয় ওদের।'

কুন্দন যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সহসা মনে হলো আজ যখন সবই অসম্ভব ঘটে চলেছে, তখন বলেই ফেলা যাক না! যা হবার হবে। একটু ঠেঁটা-গলায় সে বললো, 'আমার নজরে একটা ছেলে আছে, কিন্তু তোমার আর রামকাকার এতোটা সাহস হবে?'

বাবা হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। কপালে ভাঁজ ফুটে ওঠে। কুন্দনকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'মানে, আমিই ভাগীরথীকে বিয়ে করতে রাজি আছি। তুমি যদি মত দাও।' কুন্দন সপাটে বলে ফেললো।

'কী!!!' প্রায়-চিৎকারের মতো আওয়াজ বেরোয় বাবার মুখ দিয়ে—'তোর মাথা ঠিক আছে তো? লজ্জা করে না তোর?'

'এতে লজ্জা কিসের?' ততোধিক উঁচু গলায় বললো কুন্দন, 'আমি ভাগীরথীকে ভালোবাসি। তুমি এইমাত্র ওখানে বসে জাতপাত বন্ধন ভাঙার কথা বলছিলে। এসো না, নিজের বাড়ি দিয়েই শুরু করা যাক।'

নারায়ণরাম টাম্‌টার মাথায় যেন বাজ পড়েছে। স্বয়ংক্রিয় অভ্যেসে তিনি

হাঁটছিলেন বটে, কিন্তু মুখে শব্দ ফোটে না তাঁর। কুন্দনও দম কষে পাশাপাশি হেঁটে চলে। কিছুক্ষণ পর সে তার বাবাকে মৃদুস্বরে বলতে শুনলো, 'এ হতে পারে না। এ চিন্তা মাথায় এলো কেমন করে তোর? রমদা আমার বড়ো দাদার সমান। নিজের দাদার চেয়ে বেশি। বড়ো দাদাই শুধু নয়, আমি তাঁকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করি। তোর তো উনি গুরুই বটেন। ভাগীরথী তোর বোন। গুরুকন্যা। এরকম চিন্তা ভুলে আসা উচিত ছিল না তোর মাথায়।'...

'ব্যস, হলো তো!' কুন্দনের মাথা গরম হয়ে উঠলো, 'এই গুরু-টুরু তুমি থাকতে দাও। এসব তোমাদের টালবাহানা আর ভণ্ডামি।...এখন কোথায় গেল তোমার সেই সমাজ-সংস্কারের বড়ো-বড়ো বুলি?'

নারায়ণরাম টাম্‌টা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকেন। তারপর বলেন, 'তুই তাহলে আমার মাথা হেঁট করতে চাস শুধু। তোর খুব দেমাক হয়েছে, না?'

'এ তোমার মনের ভুল।' অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে বললো কুন্দন, 'আজ অব্দি আমাকে কখনও বোঝার চেষ্টা করেছো তুমি? সবসময় নিজের জেদ অন্যের ওপর চাপানো তোমার অভ্যেস। তুমি অহংকারী নও, আর আমি একটা সহজ-সরল কথা বলে অহংকারী ব'নে গেলাম? আমি ভাগীরথীকে ভালোবাসি, আর ওকে গ্রহণ করতে রাজি আছি। এখন তোমার আপত্তি কিসের? স্পষ্ট করে বলো।'

নারায়ণরাম টাম্‌টা আনত মুখে হেঁটে চলেন। 'অসহ্য!' একটু থেমে উনি বলা শুরু করেন, 'এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এই দুর্বুদ্ধি তোর মাথায় কি করে যে এলো! রমদা শুনলে বলবে কী? তোর মেয়ের অভাব নাকি? পড়াশোনা-জানা মেয়েও তো পেয়ে যাবি।...কিন্তু না! তুই যে শুধু আমাকে আঘাত দিতে চাস। এ খুব গৌরব কাজ বলে মনে হচ্ছে তোর? এতে গৌরবের কিছুই নেই। এর সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কী যোগ? এই বুড়ো বয়েসে তুই এসব শেখাবি আমাকে? তাই না? সারাটা জীবন আমি এমনিই ছিলাম? এখন তুই আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছিস? আমার পরীক্ষা নিচ্ছিস!'

নারায়ণরাম টাম্‌টার গলায় কিছু-একটা আটকে গেছে। কথা শেষ হয়েছে নাকি? আরও কতো কী শুনতে হবে কুন্দনকে! ডুমৌড়ার ঐ গলিটা না আসা পর্যন্ত চরকা ঘুরতেই থাকবে।

'তুই ভালোবাসার কথা বলছিস! সত্যিকারের ভালোবাসা হলে এমন নির্লজ্জের মতো আমার কাছে সেটা বয়ান করতিস না। বুঝেছিস? ভালোবাসা এক জিনিস, আর বিয়ে-শাদি আন্য জিনিস। প্রেমের পথ তো তরোয়ালের ধার। নিজের সঙ্গে ছল করিস না। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন কথা মুখেও আনিস না। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি'—বুকের মধ্যিখানে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা টের পায় কুন্দন। মনে-মনে

বললো, 'জানতাম। এরকম ভণ্ড লোকের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই সমাজ আর তার পচাগলা মূল্য-বোধের ওপর আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এবার আমার নিজের পথ নিজে তৈরি করে নিতে হবে। গল্প খতম্!'

মিত্রলাভ ও নিষিদ্ধ ফল

কুন্দন বছর-খানেক হতে চললো ঐ কলেজে পড়াচ্ছে। এর মধ্যে জার্মানি থেকে ওর ডাকও এসে গেছে। কমসে-কম তিন-চার বছর তো লাগবেই সেখান থেকে ডক্টরেট হাসিল করতে। ইচ্ছে তরলে আরও আগে যেতে পারতো। ওর প্রফেসার ওকে আমেরিকা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে কিছু টাকা পয়সা কাপড়-টাপড় জোগাড় করে নিতে চায় সে। এছাড়া আরও কয়েকটা কারণ রয়েছে। প্রথমত সে বিদেশযাত্রার প্রস্তুতি সেরে নিতে যায়,—চেতনাগত আর মানসিক প্রস্তুতি। দ্বিতীয়ত সে নিজের বাবাকে আরেকটু সময় দিতে চায় ওর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্যে। তাছাড়া আর ক'টা দিন প্রফেসারি চালিয়ে গেলে একটা মানসিক জোরও বাড়বে, সামাজিক আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। তারপর বিদেশ পাড়ি দেওয়াটা বেশ সুখকর হবে। এটাও হয়তো সে ভেবে রেখেছিল। এ-বাদে আরেকটি কারণ ছিল হয়তো, যা সে নিজেই জানতো না, তা হলো, ভাগীরথী। ইংরেজীতে একটা কথা আছে না,...'হোপিং এগেন্স্ট হোপ...' তেমনি আর কি। ভিত্তিহীন আশা।

সৌভাগ্যত, ঐ ঘটনার তিন-চারদীন পরেই অ্যাপেয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়ে গিয়েছিল সে, আর যেহেতু তখন কলেজে ছুটি চলছে, সুতরাং অনন্তপুরে না গিয়ে লখনউতেই থেকে গিয়েছিল। সেখানে থেকেই চাকরি জয়েন করেছিল। ঐ ঘটনার পর বাবা বা রামকাকা বা ভাগীরথী কারুরই মুখোমুখি সে হতে চায়নি বোধহয়। তবে, কোন্ ভরসায়, মনের অন্ধকার কোণে এই দুরাশা পুষে রেখেছিল সে! তা বোঝা কুন্দনের পক্ষে এদান্তি সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, নতুন জায়াগায় আসার পর কুন্দনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি, আর্থার আর গ্রীটা। এরাই এখন কুন্দনের নতুন পরামর্শদাতা। বেশিরভাগ সময় কুন্দন এদের সঙ্গেই কাটায়। দুজনেই বেশ মজাদার, জলি আর প্রেমিক মানুষ। যে-বাড়িতে কুন্দন থাকে, সেটা আর্থারের তদ্বিরেই হাসিল হয়েছে। নামেই বাড়ি, আসলে একটা কামরা। একটা ফ্যামিলির সঙ্গে থাকে কুন্দন। একরকম পেয়িং গেস্টের মতো। বাড়ির মালিক প্রায়ই বাইরে-বাইরে কাটান। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কুন্দনের ভালোরকম ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। দেওয়ালির ছুটিতে কুন্দন বাড়ি গিয়েছিল। নতুন রোজগেরে

ছেলের মতোই সোৎসাহে নানারকম জিনিস কিনে নিয়ে গিয়েছিল। বাবার জন্যে, মায়ের জন্যে, ভাই-বোনদের জন্যে, এমনকি রামকাকা আর ভাগীরথীর জন্যেও। স্বভাবতই, বাড়িতে ওকে জোরদার স্বাগত জানানো হয়েছিল। কিন্তু ভাগীরথীর সঙ্গে দেখা আর হয়নি। শুনলো, ভাগীরথীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

তো...অনন্তপুর থেকে ফেরার পর বাড়ির মালিকের বউয়ের সঙ্গে কুন্দনের ঘনিষ্ঠতা হঠাৎ বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে ফেলে। এমন বিপজ্জনক বাঁক, যা কুন্দন নিজেই ভাবতে পারেনি। কিন্তু...ভাবতে পারেনি কেন? সম্পর্কটা আগে থেকেই নিশ্চয়ই ঢালের দিকে এগোচ্ছিল। এখন যদি ঢালু রাস্তাটাকেই আমরা সমতল মনে করে বসে থাকি, তো সেটা ভিন্ন। হয়তো আমাদের পা-দুটোর ওপর বেশি ভরসা থাকে, তাই। ভরসা থাকাটা মন্দ না। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি? আর, ঢালু সড়ক পেলে আমরা নিজেকেই একটু ঢিল দিয়ে দিই কিনা?

তার বাদে এই ঝড়, যা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে নিজের সঙ্গে বয়ে এনেছে কুন্দন! একটা বিদ্রোহ, যা সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে, সমস্ত গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। একটা অন্তহীন ঘৃণা—সেই সমস্ত তথাকথিত আদর্শ আর মূল্যবোধের প্রতি, যেগুলি এতাবৎকাল তার জীবনের অক্ষ হয়ে থেকেছে।

এতদিন পর্যন্ত কুন্দন অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ছিল। নিজের শক্তিতে ততটা নয়, যতটা একটা অবচেতন সংস্কারের দরুণ, যে তাকে সবসময় রক্ষা করে এসেছে। আজ অকস্মাৎ পাল্টে গেল সব। সে নিশ্চিত বুঝে ফেলল যে ভাগীরথী তাকে শূদ্র বলেই অবজ্ঞা করেছে। এও জেনে গেল যে বাবা আসলে নিজের শূদ্রত্বের কাছে অসহায় আর হাজার চেষ্টা করলেও ঐ হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, অন্যকেও বেরোতে দেবেন না তিনি।

কিন্তু কুন্দন এই হীনমন্যতা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছে। ওর এই অভিধেয় অনুভূতিশূন্যতা তার অপরাধশূন্যতা গলায় বাঁধা পাথর ছাড়া কী আর? এই পাথরটাকে খুলে না-ফেলা পর্যন্ত সে এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পাবে না। ঠুনকো নীতি-নৈতিকতায় ওর কোনো কাজ নেই, এ মিছিমিছি ওর সঙ্গে লেপ্টে আছে।...মিথ্যে, যাকে একেবারে কুচলে দেওয়া উচিত। ভাগীরথীর প্রতিশোধ তুলতে হবে ওকে, বাবার বদলা নিতে হবে, সেইসমস্ত মূল্য-ব্যবস্থার বদলা নিতে হবে, যা এখনও পর্যন্ত ওর বেঁচে থাকার পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে।

আর্থারের মতো খোলা মনের বন্ধু থাকতে ভাবনা কী? আর্থার না থাকলে কুন্দনের পক্ষে এই একাকীত্ব একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠতো। আলবাত এ-হেন সখ্যতা নিছক যোগসূত্রতা মাত্র নয়। এর পেছনে অদৃষ্টের একটা অদৃশ্য হাত ছিলই। আর এটা একতরফাও ছিল না। এ ছিল দুটি বিপরীত মেরুর পারস্পরিক

আকর্ষণ। কুন্দন যতখানি আর্থারের ওপর নির্ভর করে, হয়তো আর্থার ততখানি কুন্দনের প্রতি নির্ভরশীল নয়, কেননা ওর কাছে রয়েছে গ্রীটা। কিন্তু তবু, কুন্দনের প্রতি আর্থারের টান ভিত্তিহীন তো আর ছিল না। এত সিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও কুন্দনের সঙ্গে যেরকম অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে, তেমনটা কলেজের অন্য কারও সঙ্গে হয়নি।

আর্থারের কাছে কোনো কিছু লুকোনো বা লুকোতে পারা কুন্দনের পক্ষে অসম্ভব। কুন্দনের চেয়ে সে সাত বছরের বড়ো, দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে—অদ্ভুত-অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হাসিল করেছে। কুন্দন তার কাছে নিতান্ত শিশু, অবোধ শিশু। আর্থারের উদারচিত্ততাই বলতে হবে যে বয়েস, ভাবনা পড়াশোনা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে বড়ো হওয়া সত্ত্বেও, কুন্দনের মতো কাঁচা, নবাগত ও আনকোরা ছেলের সমান্তরালে নেমে এসে হাত ধরেছে সে। এরকম মুক্তমনা বন্ধুরই প্রয়োজন ছিল কুন্দনের।—একেবারে সঠিক মুহূর্তে, ঈশ্বর-প্রেরিত দূতের মতো আর্থার আর গ্রীটাকে পাওয়া, কুন্দনের নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল। আর্থার শুধু বন্ধু নয়, অভিভাবকও। তার চেয়েও বেশি গ্রীটা। বিদেশ যাত্রার দোরগড়ায় দাঁড়ানো কুন্দনের পক্ষে এদের বন্ধুত্বের চেয়ে বড়ো আর কী হতে পারতো! প্রতিদিনই অল্প অল্প করে সেই দীক্ষা গ্রহণ করে কুন্দন।...একদিনও দেখা না-হলে, খোদ গ্রীটা এসে হাজির হয়। কুন্দনকে ছাড়া একটা সন্ধ্যাও যেন কাটতে চায় না তার। তার অনন্য আত্মীয়তা দেখে কুন্দন মুগ্ধ। কুন্দনের কাছে ঠেকে যে, ওকে ছাড়া এই দু'জনের কাজ চলে না।

এখন, এমতাবস্থায় এই দুজন কুন্দনের অন্তর্জীবনের রহস্য-জানা ব্যক্তি আপনা আপনি ব'নে গেলে কী আর করা! আর্থার যদি কুন্দনকে 'মাই জিনিয়াস' বলে ডাকে, তো গ্রীটাও কিছু কম যায় না। সেও কুন্দনকে ডাকে 'মাই ডার্লিং' বলে। হ্যাঁ, গ্রীটা কুন্দনকে আদর করেই ডাকে, আদরও করে এবং আর্থারের সামনে। আর্থারের এতে হিংসে বা জ্বলুনি হয় না। তার প্রিয়তমা স্ত্রীও যদি কুন্দনকে ততটাই ভালোবাসে, যতটা সে বাসে নিজে, তাতে তার খারাপ লাগবে কেন? এমতাবস্থায় কুন্দন এদের কাছে গোপনই বা কী করবে? কেনই বা? এদের জগতটাই আলাদা। এ জগত সেই জগত নয় যেখানে কুন্দনের দম বন্ধ হয়ে আসতো। এ তার অভ্যস্ত জগত ছিল না। এ ছিল এক নতুন দিগন্ত : তার উঠতি যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের, অনুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রে ঝংকার প্রদানকারী—অক্ষয় স্ফূর্তি আর উত্তেজনায় ভরা—যেখানে বন্ধন নেই কোনো, বাধা-প্রতিরোধ নেই।

পা একবার পিছলে গেলে তাকে সামলানো সহজ নয়। আমরা যাকে অন্তরাত্মা বলি, বা অন্তরাত্মার আওয়াজ বলি, হয় সেটা আর শোনা যায় না, কিংবা অন্যান্য আওয়াজের তলায় চাপা পড়ে যায়। কিংবা এভাবে বলতে পারেন যে আমরা

আমাদের এই অন্তরাত্মার ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে পড়ি। এহেন চমৎকার আমাদের চেতনা-সঞ্জাত। আমাদের স্বচ্ছন্দ চেতনাই, আমরা যা-কিছু করতে চাই, তা কিভাবে করা উচিত সেটা জানিয়ে দেয়। স্বচ্ছন্দ চেতনার নেশা এক অদ্ভুত নেশা। তা থেকে কেউ পরিত্রাণ পেতে পারে না। আর, কুন্দন এই নেশায় সবেমাত্র দীক্ষিত হয়েছে। ওর পক্ষে এই স্বচ্ছন্দ-চেতনার প্রতি সন্দেহ করাও অসম্ভব। স্বচ্ছন্দ চেতনার নেশা আমাদেরকে অনৈতিক তো আর করে না। আর্থার মাঝেমধ্যে বলেও ফেলে, এই গড় নৈতিকতাকে পিষে না-ফেলা অব্দি আমরা সত্যিকারের নৈতিক বা নীতিবানও হতে পারি না। এত সত্যি কথা, এরকম আত্মবিশ্বাস কুন্দনের নিজের মধ্যে জেগেছে কখনও?...এ যদি অতিনৈতিকতা না হয়, তবে? আত্মাও তো নিজের পাপকে, পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েই তো সনাক্ত করতে পারে। পাপই তার সামর্থ্যের জ্ঞান প্রদান করে। সেই মূল পাপই আমাদের আর ঈশ্বরের মাঝখানে একমাত্র সেতু।

আর এই পাপ জিনিসটিই বা কী? কুন্দন এখন বেশ বুঝতে পারে—কুন্দন স্বকীয় অভিজ্ঞতায় জেনে ফেলেছে, এসব পাপ-টাপ বলে কিছু নেই। এ তো নিছক ষড়যন্ত্র, যা সাধারণ লোকেরা একে-অপরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। যে অসাধারণ হয়ে জন্মেছে তার কাছে এর কোনো মূল্য নেই। পাপ বলে কিছু নেই। শুধু রয়েছে ভীতি—সংস্কার ও অভ্যেসের ভয়। সংস্কার যা আপনি রচনা করেননি, সংস্কার যা আত্মাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না—যা আত্মার অঙ্গ কদাপি নয়। যা আত্মার ওপর কাদার মতো লেপ্টে থাকে মাত্র। তাকে কেটে ফেলা, তার মুঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করাই বস্তুত আত্মাকে স্পর্শ করা এবং অর্থারের ভাষায়, নিজের পুরুষত্বকে হাসিল করা।

সত্যিসত্যিই, কুন্দন এতদিনে জেনে গেছে যে গোলামদের নীতিবোধ থাকে না। আমরা জেনেই কোনো জিনিসের সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক তৈরি করে নিই। একটা স্বতন্ত্র সম্পর্ক। নইলে ততেও সেই দাসত্ব আমাদের সঙ্গে সেঁটে থাকবে। আনন্দের কোনো রক্ষণশীলতা থাকতে পারে না। রক্ষণশীলতায় সত্যিকারের কোনো আনন্দ থাকতে পারে না। মূল পাপ আর মূল আনন্দ পরস্পর গেঁথে রয়েছে। তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কুন্দনকেই দেখুন, নারীর প্রতি একটা রুগ্নপ্রায় কৌতূহল সে চেপে রেখেছিল এতদিন, তার শমন হলো কি না? এখন সে মেয়েদেরকে জেনে গেছে, বুঝে ফেলেছে। মেয়েদেরকে জানতে হলে এমনভাবে জানুন, যেভাবে কুন্দন জেনেছে। একটা নিষিদ্ধ ফলের মতো। সত্যিসত্যি মূল পাপের মতো।...

...তাহলে সে কে, জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখছে যে? এ আবার কেমনতরো অসাধারণত্ব যে নিজেরই গৃহকোণে বসে কারাবাস যাপন

করছে? এক নিতান্ত সাধারণ জীবনের এই দলিল কার প্রতি সমর্পিত? যে তাকে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই—কিংবা বলতে পারি, জ্ঞান হবার আগে থেকেই সত্য কথা বলার কসম কবুল করিয়েছিল, সে-ই যখন দৃশ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে পড়েছে, তখন এই আত্ম-নিবেদন কার জন্যে?

তৃতীয় পর্ব

আস্তায়মান সূর্য

জামগাছ

টিপ্...টিপ্। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দার গা-ঘেঁষে, বারান্দা বরাবর যে-জামগাছটা উঠে এসেছে, সেটাই জানান দিচ্চে। ফোঁটাগুলো এতো ছোট-ছোট যে, পাতায় পড়ে টিপ্-টিপ্ শব্দ না তুললে বোঝাই যেতো না যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মাটি ভিজলেও না-হয় একটু সোঁদা গন্ধ মিলতো। কে-জানে কখন থেকে এই টিপটিপে বৃষ্টি চালু রয়েছে। এতক্ষণে টের পেলাম। এমনিতে কাল রাত্তিরে, বরং কাল সকালের দিকেও দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। জষ্ঠি গেল, আষাঢ় গেল, এখন শাওনও যায়-যায়; বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। কে-জানে এ বছরটা কী হবে! গোটা ঋতুচক্রটাই যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছে আর সবচেয়ে বড়ো ত্রাস এটাই। মানুষের জগতে অসম্ভব ঘটছে ঘটুক, প্রকৃতিকে অন্তত স্ব-ক্ষেত্রে অটল থাকা উচিত। কিন্তু থাকবেটাই বা কেন মশাই—স্ব-ক্ষেত্রে অটল, মানুষ নিজের অক্ষ ছেড়ে দেয় যদি? মানুষ কি প্রকৃতির বাইরে, আলাদা নাকি? সেও কি প্রকৃতিরই অভিন্ন অঙ্গ নয়?...সেকালে বৃষ্টি না হলে মানুষকেই তো দোষী সাব্যস্ত করা হতো—সেটা এমনি-এমনি নাকি? যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি ভেল্‌কিবাজি সই, একটা সম্পর্ক তো জিইয়ে রেখেছে মানুষের পৃথিবী আর সৃষ্টির মাঝখানে! রাজা বা প্রজার মধ্যে কোনো পাপ বা অনর্থ ঢুকেছে বলেই খরা দেখা দিয়েছে—এহেন চিন্তা অন্ধ বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু তাতে ক্ষতিই-বা কী? এটা মানুষের তার আসল মুরোদ টের পাইয়ে দেয় না কি? পক্ষান্তরে তা মানুষকে গোটা ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত করে দেয় না কি—তার অতি ক্ষুদ্র কাজকেও বিরাট গুরুত্ব প্রদান করে?

আর এ-কথারই বা প্রমাণ কী যে, মানুষ এখনও নিজেদেরকে—নিজেদের সেই আরণ্যক পূর্বপুরুষদের মতোই,—মনে করে না? মুখে স্বীকার করে না বটে, তুকতাক নখদর্পণও করে না, সে ভিন্ন কথা। লোকলজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। সে-যুগে এই লোকলজ্জা ছিল অন্য প্যাটার্নের, এ-যুগে তার রকম বদল হয়েছে—ফারাক এইটুকুই। তখন ছিল ধার্মিকতার লজ্জা, এখন সেটা বৈজ্ঞানিকতার লজ্জা, ব্যস, তফাৎ এইটুকু। লক্ষ-লক্ষ মানুষ এখনও নিজেদেরকে অবিকল নিজেদের পূর্বপুরুষদের মতোই ভাবে। 'লক্ষ' বললাম কম করে, আসল বলা উচিত 'কোটি'। এই দেশটির কথা আমরা ভুলেই যাই, যেখানে এখনেও শতচণ্ডী যজ্ঞ আরও না-

জানি কতো-কী চলছে বহাল তবিয়তে! নিঃসন্দেহে এইসব ব্যাপারকে আমি ঘৃণা করি, ভীষণ লজ্জা পাই। এই তো কালই ক'জন লোক এসেছিল চাঁদা চাইতে। ভাবলাম গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিই, কিন্তু করজোড়ে মার্জনা চেয়েই ক্ষান্ত হতে হলো। বলতে হলো, 'এসবে আমার বিশ্বাস নেই। নাস্তিকের কাছ থেকে চাঁদা নিলে অমঙ্গল হবে।' ওরা নির্লজ্জের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, ফিরে যেতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের ওপরেই কপাট বন্ধ করে দিতে হলো। ওরা হয়তো মনে-মনে বা জোরে-জোরে আমাকে খিস্তি দিতে-দিতে গেছে। আমি শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকিনি। ভয় ছিল, এলিস আবার না বেরিয়ে আসে। মিছিমিছি কথা বাড়তো। এমনিতে—পরে মনে হলো—চাঁদাটা দিয়ে দিলেই-বা কী এমন ক্ষতি হতো? এতে না ধর্মের কিছু এসে-যায়, না বিজ্ঞানের, এ হলো নিছক লৌকিকতা। জোসেফের মতো লোকও চাঁদা দিয়েছে, জোসেফ না হোক, দিয়েছে মার্গারেট, কিন্তু দিয়েছে তো! আশ্চর্য, খৃষ্টানদেরকেও এরা রেহাই দেয় না। জোসেফ বললো এতোদিনে, কিন্তু এটা আমি আগেই ঠাহর করেছিলাম যে যে-সব গালি ওরা আমার নামে উৎসর্গ করেছিল, তার মধ্যে একটা 'কিপটে' ছিল অবশ্যই।

এতক্ষণে টিপ-টিপও বন্ধ হয়ে গেছে...কান পাতলেও শোনা যায় না। সামনের দরজাটা আজ খোলার ইচ্ছে ছিল। জানি-না সারাদিন ধরে কেন মনে হয়েছে আজ মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরবে আর আমি চায়ের কাপ হাতে সামনে-গিয়ে বসব তার। চায়ের আমেজ নিতে-নিতে ঘোর বারিপতন দেখবো।

জামগাছটারও নড়ন-চড়ন এখন বন্ধ। ওর এই চুপটি মেরে থাকাটা আমাকে অমন বিঁধছে কেন? এখানে বসে আমি ওকে দেখতে পারি না, ওর টিপ্-টিপ্ শব্দ শুনতে পারি মাত্র। এখন তাও বন্ধ। কেমনতরো গাছ রে বাবা, বাতাসও যাকে নাড়াতে অক্ষম, পাখিরা বসতে চায় না যার ডালে...ভুল করে কখন-সখনও যদি বসেও পড়ে দু-একটা, পরক্ষণেই ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। যেন গাছ মনে করে বসে পড়েছে। যেন গাছে...ও যে একে একঘরে করে দিয়েছে সেটা পাখিদের জানতে বাকি নেই। যাঁদের উঠোনে গাছটা বেড়ে উঠেছে, তাঁরাও পরেশান। তাঁদের দুশ্চিন্তা, বড়ো হয়ে গাছটায় যখন ফল ধরবে, পাড়ার ছেলেরা এসে জ্বালিয়ে মারবে, তখন তাঁদের উৎপীড়নের অন্ত থাকবে না। এতো সাধের বাগান, ছোঁড়াগুলো এসে মাড়িয়ে দিয়ে যাবে। ঢেলায়-ঢেলায় ভরে দেবে বাগানটা। আর ধোপাদের ছাগলগুলোই বা উজাড় করার ব্যাপারে কম কিসের?...

কিন্তু তাঁদের এই আশংকা একেবারেই ভিত্তিহীন। গাছটাকে দেখলে মনে হয় যে কখনও ফল ধরবে? কে কখন জাম খেয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল, পরে তা আপনাআপনি গাছ হয়ে ফুঁড়ে উঠেছে। এলিসের বক্তব্য, আহুজা সাহেব মিথ্যে

বলছেন। চারাগাছটা সবে দেখা দিয়েছিল যখন, তখুনি এলিস তাঁকে বলেছিল। কিন্তু তিনি জেনেশুনেই অদেখা করেছিলেন। কেন অদেখা করেছিলেন, এলিস তা জানে না ; কিন্তু আমি জানি। হিন্দু ধর্মমতে বীজাঙ্কুর উপড়ে ফেলা পাপ, আর আহুজা সাহেব স্বয়ং হিন্দু, বটানির অধ্যাপক হলেই-বা। আসলে, কেতাবি-চেতনার ফ্লোর ঝেঁটালেই কিন্তু এইসব প্রাক্-চেতন মনোবৃত্তির কালিঝুলি মনের অন্দর থেকে ঝেঁটিয়ে ফেলা যায় না। তাছাড়া, আহুজা সাহেব তো আর একা নন, শ্রীমতি আহুজাও রয়েছেন।

গাছটাকে দেখলেই গা রী-রী করতো এলিসের। আক্রোশ আমারও কম ছিল না। কিন্তু এলিসের রাগের তুলনায় আমার রাগটা তেমন ওজনদার ছিল না। এলিসের গা-জ্বলুনি ছিল বেশি ওজনদার আর কাজে-কাজেই বছরে অন্তত দু-বার কুড়ুল পড়তো ওর গায়ে আর দু-একটা বাহু কর্তিত হয় নিষ্ঠুরভাব। আমরা থাকি দোতলায়, আহুজা সাহেবের ঠিক ওপরে। আর শীতের রোদ আর আমাদের বারান্দা এই দুয়ের মাঝখানে অন্তরায় সাধে যদি এই গাছটি, তখন এই শল্যোপচার ব্যতিরেকে আর দাওয়াই কী? না-হয় জবরদস্তি ঢুকে পড়েছে এবং অবাঞ্ছিতই, কিন্তু অন্দরে যখন প্রবেশ করেই ফেলেছে, শরণাগত হয়েছে, তখন তাকে একেবারে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা তো আর সম্ভব নয়! হাতগুলোকে ছাঁটা যেতে পারে, গর্দানও কলম করা যেতে পারে...গাছই তো, মানুষ তো আর নয়! বাড়তে দিচ্ছি ধু, প্রাণে তো আর মারছি না! আম আর বট গাছ পর্যন্ত ছেঁটে বাড়ির গামলায় সাজিয়ে রাখে লোকে, যাতে পাপ নেই, রয়েছে শিল্প, আর তো কোথাকার কোন অজ্ঞাতকুলজাত জাম, যা কোনো কাজেই লাগে না লোকের। না কেউ দেখতে চায়, না খেতে চায়। রয়েছে যদি, সমস্ত লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়েই রয়েছে। তাকে মেরেই-বা ফেলি কী করে!

কিন্তু এইটুকুনি কথাও এলিসের মাথায় ঢোকে না। ও এই অঙ্গহানি-মাত্র সন্তুষ্ট নয়। ও চায় এর মূলোচ্ছেদ আর তাই নিয়ে মিসেস আহুজার সঙ্গে ফি বছর বাধে সংঘাত। গতবছর একটু বেশিই যেঁকে বসলে মিসেস আহুজা বলে দেন, 'ঠিক আছে, আপনিই উপড়ে নিন।' সঙ্গে-সঙ্গে কোত্থেকে একটা কাঠুরিয়াকে ধরে আনল। ঐ কাঠুরিয়া ব্যাটাও কম যায় না, কুড়ি টাকার নোটটা ফেরৎ দিয়ে গাছটাকে পরিক্রমা করে তাকে প্রণাম করে চলে গেল। এলিসের ওরকম রুদ্রমূর্তি আমি আগে কখনও দেখিনি, অবশ্যি আমি ওকে সমর্থন না করে পারিনি। ঐ সত্যপরায়ণ কাঠুরেটার ওপর আমারও কম রাগ হয়নি, ইচ্ছে করছিল কুড়ুলটা তুলে দিই এক কোপ বসিয়ে—ওর এই অনুকম্পার বোঝা বইবো কেন? কিন্তু হাত কামড়েই রয়ে যেতে হলো। আর আহুজা সাহেব সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে থেকে মজা দেখলেন। ওঁদের হাসিও এমন মোলায়েম যে কুপিত হওয়ার যো নেই। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি 'অজাতশত্রু'

নামে প্রসিদ্ধ। একমাত্র এলিসই তাঁকে কাওয়ার্ড আর হিপক্রিট বলতে পারে, আড়ালে শুধু নয়, মুখের ওপরেও। আর এই উপাধিদ্বয় সহাস্যাবদনে হজম করার ক্ষমতাও রয়েছে একমাত্র আহুজা সাহেবের মধ্যে। খবরটা মিসেস আহুজার কানে পৌঁছনো-মাত্র সমস্ত সম্পর্কের ইতি টানলেন তিনি। তাতে তাঁর ক্ষতি তেমন হলো না, এলিসই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো। নিজের তরফ থেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি আমি, এ-পর্যন্ত বলেছি যে ওদিকে উনি যদি জেদি হন, তো এদিকে তুমিও কম যাও না। সংস্কার অতি খারাপ ব্যাপার, আর প্রতিটি খারাপ ব্যাপারের মতো, দুর্মরও। তুমি একজন নৃতত্ত্ববিদের স্ত্রী, তোমার নিজেরও আমার চাইতে কিছু কম দখল নেই, তবে এটাকে ঐ চোখে দেখছো না কেন? নৃতত্ত্বশাস্ত্রীদের চোখে এসব জিনিস উপভোগ্য হওয়া উচিত। বরং অন্ধবিশ্বাসই সবচেয়ে বেশি জরুরী তত্ত্ব তাঁদের কাছে, তা হলেই-বা তথাকথিত তত্ত্বজ্ঞান, পরে তা ওঁদের কাছেও অন্ধবিশ্বাস ঠেকতে বাধ্য।

কিন্তু অনুতাপ এই যে, আমার কথাগুলো এলিসের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটালো না। আমার দীর্ঘ বক্তৃতার জবাবে সে শুধু দুটি বাক্য কষালো। প্রথমটি হলো, আমি আহুজার চেয়েও ভণ্ড আর কাপুরুষ। আর দ্বিতীয়টি হলো, ইদানিং আমি ওর কাছে অপরিচিতের মতো ঠেকছি। তৎসহ একটি ফুটনোটও জুড়ে দিল সে, যে, হিন্দুধর্মের নোংরামি আর বেহুদাপনা সম্পর্কে আহুজার দৃষ্টিহীনতা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু আমার সম্পর্কে ওর ধারণা অন্যরকম ছিল।

এলিস আসলে ইউরোপিয়ান ঃ মিতভাষণে বিশ্বাসী। কম শব্দে চোট্ মারার টেকনিক ওর আয়ত্ত্বে। অথচ আমি হলাম, ওর ভাষায়, এক বাচাল সংস্কৃতির প্রতিভূ। নিজের যাবতীয় শব্দ আমার কাছে অকূলান ঠেকে যদি, কী-বা করতে পারি আমি! এমনিতে আমাকে বাক্যহারা করে ফেলা ওর পক্ষে বাঁহাতি ব্যাপার, কিন্তু সেদিনের ঐ আক্রমণের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। এলিস ক্রমশ রুক্ষ আর খিটখিটে হয়ে উঠছে। খিটখিটে ঠিক নয়, এ হলো বিশুদ্ধ নৃশংসতা, নিপাট ক্রুরতা। তারচেয়েও বড়ো দুশ্চিন্তার কথা, দিনে-দিনে ও ভোঁতা হয়ে পড়ছে। আমাকে আঘাত করে সফল হলে তবেই ওর মধ্যে ভালোবাসা জাগে। তবেই ওর আবেগের নড়াচড়া শুরু হয়। সেদিনই ও আমার সামনে স্ত্রীর মতো হাজির করে নিজেকে। তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ আমাদের মাঝখানে একটা বরফের আস্তরণ ছেয়ে থাকে।

আর আমি?...ওর মতো আমিও ক্রমশ ভোঁতা হয়ে পড়ছি না কি? কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ওকে আমি গালাগাল দিয়ে উঠবো বলে ভাবতে পেরেছি? মনের মধ্যে ঘোঁট পাকাতে থাকা এতসব নোংরা গাল ফোটে কেমন করে মুখ দিয়ে?

ও এইসময় ওখানেই আছে হয়তো—ঐ পাদ্রির সঙ্গে। আর ও আমাকেই বলে

কিনা ভণ্ড! আজ হঠাৎ এতদিন বাদে গির্জার স্মৃতি উতলা করলো ওকে?... ওর শিয়রের কাছে বাইবেল পড়ে থাকতে দেখি। একদিন এমনও গেছে যখন আমি ওকে বাইবেলের গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ও শোনে নি। একদিন আমি, ওর খাতিরে নয়, স্বেচ্ছায় খৃষ্টান হতে চাইলে ও আমাকে বাধা দেয়, ভর্ৎসনা করে, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। চার্চগুলোকে দেখেও উপহাস করতো ও। শুধু চার্চ কেন, ধর্ম মাত্রই উপহাসের বস্তু ছিল ওর কাছে।... সেইসময়ই আমার মনে খট্‌কা লাগা উচিত ছিল না কি? তখুনি আমার বোঝা উচিত ছিল না কি, যে, আমার মতো এলিসও একটা শেকড়হীন চরিত্র আর আমাদের ফাঁপা ব্যাপারগুলোর জন্যেই একে-অপরকে ভালো লাগছে আর এই অন্ধ-সংঘর্ষই আমাদেরকে নিমজ্জিত করবে?

আমি ওকে বলতে চাই—আমি আজকাল প্রতিদিনই বলবো-বলবো করছি যে ডার্লিং এলিস, এখনও কিছু বিগড়ায়নি। এখনও, দ্যাখো, আমরা ডুবে-যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি। ভেবে দ্যাখো, কোন্ প্রতিজ্ঞা দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলাম আমরা! তোমার বাবাকে—নিজের বাবার চেয়েও বড়ো গুরু মনে করি যাঁকে, কী করে মুখ দেখাবো? তোমার অভাব কী ছিল শুনি, সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকেই পছন্দ করার দরকার কী ছিল তোমার? আমি একা ছিলাম কী এমন খারাপ ছিলাম? তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে কতরকম আঘাত পেয়েছি তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। সেইসব আঘাত তো একাই সামলে নিয়েছি। তখন কে আমার সহায় ছিল? আর এখন, তোমাকে ছেড়ে থাকার আশংকামাত্রে রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠছে আমার।...পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে! আমার এহেন অবস্থার জন্যে তুমিই কী দায়ী নও? তুমিই কি আমাকে ভেতর থেকে পঙ্গু করে দাওনি? তুমিই আমাকে প্ররোচিত করেছিল এলিস, আমি তো সারাজীবন মূক হয়েই থেকে যেতাম, কামনা ও সমর্পণের সেই দুঃসাহসী মোড় অব্দি আমাকে টেনে এনেছিল কে? তোমাকে যে আমি অন্য চোখে দেখতাম, তা কি সত্যি নয়? এটাই কি ভালো হতো না আমাদের দু'জনের পক্ষেই, যে, তুমি সেইরকমটাই থেকে যেতে—আমার কামনার ধরাছোঁয়ার বাইরে, অলভ্য হয়ে?...তোমাকে পাওয়ার তৃষ্ণা আমার মনে জাগালো কে? —তুমিই যদি নও? সবই কি মিথ্যে ছিল, নিছক জেদ ছিল তোমার? শুধুই আলম্বন ছিল একটা? তোমার একরোখা আর স্বেচ্ছাচারি আত্মার আলম্বন? তোমাকে বুঝতে আমি ভুল করেছিলাম?...এখন তুমি ফিরে যেতে পারো, কিছুই আটকাবে না তাতে? সত্যিই কি আমার কাছে কোনই প্রত্যাশা নেই তোমার?...কিন্তু আমি যে আজও তেমনি আগের মতোই রয়ে গেছি এলিস! যার হাত ধরে নিজের সমস্ত-কিছু পরিত্যাগ করে হঠাৎই চলে এসেছিলে একদিন—বিনাশর্তে আর এক ঝট্‌কায়!

সেটা কি নিছক উন্মাদনা ছিল?...আমার কথাটাও একবার ভেবে দ্যাখো, এখন আমার কোনখানে ঠাঁই হবে, বলো!...

এলিসকে আমি এই সমস্ত এবং আরও না-জানি কতো-কী বলবার জন্যে দিনরাত ছটফট করছি! কিন্তু মুখোমুখি হলেই, আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। কিছুই বলতে পারি না আমি। না, বলি ঠিকই, কিন্তু সেই কথাগুলো নয়, যা সারাক্ষণ গুমরে মরছে বুকের ভেতর। আমি শুধু সেই কথাগুলোই বলতে পারি এবং বলি, এলিস যেসব কথা শুনতে চায়। এইভাবে পক্ষান্তরে ওর অহংটাকেই আশকারা দিয়ে ফেলি। ওর তূষ্ণীভাব আমার মনে আতঙ্ক জাগায়, ওর মুখ দেখতে ভয় পাই আমি..., পালিয়ে গিয়ে নিজের কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ি,...কিন্তু কাঁহাতক? পরক্ষণেই ওর সঙ্গে কথা বলার ছুঁতো খুঁজি আমি। ওর মনের মতো প্রসঙ্গ পেড়ে ওকে তার মধ্যে জড়াতে চাই। সব কিছুতে ওর পরামর্শ চাই বলে ওর ভালো লাগে। নিজের মনের এই অসহায়তার কাছে আমি পরাস্ত—আমার এটাই হলো দুর্বলতা, বেশিক্ষণ টেনশন সইতে পারি না। সম্ভবত এলিসও পারে না। অবশ্যি, কোন্ কথার ও কিরকম রিয়্যাক্ট করবে, আগে থেকে সেটা বোঝা মুশকিল। তবে, বিরাট একটা বিস্ফোরণের পরেও যে ও সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে, এটা আমাকে আশ্বস্ত করে। নিজেকে হঠাৎ-হঠাৎ আমি বাচাল বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি আর ভাবি, এই লোকটা কে? আমি নিজেকে মনেপ্রাণে বুঝিয়ে দিতে চাই যে সব ঠিকঠাক রয়েছে আর দুজন দুষ্ট ছেলে-মেয়ে খামোকা খেওখেয়ি ভাঙাভাঙি করে মরছি, অকারণে জলঘোলা করছি...আর, এ হলো এলিস, আমার প্রিয়তমা এলিস, যে মিছিমিছি এসবের চক্করে পড়ে গেছে, নিজের অনিচ্ছায় পড়ে গেছে। আমার মধ্যে কি কোনো প্যাঁচ নেই? ধোয়া তুলসীপাতা নাকি আমি?...ও যদি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকে, তাতে আমারও দোষ রয়েছে নিশ্চয়ই। গোড়ার দিকে ওর কতো উৎসাহ ছিল, কতো প্রাণশক্তি ছিল! সেটা নষ্ট করার ব্যাপারে এই পরিবেশও সমান দায়ী, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে আমিও ছটফট করেছি। এই পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে আমিই-বা ওকে কী সাহায্য করেছি? এখন তো কিছু পড়তেও ভালো লাগে না ওর, কোনো বন্ধু জোটেনি ওর, আর আমিও থেকেছি নিজের কাজ নিয়ে। একা-একা থেকে আরও মাথা খারাপ হয়েছে ওর। ও হয়তো আমাকে দেখে আর জ্বলেপুড়ে মরে, যে, এটা আমার পরিবেশ, আমি এখানে মগ্ন হয়ে পড়েছি, আগের মতো সেই দূরত্বও আমাদের মধ্যে আর নেই, আগের মতো ঝগড়াও আর হয় না। এই জন্যেই তো আমি এমন চুটিয়ে নিজের কাজ করতে পারছি। চটপট পেপার লিখে চলেছি। ও নিশ্চয়ই আমাকে হিংসে করে। ওর হয়তো আরও বেশি করে মনে হচ্ছে যে আমি এখানে ফুলে-ফেঁপে উঠছি আর ও নষ্ট হয়ে চলেছে। তবে কি... তবে কি ও মনে-মনে

ধরেই নিয়েছিল যে আমি এখানে বেশিদিন টিকতে পারবো না আর আবার পালাবো জার্মানি আর ভারতবর্ষের নামোল্লেখ পর্যন্ত করবো না কখনও? আমার ঘৃণার ওপর এতোটা ভরসা ছিল ওর? আর এই ঘৃণায় পাকা রঙ ধরাতেই আমাকে টেনে এনেছে এখানে?

আমি মাঝে-মধ্যেই কোনো-না-কোনো অজুহাতে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকি, আমাকে না-দেখার ভান করে ওকে শুয়ে বা বসে থাকতে দেখি আমি। আমি হাসিমুখে কিছু জানতে চাইলে বরফঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় ও যা শোনার কোনো উৎসাহ থাকে না আমার। ওর চেহারার অশ্ময়য়তা আমাকে হতোদ্যম করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। আমি পুরনায় ফিরে এসে বই-খাতার স্তূপের মধ্যে গুঁজে দিই নিজেকে। এভাবে কাজের মধ্যে ডুবে না থাকলে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো। ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারি, ও কী ভাবছে।...ওর চোখের ঐ জ্বালা দেখেই সবকিছু ভুলে যাই,...এমন এক ভয় ও আতঙ্ক আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে থাকে যার আঁকড়ি থেকে ছাড়া পাওয়ার এই একটিই মাত্র পথ কোলা রয়েছে আমার সামনে।—আমার কাজ। এটাকে আমার স্বার্থপরতা ভাবা ওর অন্যায় নয় কি? সেইদিনগুলোর কথা কি ওর মনে নেই যখন এই কাজই আমাদের দু'জনকে অত কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল? ও কি ভুলে গেছে বাবার এই প্রিয় ছাত্রটিকে ও নিজেই কতখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল? এও কি আমার দোষ যে ও নিজেই আমার সঙ্গে অনন্যবৃত্তি গ্রহণ করে বারবার আমাকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছে নিজেকে পেছনে ঠেলে রেখে? এখন আমার সেই কাজেও কোনো উৎসাহ নেই ওর। কেন? এমনটা তো হবার কথা নয়! তবে কি আমার প্রতিশোধ নিতেই একধরণের মিথ্যে অনাসক্তি দিয়ে ঢেকে রেখেছে নিজেকে? ও ভালোভাবেই জানে এতে আমি কষ্ট পাই। কখনও-কখনও মনে হয়, ও শুধু আমাকে নয়, আমার কাজটাকেও তিরষ্কার করছে। আমাকে অবজ্ঞা করা মানে আমার কাজকেই অবজ্ঞা করা।...অবশ্যি, এ আমার মনের ভুলও হতে পারে।

জানি না, এই পাদ্রি মশায়ের সঙ্গে কখন কিভাবে পরিচয় ঘটলো ওর। এভাবে আমার কাছে কথা লুকোনোর অভ্যেস ছিল না আগে। একটি জার্মান টিমের সঙ্গে ও গিয়েছিল বস্তার, ওখান থেকে ফেরার পর থেকেই ওর মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। গোড়ায় তেমন খেয়াল করিনি..., প্রথম বার যখন গির্জায় যায়, তখনও কিছু জানায়নি। আমার ধারণা, অনেকদূর গড়িয়ে যাওয়ার পরই ও আমাকে জানিয়েছিল ব্যাপারটা। প্রথমটায় অবাক না হয়ে পারিনি, যাকে বলে সুখপ্রদ বিস্ময়। ওর অতিবুদ্ধিবৃত্তি আর নঞর্থকতা দেখে ঐসময় পরিবর্তনটাকে শুভ বলেই মনে হয়েছিল এবং আমি ব্যাপারটাকে এইভাবেই নিয়ে ছিলাম যে এলিসের মধ্যে ভক্তি জেগেছে, এটা শুভলক্ষণ—এর ফলে ওর মধ্যে ধর্মমাত্রের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা

ছিল, সেটা তো কাটবেই, তাছাড়া জীবনের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি একটু বেশি উদার হতে পারবে। এইজন্যেই আমিও মাঝে-মধ্যে ওর সঙ্গে চলে যেতাম। এসব আমার ভালোই লাগতো। পরে ও নিজেই মানা করে। বললো, 'তুমি নিজের সময় নষ্ট করছো কেন? গির্জায় গেলে আমি একটু শান্তি পাই, আমার মন আজকাল বিচলিত হয়ে পড়ছে, একটু সময়ও কাটে, বাড়িতে একা-একা ভালো লাগে না। কাজেও মন বসে না।' আমি এটাকে সহজ মনেই নিয়েছিলাম। তখন কোনোরকম খট্‌কা লাগেনি। ঐ পাদ্রির সঙ্গে ও যখন আলাদা ভাবে মেলামেশা শুরু করলো, তখন থেকেই ওর মাথাটা গেছে। ঐ পাদ্রিটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। প্রথমবার কথা বলেই খারাপ লেগেছিল আর এলিসের কাছে সে-কথা গোপনও করিনি। ওর সেই জার্মান বন্ধুটি এই পাদ্রির সতীর্থ ছিল একসময়। কীভাবে কী-ধরণের মানুষের সঙ্গে কোথায় এসে দেখা হয়ে যায়! এতবড়ো দুনিয়ায় এই একটিই জায়গা বেঁচেছিল দুজনের সাক্ষাৎ ঘটার জন্যে?...আর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্যে—?

রাত দশটা হয়ে গেল, এখনও ওর পাত্তা নেই। অবশ্যি এমনও হতে পারে যে ইতিমধ্যে ও এসে পড়েছে আর বসে রয়েছে ঐ বারান্দায়! কিন্তু ছিটকিনি খোলার আওয়াজ তো কানে আসেনি? খেয়াল করিনি হয়তো। আমরা দরজার ছিটকিনি না বেঁকিয়েই ওপরে তুলে দিই। দুজনেরই জানা যে বাইরে থেকে দরজার হাতল ধরে টান মারলেই খুট্ করে ছিটকিনি নিচে পড়ে যায় আর বেল বাজানোর দরকার হয় না। এ হলো সুবিধাজনক ব্যবস্থা। উঠে গিয়ে দরজা খুলতে হয় না। আবার, আগন্তুকের হঠাৎ-মুখোমুখি হওয়া থেকেও রেহাই পাই।

বারান্দায় এসে বসে পড়ি। এলিস এখনও ফেরেনি। কী হতে পারে...? এতো দেরি তো কখনও করে না! একসময় আমাকে সঙ্গে না নিয়ে বেরতোই না কোথাও। আর এখন রোজই একা বেরোয়। এখন কি তবে সত্যিসত্যি আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওর কাছে?...কিন্তু, ও না থাকলে আমিও যে একধরনের রিলিফ বোধ করি!... এসব কী হচ্ছে আমাদের? এরজন্যেই কি আমরা মিলিত হয়েছিলাম!... আমি হলফ করে বলতে পারি বাইরে বেরলে এমন-কিছু রিলিফ ও পায় না। নইলে, ফেরার পর তেমনি ঠাণ্ডা আর চুপ মেরে থাকে কেন? এখন আমার আর আমার পরিবেশের প্রতি ওর মন বিষিয়ে গেছে। কেমন অদ্ভুত লেগেছিল, প্রথম যেদিন 'আমাদের পরিবেশ' বলার পরিবর্তে 'তোমার পরিবেশ' বলতে শুনি ওকে! এভাবেই কি নিজেকে ক্রমশ আলাদা করে নিতে চাইছে ও? আমার পরিবেশের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগের অন্ত নেই। এ দেশের সবকিছুই ওর চোখে খারাপ। অথচ একসময় এখানকার প্রতিটি বস্তুই ওকে বিস্মিত করতো, উত্তেজিত করতো। সেসব কি ওর মনে পড়ে না? কী অদ্ভুত শিশুর মতো জানবার আগ্রহ ছিল! ওর এই কৌতূহল

দেখে আমিই বরং অবাক হতাম, লজ্জা পেতাম এই ভেবে আমি কতো অল্প জানি নিজের পরিবেশ আর সংস্কৃতি সম্পর্কে! ওর চোখ দিয়েই সমস্তকিছু আবার নতুন করে দেখতে শুরু করেছিলাম। এ কি ওরই দাক্ষিণ্য নয় যে, নিজের জগতের সঙ্গে নতুন করে জুড়েছিলাম আমি! এরজন্যে ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করিনি কি? কী দারুণ অনুভূতি ছিল সেটা! যে-সব ব্যাপার একসময় আমার মন ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ সেগুলো নতুন করে ভালো লাগতে শুরু করলো! এ কি জাদু-গোছের ব্যাপার ছিল না? এবং এই জাদু কি স্বয়ং এলিসই ঘটায়নি আমার জীবনে? এলিসের প্রতি আমার ভালোবাসা ঘটায়নি? এ জাদু কি নিছক ছলনা ছিল, মরীচিকা ছিল? কিন্তু সত্যি যদি তাই হতো, আমি আবার সেই ঘৃণার জগতে ফিরে গেলাম না কেন? অথচ উল্টে আমি এখানেই রয়ে যেতে প্রস্তুত, আর এলিস চাইছে ফিরে যেতে। জার্মানিতে বসে আমি যখন এ-দেশের ব্যাপারগুলো নিয়ে তুলনা করতাম, নিজের দেশের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতাম ওর কাছে, এলিস তখন হাসতো। বলতো, 'আমাকে ভয় খাইও না, আমি সব বুঝি। তোমার দেশকে আমি ভালোবাসি। সে আমার স্বপ্নের দেশ। মহান দেশ ভারতবর্ষ। ছোটবেলা থেকে ওর কথা শুনে আসছি বাবার মুখে। আর, আমাদের এই দেখা হওয়া, মনে হয়, যেন আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল। নিয়তিই আমাদেরকে মিলিত করেছে। কিন্তু আমি তোমাকে তোমার নিজের পরিবেশের মধ্যে পেতে চাই। আমাদের এই মিলন এখন অসম্পূর্ণ। তা সম্পূর্ণ হবে ভারতবর্ষে গিয়ে। তুমি আমাকে ফুসলিও না, ভয় পাইও না। অসুবিধে হয় হবে। আমি তাতে ভয় পাই না। তুমি একটু বেশিই আরামপ্রিয়, তোমার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের অভাব রয়েছে। তোমার এই অভাবটাকে আমি দূর করতে চাই—এটা তুমি বুঝতে চাও না কেন? যে কাজ তুমি ওখানে বসে করতে পারো, সেটা এখানে থেকে কিছুতেই সম্ভব নয়। এভাবে উড়ে গিয়ে ফিরে এলে কিচ্ছু হবে না। তোমার কাজের শেকড় সেখানেই চারাতে পারে যেখানে তোমার নিজের শেকড় রয়েছে।...' এসব বলে ও কতো উৎসাহিত করতো আমাকে! বিদ্রুপ করতো আমাকে। আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও।

এটাও আবার নিজেকে ভাঁওতার মধ্যে রাখার একটা উপক্রম নয় তো? সত্যি কি আমি অতটা উদাসীন ছিলাম? নিঃসন্দেহে এলিস আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল...কিন্তু আমি নিজেও কি চাইতাম না ও আমাকে অনুপ্রাণিত করুক? নিজের অজান্তে, আমার মধ্যেও কি অনুরূপ একটি অচেতন প্রেরণা কাজ করছিল না?...আমি ফিরে আসতে চেয়েছিলাম কেন? আর আমার প্রেরণা, আমার এলিসকে সঙ্গে নিয়েই আসতে চেয়েছিলাম কেন? ফিরে আসতে, আর শেকড় গাড়তে—ঠিক সেইখানে, যেখানে আমি তিরস্কৃত হয়েছিলাম—যেখানে আমাকে থিতোতে দেওয়া হয়নি

কখন?...আমি কি এলিসের সঙ্গেই, ওকে নিয়েই থিতু হতে চেয়েছিলাম?—একা নয় কেন? আমার পজিশান, আমার খেতাব, আমার বৈদেশিক সম্পর্ক...এসব কি আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না? কেন?...কেন?

এলিস এখন মনে-মনে নিজের ঐ সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত। হাজার লুকোতে চাক, ওর জানা উচিত যে ওর প্রতিটি মুখভঙ্গি আর প্রতিটি আচরণ আমার মুখস্ত। ভালোভাবেই ভুঝতে পারি যে এলিসের ঐ আশ্চর্যলোক এখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। ও জেদি আর আত্মাভিমানী। নিজের মুখে এটা কবুল করবে কি করে যে ও প্রতারিত হয়েছে! কিভাবে স্বীকার করবে যে ওর মনে এখন ভালোবাসার পরিবর্তে জমা হয়ে উঠেছে এক প্রগাঢ় আর উষ্ণ ঘৃণা, যে প্রগাঢ়তা ও উষ্ণতা সহ একদিন সে ভালোবেসেছিল! কোন্ মুখে স্বীকার করবে যে, যে-নরকযন্ত্রণা আমরা ভোগ করছি, তা আমার একার পয়দা-করা নয়—ওরও যোগ রয়েছে তাতে! কিন্তু স্বীকার করুক আর না-করুক, কী এসে-যায় তাতে? আমারও তো অনেক কিছু স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমিই-বা তা করছি নাকি? আমরা নিজের-নিজের সত্য নিয়ে মনের মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে চলেছি, কিন্তু মুখোমুখি হতে পারছি না—কেন? একেবারে ভেঙে যাওয়ার আশংকায়? এর চেয়ে বড়ো ভাঙন আর-কী হতে পারে? আমরা নিজেদের আসল চেহারা একে-অপরকে দেখাতে ভয় পাচ্ছি কেন? ওর আসল চেহারা কোন্‌টা, তা ও-ই জানে; কিন্তু আমার আসল চেহারাটা তো হলো—যা এলিস আর আমাকে মেশালে তৈরি হয়। এলিসের ক্ষেত্রেও এরকমটা হওয়া উচিত ছিল না কি? তবে, ওর এহেন আচরণের মানে?...এ সমস্তই কি ওর মনগড়া নয়?

কিন্তু আমি যখন ওর এহেন বন্ধুদের নিয়ে, যাদের সঙ্গে আমিই ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, ভাবিত নই,—তখন একা পাদ্রিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছি কেন? এটা ওর প্রয়োজন হতে পারে, সত্যিকারের প্রয়োজন, যা এতদিন বাদে ওর কাছে ধরা পড়েছে, এতে আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি কেন? ও এমন কটু হয়ে উঠেছে বলেই কি?... কিন্তু ও যে-সব কথা আমার সম্পর্কে বলে, সবই কি মিথ্যে? ওতে আমারও কি যোগ নেই কোনো? নিজেরই কর্মের ফল মুখ বুজে সহ্য করা ব্যতিরেকে আমার আর করণীয়ই বা কী?

মনে হচ্ছে, এলিস আজ ওখানেই গেছে—ওর সেই জার্মান বন্ধুটির বাড়ি। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ও ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে যে, আমি যেন ওর অপেক্ষায় বসে না থাকি, রাতে ও ওখানেই থাকবে। এর আগেও একদিন এরকম করেছে। আমার রাগের ও তোয়াক্কাই করে না আর। কিন্তু আমিই তো ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আমি নিজেও কি চাইনি যে এলিসের একটা নিজস্ব সার্কেল হোক...ওর নিজের দেশের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা

করুক, যাতে ও একাকীত্ব বোধ না করে। পরিবারটি এখানে থাকায় ভালোই লেগেছিল। এও কি অদ্ভুত ব্যাপার নয় যে আমি ওর ওপর নির্ভর করতে চাই, কিন্তু চাই না যে ও আমার ওপর নির্ভর করুক। এলিসও যে স্নায়বিক বিকারে ভুগতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি ওর মানসিক জোরের প্রমাণই বেশি পেয়েছি এবং মনে-মনে ধরে নিয়েছিলাম ওর মধ্যে সহায় হবার শক্তি রয়েছে পুরোদমে। আমি চেয়েছিলাম ও আগের মতো সেই এলিস হয়েই থাকুক চিরদিন—মুক্ত ও স্বতোস্ফূর্ত। গোড়ার দিকে ও শুধু উড়ে-উড়ে বেড়াতো। যেন এতদিন ছিল বিদেশে, আজ ফিরে এসেছে নিজের দেশে। আমি অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম। আর আমার মধ্যেও যে কায়াকল্প ঘটছে, সেটাও টের পেতাম। এলিসের জাদুই কি আমাকে ওভাবে পাল্টে ফেলছিল? এলিস এখন চাইছে আমি যেন বিদেশে, মানে ওর স্বদেশে ফিরে যাই। কি করে বোঝাই যে এখন আর সেটা সম্ভব নয়! কিন্তু অসম্ভবই বা কেন? এখন আমার এখানে এমন কী রয়েছে, যা আগে ছিল না? এই এলিস ব্যতিরেকে? যে এখন ফিরে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে!

কি করে বোঝাই যে, ফিরে যাওয়ার রাস্তা ওর জন্যে খোলা থাকলেও, আমার জন্যে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং স্বয়ং এলিসই তার জন্যে দায়ী। এখন এলিসও, যদি ও নিজেও চায়, খুলতে পারবে না। জানি, এলিস যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আমি আবার জড়িয়ে পড়বো এসবের সঙ্গে। আর, এই জড়িয়ে পড়াই ক্রমশ একদিন আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলবে। একটা ধড়হীন মুণ্ডু, যা কেউ শনাক্ত করতে চাইবে না—আমার মাও না, আমার বন্ধুবান্ধবরাও না, আমি নিজেও না।...তবে কি এলিস আমার রক্ষাকবচ? কবচের চেয়েও বেশি, এলিস কি আমার অস্মিতা, আমার অভিজ্ঞানপত্র? সত্যি যদি তাই হয়, ওর উপস্থিতি আমার কাছে অসহজ আর অসুরক্ষিত মনে হয় কেন? কেন চাই যে ও যেন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে বাইরে ঘুরে আসে? এরকম করলে যেন মনে-মনে ওর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি আমি। আমি কি সত্যিসত্যি ওর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি? এলিসও কি সত্যিসত্যি আর সহ্য করতে পারছে না আমাকে? গোড়া থেকেই ও এই ধারণা নিয়ে বসে ছিল নাকি যে আমি এখানে বেশিদিন থাকার জন্যে আসিনি? শুরু থেকেই কি ও নিজের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অভিনয় চালিয়ে আসছে? আগে যে এতো হাসিখুশি আর খোলামেলা থাকতো, সেটা কি এই কারণে যে ভেতরে-ভেতরে সে একরকম নিশ্চিত ছিল যে ওর ফিরে যাওয়ার পথ খোলা আছে? ও কি তবে একটা লম্বা ছুটি কাটাতেই আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে? এখন ওর প্রতিটি আচরণ, ওর মুখের প্রতিটি ভঙ্গি, ওর রং আর মুদ্রা আমাকে যেন ভর্ৎসনা করছে। যেন আমিই ওর সঙ্গে

ছলনা করেছি, ও নিজের সঙ্গে করেনি। কিন্তু একদিক থেকে দেখলে, ও যা ভাবছে, সেটাই কি ঠিক নয়? আমি নিজে কী? আগে দেশ ছাড়তে রাজি ছিলাম না, আর এখন বিদেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত নই। এই বিলক্ষণ পরিবর্তনকে বেচারি এলিস হজম করবে কেমন করে?

আমি এলিসের সঙ্গে থাকতে পারিছ না, ঠিক কথা। কিন্তু, ওকে ছেড়েও থাকতে পারবো না। আমি এ দেশে থাকতে পারছি না। আবার বাইরে গিয়েও থাকতে পারবো না। আমি একসময় নিজের পরিবেশ, নিজের লোকজনদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতাম। আমি অস্বীকৃত ও অবাঞ্ছিত ভাবেই ঐসব আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, পরে যাঁরা 'আত্মীয়' বলে মনে হয়নি। আর আমি এই অস্বীকৃতি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অভীপ্সায়। আর এলিসের মধ্যে, ওর নিজস্ব উদ্যোগের কারণেই, আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যা আমার অঙ্গবৈকল্য সারিয়ে তুলতে পারতো—আমার সম্পূর্ণতা ফিরিয়ে আনতে পারতো। আমার ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারতো। এবং আমার হারানো আত্মসম্মানই শুধু নয়, আমার আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়ে আনতে পারতো। আমিই কি কিছু ভুল করেছি? এলিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াও কি কাজ-চালানো গোছের ফাঁস-গেরো ছিল একটা, যা যে-কোনো মুহূর্তে আলগা হয়ে পড়তে পারতো? একটু চাপ পড়লেই—এইভাবেই ভেঙে পড়তো? তবে কি সেদিনও আমরা দুটি দেহ একপ্রাণ ছিলাম না? সবই কি ভ্রান্তি ছিল, একটা কষ্টজনক দুরাশা, যা কখনও পূরণ হবার ছিল না?

আমি যদি বিদেশ না যেতাম? যেতাম, কিন্তু শুধু ডিগ্রি হাসিল করে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফিরে আসতাম যদি? এলিস যদি আমার জীবনে না আসতো, আমি যদি কোনো এলিসকে না খুঁজতাম? আর এখানে ফিরে বিয়ে করে ফেলতাম? তারপর না-হয় আবার বিদেশে চলে যেতাম।...বিয়েটা এমন-কিছু বড়ো সমস্যা ছিল কি? ভাগীরথীর মতো একটা মেয়ে কি জুটতো না এতবড়ো দুনিয়ায়?...আমি এখনও ভাগীরথীর কথা ভাবছি কেন? সে কি আমার পিছু ছাড়বে না কখনও? এলিস যদি ওকে আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পেরে থাকে, এলিসই তবে ওকে জীবিত করে তুলছে আমার মনে। এমন তো নয় যে, নিজের অজান্তেই এলিসের মধ্যে ভাগীরথীকে খুঁজে ফিরেছি আমি?... সত্যি কি আমি ভাগীরথীর প্রত্যাশাতেই বসে ছিলাম, নাকি ওর চেয়েও বড়ো কারুকে পেতে চেয়েছিলাম, যাকে আমার যোগ্যতার প্রমাণপত্রের মতো নিজের আত্মীয়-স্বজনদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে পারতাম? এলিসই কি সেই বড়ো জিনিসটি?

...এর মধ্যে সামান্যতম সত্যতাও রয়েছে বলে যদি ধরে নিই, তাহলে এর শেকড় কোথায়? এভাবে ভাবতে শেখালো কে আমাকে? আমার বাড়ি, আমার

পরিবেশ, আর আমার দেশ যদি না শিখিয়ে থাকে, তবে কে শেখালো? এতে আমার দোষই-বা কতটুকু? এলিস, দ্যাখো, এ আমাকে কোন্ গর্তে ঠেলে দিয়েছো তুমি যে এখন নিজের ভালোবাসার অঙ্ক কষতে বসেছি। এর চেয়ে বড়ো জিত আর কী তোমার? এখন তুমি আমাকে তরবারীর ধার দেখিয়ে চালাতে পারো, চাবুক মেরেও চালাতে পারো।

এই টিপ্‌টিপে বৃষ্টি সারারাত এমনি চলবে নাকি! এটা আকাশ, না ছ্যাঁদাওলা ছাদ?...এলিস, আমার প্রিয়তমা এলিস এখন হয়তো ওর জার্মান বন্ধুটির সঙ্গে রয়েছে। এতক্ষণে শুয়েও পড়েছে হয়তো। আর আমি এই জামগাছটার সঙ্গে জেগে বসে আছি, যার হাতগুলো কাটা...যে হয়তো ফল দেবে না কোনদিনও। যাকে সমূলে উৎপাটিত করা মহাপাপ, আর যাকে ক্ষত-বিক্ষত করা, বেডৌল ও বিকলাঙ্গ করে ফেলা পাপ নয়, প্রতিবেশী-ধর্ম শুধু, দয়া ও করুণা মাত্র। আরও না-জানি কতো কী! আহুজা সাহেব, আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকুন। এলিসও আর-কোনদিন ঝগড়া করবে না আপনার সঙ্গে। আমিও কখনও একে উপড়ে দিতে বলবো না। এরই নাম সহাবস্থান। আপনি ভাববেন না—আপনার বাগান কোনো দিক থেকেই বিপন্ন নয়। ফলই নেই যেখানে, সেখানে ঢেলা পড়বে কোত্থেকে আর কেনই বা পড়বে?

জনৈক ব্যক্তির সাম্রাজ্য

জোসেফের চিঠি আজই এসেছে গোয়া থেকে। কী কাকতালীয় ব্যাপার দেখুন! কালকের মতো আজও আমি সকাল সকাল নিজের ডায়েরি উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। এই বছরের ডায়েরি, যার সব ক'টি পাতাই শূন্য—যেন, এ বছর কিছুই ঘটেনি আমার জীবনে—ঐ একটি দীর্ঘ বাদানুবাদটি ছাড়া যার সূচনা ঘটেছিল দু-তিনদিন আগে, জোশেফের সঙ্গে, এবং যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে। জানি না ঐ বাদানুবাদটিকে স্মারক করে রাখতে মন চাইলো কেন। জোসেফ এরই মধ্যে হয়তো বেমালুম ভুলে গেছে সব। দারুণ ফাস্ট লাইফ ওর। গোয়ায় তো আরও। ওর চিঠিই সেটা বাৎলাচ্ছে। জোসেফ আমার এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো কবে থেকে? আমাদের মধ্যে চিঠি চালাচালির প্রশ্নই ওঠেনি আজ অব্দি। তবু, ওর ধারণা বুঝি ওর সম্পর্কে কৌতূহলের পাহাড় জমে উঠেছে আমার মনে আর ওরও আমার সম্পর্কে জানতে চাওয়ার ততটাই অধিকার রয়েছে। প্রথমটায় তো আমি চমকে উঠেছি। ও জেনে ফেললো কী করে? পরক্ষণে দুম্ করে মনে পড়লো সেই রাত্তিরে নেশার ঘোরে ওর বাড়িতে বসে না-জানি কী-কী বলে ফেলেছিলাম।

তখুনি মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে হয়তো। আর সেটাই ওর মনে গেঁথে রয়েছে। লিখেছে, ওর ধারণা, এতদিনে আমার আত্মজীবনী লেখা সাঙ্গ হয়েছে এবং আমাকে স্বীকার করতে হবে যে সেটা সবার আগে পড়বার অধিকার ওরই। আবদার দেখুন! আমার আর আমার আত্মজীবনীর সঙ্গে জোসেফের কী মতলব? জোসেফ তো দূরের, এ যদি আর্থারের দাবি হতো, তবু বেখাপ্পা ঠেকতো। গত দুদিন ধরে আমি পুরনো ডায়েরিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছি। পুরনো মানে, গত দু'বছরের। তার আগে কখনও ডায়েরি লেখার কথা ভাবিই নি। এ রোগে ধরলো কখন, কী ভাবে? যারা ডায়েরি লিখতো, তাদেরকে নিয়ে আমি হাসাহাসি করতাম। ডায়েরি লেখার অভ্যেসটাকে নাম দিয়েছিলাম 'ডায়্যারিয়া'।

আসলে মানুষ ডায়েরি লেখে তখুনি যখন বুকের ভেতরে কিছু আটকে যায়, ফেঁসে যায়। মানুষ যতদিন পুরোপুরি বেঁচে থাকে, যতদিন পর্যন্ত তার নিজের সঙ্গে এবং অপরের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার ডায়েরি লেখার দরকার কি? এই সম্পর্কে ছেদ পড়ে যখন, তখুনি এর তাগিদ অনুভব হয়। যতদিন এলিস আমাকে ভালোবেসে গেছে, আমিও ওকে ভালোবেসেছি, আমাদের মধ্যে ডায়েরির জায়গা ছিল কোথায়? এলিস আমাকে ছেড়ে চলে যাবার পরেও এমন-কিছু তারতম্য ঘটেনি, ঐ বিশাল শূন্যে ডায়েরির ঠাঁই হতো কোথায়? শূন্যের সঙ্গে যুঝতে হলে একটা বসতি খাড়া করা দরকার। ডায়েরি লিখে হবেটা কি?... আমার বাবাও ডায়েরি লিখতেন। মোটা-মোটা যে খাতাগুলো আমার ঘরে রেখে এসেছিলেন, সেগুলো ডায়েরি ছাড়া আর কী? সেগুলো আমাকে দিয়ে পড়াতে চেয়েছিলেন কেন? উনি কি আমার কাছে নিজের দোষক্ষালনের চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন? আমাদের মধ্যে যেটুকু অস্বরস ঘটেছিল, তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, অবিকল যেমনটি এলিসের ক্ষেত্রে আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু...আমার ডায়েরিতে এলিসের কথাই বেশি করে লিখেছি, কিংবা নিজের কথা। কিন্তু বাবার ডায়েরিতে আমার নামোল্লেখ মাত্র নেই। হ্যাঁ..., ঘৃণা ও উচাটন সত্ত্বেও, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, একদিন নিছক কৌতূহলবশতই ঐ ডায়েরিগুলো আমি উল্টে-পাল্টে দেখেছিলাম। মোট পাঁচখানা পেটমোটা রেজিস্টার আর একটা মোটা-মতো খাতা। ...পুরো পাঁচ বছর উনি বাইরে কাটিয়েছিলেন কিনা। ফি বছর একটা করে নতুন রেজিস্টার লিখে ভরিয়েছেন। আর ঐ খাতা? তাতে, শুধু উদ্ধৃরণ। গীতা, রামচরিতমানস...এবং আরও না-জানি কতো কি! প্রতিটি উদ্ধৃরণ রীতিমতো রেফারেন্স সহ। এ ছিল ওঁর রেফারেন্স-বুক, বাকিগুলো ওঁর ফিল্ড-ওয়ার্ক। ওগুলোর প্রতি আমি যে আসক্ত হতে পারিনি সেটা বলাই বাহুল্য। আমার সঙ্গে ওঁর যে কখনও কোনো মনকষাকষি বা ঐ গোছের কিছু ঘটেছে বা ঘটতে পারে, তার আভাস-মাত্র সেখানে নেই। অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিতে লেখা ঐ পঞ্চাংক নাটকে

আমাকে 'এক্সট্রা' পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন না? সেখানে ওঁর নিজের রোলটাও স্বাভাবিক ছিল না, ছিল অনেকটা বহুরূপীর মতো—যে মেলায়-মেলায় ঘুরে বেড়ায় শুধু।...

ঐ হাজার-হাজার মানুষের ভিড়ে, কণ্ঠস্বরের ভিড়ে তাঁকে শনাক্ত করাও কতো দুরূহ ছিল! সেটা আক্ষরিক অর্থে ডায়েরি হলেও না-হয় কথা ছিল। ঐ সময় আমার সেটাকে হট্টগোল ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি—বেঢপ, বেস্বাদ হট্টগোল—আমি তা সইতাম কি করে?... আমার নিজেরই সমস্যা কম ছিল নাকি যে ওঁর মতো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বোঝা বয়ে বেড়াতাম! আপনি স্যার, ডায়েরিগুলোর প্রতি আমার অনাসক্তির কারণটা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন! কেন আমি বস্তাটাকে ঐদিনই ওঁর ঘরে ফেরৎ রেখে এসেছিলাম? ওঁর কি একটু খারাপ লেগেছিল? লাগবারই কথা। সেগুলো ওঁর 'দস্তাবেজ' ছিল, যেমনটি উনি নিজেই বলতেন। আসলে তা ছিল, ওঁর বাল্যবন্ধু রামদত্ত মাস্টারের ভাষায়, 'একজন মানুষের সাম্রাজ্য'। জানি না কুন্দন আপনাকে বলেছে কিনা, যে, ঐ রেজিস্টারগুলো সম্পর্কে রামকাকার ধারণা কতো উঁচু ছিল। আসলে দুজনেই ছিল ঘুঁটের এপিট-ওপিঠ। এই কথাটাই তো জোসেফ বুঝতে চায় না। ওর ধারণা, ওঁদের দুজনের মধ্যে প্রাকৃতিক না হলেও, অন্তত ঐতিহাসিক শত্রুতা থাকা উচিত ছিল। দেড়শো বছরের তালিম তো আর মিছে হতে পারে না,—সামান্য একটু প্রভাব থাকাটাই কি স্বাভাবিক ছিল না? কাকতালীয়ই যদি ধরা হয়, তবে, আমার আর জোসেফের বন্ধুত্বটাই কি নিছক কাকতালীয় নয়? আবার এহেন কাকতালীয় ব্যাপারকেই বা কী বলা যায়, যে, আজই আমার কাছে গোয়া থেকে জোসেফের চিঠি এলো, আবার আজই সেই একই ডাকে রামকাকার চিঠিও পেলাম। সেই পুরনো রচনাশৈলী, সেই একই রসবোধ...। লিখেছেন ঃ 'তুমি স্বীয় গচ্ছিত ধন বুঝিয়া লইতে কখন আসিতেছো কুন্দন? আর কতদিন ইহা সামলাইবো আমি? স্মরণ আছে, তুমি মাত্র একটি খাতা আমার কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলে।—কোটেশান-সম্বলিত খাতাটি। আসল রেজিস্টার গুলি যে আমার কাছেই রহিয়া গিয়াছে ভাই! সেগুলির কী করিব?... সৌভাগ্য জানিও যে উইপোকারা আমার বাড়ি দেখে নাই, নতুবা কবেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। আমি এখন উর্দ্ধগমনের হেতু দিন গুনিতেছি। কখন পরোয়ানা আসিয়া পড়ে, বলা যায় না। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, ইহাই কি বন্ধুত্ব-রক্ষার নিয়ম? সমস্ত ব্যাপারে আমাকে পিছনে ফেলিয়া—আমার আগে আগে চলা—তোমার এই স্বভাব বিন্দুমাত্র পছন্দ নহে আমার। অন্তত শেষ কিস্তিটি আমাকে মাৎ করিবার অবসর দিতে। একটিবার অন্তত আমাকে আগাইয়া যাইতে দিতে! কিন্তু সেই কাঁড়াদাস সম্মত হইবে কেন? তাহার তো পাখনা গজাইয়াছিল। নিজের বোঝা আমার উপর চাপাইয়া দিয়া দিব্যি উড়িয়া গেল। আমি তো তাহাকে যাইতে-

যাইতেও করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, দেখ, তোমার ত্বরা থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ভুলিও না যে আমার কর্মভোগও তোমার চাহিতে কিছুমাত্র কম নহে। তুমি তথায় গিয়া দেবতাদিগের দ্বারা অহোরাত্র পরিবৃত হইয়া থাকিলেও আমাকে বাদ দিয়ে তোমার সেথায় মন বসিবে না। এমন মনে করিও না যে এখানে বসিয়া আমি তোমার নাম জপ করিব। তুমি সেথায় পৌঁছিয়া চেষ্টা করিয়া সত্বর আমার পারমিট পাঠাইয়া দিও। কিন্তু মনে হইতেছে, সে ভুলিয়াই গিয়াছে তাহার রমদাকে। কিন্তু আমি বিস্মৃত হই নাই। ব্রাহ্মণের স্মৃতিশক্তি অতি নির্লজ্জ হয়, কুন্দন। কিছুই বিস্মৃত হয় না সে, কদাপি না। ইহা তাহার বরদান, ইহাই তাহার অভিশাপ।...অতএব তুমিও আমার মতো পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। শীঘ্র আসিও এই জঞ্জালের দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্ত করিতে। তোমারই গচ্ছিত সম্পত্তি ভাই, তুমিই ইহাকে সামলাও...ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

জবাব দিতে হবে রামকাকাকে, এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দিতে হবে। শুধু জবাব দিলেই চলবে না, অনন্তপুরে গিয়েও পেঁছতে হবে। ঐ একটিই তো স্মৃতিচিহ্ন বেঁচেবর্তে আছে নারায়ণ টাম্‌টা-যুগের।...আমি ফিরছি রামকাকা, এবার আর গাফিলতি হবে না,—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

কিন্তু তার আগে এই জোসেফ-পুরাণটা সেরে নিতে হবে আমাকে। ওর সঙ্গে সেদিন যে দীর্ঘ বিতর্ক ঘটেছিল, তার যে স্মারক ডায়েরির বুকে খাড়া করেছি, সেটা আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাই আগে। পুরনো ডায়েরির একটা নমুনা আগেই পেশ করেছি আপনার খিদমতে। এবার এটা হজম করতে পারলে করুন।

আমার ধারণা, আপনার মতো এলিসও নিশ্চয়ই এই ডায়েরিটা পড়ে ফেলেছিল। আমার ষোলো আনা বিশ্বাস। কেননা আমি নিজেও সেটা চেয়েছিলাম। অন্তত এটুকু ঘাঁটাঘাঁটি সে করেই ছিল, যেটুকু আমি, আনমনেই হোক, বাবার রেজিস্টারগুলো নিয়ে করেছিলাম। কী লাভ হলো তাতে? আমার আর এলিসের মাঝখানে যে ফাটল ছিল, সেটা কি তাতে ভরাট হতে পারলো?...আমার আর বাবার মাঝখানের সেই সাঁকোই কি বাঁধা হতে পারলো? কেমন মজার ব্যাপার দেখুন, আমাকে ডায়েরি রাখতে শিখিয়েছিলেন আমার বাবাই। খুব ছোটো বয়েসে। হয়তো উনি বিশ্বাস করতেন, এতে মানুষ সত্যি বলতে শেখে। নিয়মিত ডায়েরিটা দেখতেন উনি। ব্যস, কম বয়েসের ঐ দু-তিনটি বছর ব্যতিরেকে আমি পরে কখনও রোজনামচা লিখিনি! লিখতে ভালই লাগতো না। তাছাড়া বাবাও আর পীড়াপীড়ি করেন নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অব্যাহতি দিয়েছিলেন। স্বয়ং তাঁকেও আমি কোনদিন ঐভাবে ডায়েরি লিখতে দেখিনি। তবে কি উনি আমার মাধ্যমেই নিজের শখ মেটাতে চেয়েছিলেন? হয়তো তাই। কিংবা এও হতে পারে যে এসব ঝামেলা তিনি অনেক আগেই চুকিয়ে-বুকিয়ে নিয়েছিলেন বলে পরে আর তার প্রয়োজন বোধ করেননি। সত্যি

কথা বলা ততদিনে তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজ হয়ে গিয়েছিল।...কিন্তু সত্যিই যদি তাই হয়, তবে ঐ অজ্ঞাতবাসের দিনগুলিতে হঠাৎ নতুন করে ডায়েরি লেখা শুরু করে দিলেন কেন? তবে কি ঐ সময় তিনি আগের চেয়েও বড়ো কোনো সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন? যাতে তিনি তেমন-অভ্যস্ত ছিলেন না?... আমিই বা হঠাৎ ডায়েরি লেখা সুরু করে দিলাম কেন? আমি তো আর বাবার মতো অজ্ঞাতবাসে বেরিয়ে পড়িনি কখনও! এলিসের সঙ্গেই বাস করেছি।

আর যখন সত্যিসত্যি অজ্ঞাতবাসের সময় এলো, আপনিই দেখতে পাচ্ছেন আমি কী করছি! আমি এতদিন ধরে যা করে চলেছি আপনার সঙ্গে, কিংবা বলতে পারেন, আমার নিজের সঙ্গে,—এটাকে আপনি ডায়েরি লেখা বলবেন কি? না। যদি ডায়েরি লেখাই আমার অভিপ্রেত হতো, তবে ছাড়া পাওয়া-মাত্র আপনার কাছে ছুটে এলাম কেন? আমার নিজের ডায়েরির ওপর আমার নিজেরই আস্থা নেই। নচেৎ এলিসের ব্যাপারে, ওর-আমার সম্পর্ক ব্যাপারে আপনার দুর্দম্য কৌতূহল প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও আমি সেই দু-বছরের কাঁচা-পাকা চিঠিগুলোকেই আপনার সামনে পেশ করার প্রয়োজন মনে করলাম না কেন? যেহেতু তাতে আপনার ধারণার তারতম্য কিছুই ঘটতো না। তারতম্য ঘটার থাকলে আমার ক্ষেত্রেই ঘটতো, এলিসের ক্ষেত্রে ঘটতো। আমাদের ক্ষেত্রেই কোন তফাৎ ঘটলো না যখন, তখন আপনার ক্ষেত্রেই বা কি করে ঘটবে। আপনি দেবতা নাকি? আমার আর এলিসের যে-দুনিয়ায় বাস, সেখানকার বাসিন্দা নন আপনি? আপনি কি ভুল বোঝাবুঝির যাবতীয় সম্ভাবনার উর্দ্ধে, বিশুদ্ধ অন্তর্যামী? আপনি মশাই যে-ই হোন না কেন, শুধু এই কুন্দন-জোসেফ সংলাপটি হজম করুন, তারপর আপনার সঙ্গেই ঈশ্বর যদি সহায় হন, গল্পের বাকি অংশটুকুও উতরে যাবে।

কুন্দন-জোসেফ সংলাপ

জোসেফ—ধর্মচেতনা আর ইতিহাসচেতনা...! আমি বুঝলাম না কুন্দন, তুমি ঠিক কী বলতে চাও?...এটাই কি তোমার রিসার্চের সাবজেক্ট?

কুন্দন—শোনো,...এই আকাশ, হোক—এই পৃথিবী, এই অন্তরীক্ষ্য যেমন নির্ভয়, ঠিক তেমনি, আমার প্রাণও ভয়মুক্ত হোক—এই হলো ভারতীয় ধর্মচেতনার গোড়ার কথা। বুঝেছো জোসেফ? এটা ধর্মচেতনা, ইতিহাসেচেতনা নয়। আর...

জোসেফ—আমার সমঝদারিতে, এ হলো সেই প্রকৃতিপূজাই। প্যাগানিজম। এতে ধর্ম আসে কোত্থেকে?

কুন্দন—কেন? তোমার মতে ধর্মের উপাদান কী-কী?

জোসেফ—ভাঁড়ামি কোরো না। এতে না আছে সৃষ্টির ইতিহাস, না সেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরেরই সুলুকসন্ধান। তুমি বলছো উপাসনা। এ আবার কেমনতরো উপাসনা! কার উপাসনা? কাকে সম্বোধিত? ইশ্বরতত্ত্ব ব্যতিরেকে...

কুন্দন—নাই বা থাকলো ঈশ্বরতত্ত্ব ; নৃতত্ত্ব তো আছে। অভয়-সাধনা তো রয়েছে। তোমার বাইবেল মোতাবেক, পরমেশ্বরের ভয়ই চৈতন্যের সূচনা। এ আবার কেমন ধর্মচেতনা যার সূচনা ভয় থেকে? আদ্যন্ত শুধুই ভয়! এ ধর্মবোধ, না ইতিহাসবোধ?

জোসেফ—ধর্মবোধ আর ইতিহাসবোধকে আলাদা করে দেখছো কেন? যাক গে, কিন্তু এই যে তুমি বললে, এতে অ্যানথ্রপলজি এলো কেত্থেকে?

কুন্দন—কেন? খৃষ্টান মিশনারিদের অ্যাডভেঞ্চার থেকেই কি সূত্রপাত ঘটেনি এই শাস্ত্রের? যাঁদের মধ্যে ছিল স্বকীয় ধর্মচেতনা, আবার আমাদের মতো ইতিহাসচেতনাও ছিল। যাক সে কথা, তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দাও শুধু, ভয় আর বুদ্ধির পাশাপাশি অবস্থান হতে পারে কি? ভয় আর বুদ্ধির মধ্যে তুমি শুধু একটাকেই গ্রহণ করতে পারো। ভয় তো নিছক ভয়ই। পরমপিতার প্রতি ভয় জন্মালেই কি তা অভয় হয়ে ওঠে? একদিকে তোমার কাম্য ধর্ম-নিরপেক্ষ চরম দুঃসাহসিক চেতনা, আর অন্যদিকে ভয়াশ্রিত চেতনা। এ কি সম্ভব?

জোসেফ—সম্ভব নয় কেন? সম্ভবই তো। তুমি কি সেই যৎসামান্য পশ্চিমি ফিরিস্তিটাকেই মনে-মনে স্বীকার করে নাও নি? তার মুখাপেক্ষী নও? নিজের দেশের অনাচার দেখো, সেটা কি তারচেয়ে ভালো? জাতপাত দ্বন্ধ আর স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কি ভয়ের ওপর আশ্রিত নয়? ভারি এসেছো অভয়ওয়ালা! বেদের দোহাই দিয়ে হবেটা কি শুনি? হিন্দুদের চেয়ে ভীরু জাতি আর কোথাও আছে কি?

কুন্দন—হিন্দু বলছো কেন? বলো হিন্দুস্তানী। তোমার বলবার অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিই কায়েম ছিল ভয়কে আশ্রয় করে, তাহলে আমি সেটা মানতে পারছি না। সে-যুগে মানুষের চোখে রক্তাক্তদন্তনখরা প্রকৃতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ ছিল। ধর্মচেতনার ওপর সেই ভয়াবহতার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। হ্যাঁ, জাতপাতের যে গোঁড়ামির নাগপাশে এই সমাজ আবদ্ধ হয়েছে তা অবশ্যই আততায়ীদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে জন্ম নিয়েছিল, এটুকু মেনে নেওয়ার মতো ইতিহাসচেতনা, তোমার মতো, আমার মধ্যেও রয়েছে। তবু একথা সহজেই অনুমেয় যে, শুধু ভয় থেকে কোনোকালেই ধর্মচেতনা আসে নি। নিছক ভয়ের ভেতর এক ধরনের শুষ্কতা আছে যাতে গলা শুকিয়ে আসে। ধর্মচেতনার সঙ্গে এর কোথাও একটা গভীর অমিল আছে। আদিম ধর্মচেতনার ওপর অজ্ঞতার ছায়া গভীর হয়ে পড়েছে, আজকের ধর্মও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু কোনো যুগের ধর্মই শুধু এই উপাদানে গড়া নয়। যে-বিশ্বকে মানুষ সম্পূর্ণ জানে না, যাকে সে ভয় করে, তবু যার সঙ্গে সে মমতায় জড়াতে চায়,

সেই বিশ্বই আদিম মানুষেরও ধর্মচেতনার বিষয়। আর, ঐ যে তুমি বললে কাপুরুষ জাতি, এ তোমার ব্যক্তিগত মত, যা নিছক ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার দ্বারা পুষ্ট। ওরকম জাতীয়তাবাদী ওজস্বিতার আমরা কখনও প্রয়োজন বোধ করি নি, এখনও করি না। আমি এও স্বীকার করি না যে পরাধীনতা বা গোলামির বিরুদ্ধে আমরা কখনও রুখে দাঁড়াই নি। আমরা আগাগোড়া লড়াই করে এসেছি। আর ভারতীয়দের সেই বীরত্বের কাহিনী অন্য কোনো দেশের তুলনায় কম নয়। নিছক আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী ঐক্য বলতে যা বোঝায়, তার অভাব আজও রয়ে গেছে, এটা মানি। কিন্তু সেটা এমন-কিছু দোষের নয় যে লজ্জিত হতে হবে। এই ঐক্য সহজবোধ্য, আর ভারতীয়দের তা আয়ত্ত করতেও বেশি সময় লাগবে না, তুমি দেখো। বরং আশংকা হয়, সেটা আয়ত্ত করতে গিয়ে এদেশের আসল ঐক্যই ভোগে না চলে যায়। নিজেদের ঐতিহাসিক দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে, শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্র কায়েম করার দুরাশায় নিজস্ব পরিচিতি, নিজস্ব সাংস্কৃতিক গরিমাই যেন নষ্ট হয়ে না যায়।

জোসেফ—এই সাংস্কৃতিক গরিমা আবার কী বস্তু ভাই? ও তো আদিবাসীদেরও থাকে। আমার বাবা আদিবাসী ছিলেন, আমার ঠাকুরদা আরও খাঁটি আদিবাসী থেকে থাকবেন হয়তো। কোথায় গেল আমার সেই সাংস্কৃতিক অস্মিতা? তুমিই বা কতদিন নিজের তথাকথিত আদিবাসী-শুচিতা জিইয়ে রাখতে পারবে। এ কি ইতিহাস আর অগ্রগতি থেকে পলায়ন নয়?

কুন্দন—মোটেই না। ভারতবর্ষই এমন এক দেশ যার প্রাণ নিজের আদিবাসী অভিজ্ঞতার স্মৃতিসমূহকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতির যাবতীয় উত্থানপতন-সহ সর্বদা কায়েম রেখে এসেছে। তথাকথিত প্রগতির তাগিদে আমাদের কখনও তাকে মুছে ফেলার দরকার হয়নি। না দেশে, না কালে। ইউরোপের কথা বাদ দাও জোসেফ। এ হলো ভারতবর্ষ, আমরা সৃষ্টির নিয়ম পোষণ করি, ইতিহাসের নিয়ম নয়।

জোসেফ—বেড়ে বলেছো! কুন্দন তামতা সৃষ্টির নিয়মে গড়া আর জোসেফ কিস্পোট্টা ঐতিহাসিক নিয়মে! এই তো?

কুন্দন—জানি না...

জোসেফ—জানি না, মানে? নৃতত্ত্বশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে একজন সাম্প্রদায়িক হিন্দুর মতো কথা বলছো? নৃতত্ত্ববিদের মতো কথা বলো।

কুন্দন—বেশ আমি নৃতত্ত্ববিদের মতো করেই বলছি। শোনো প্রফেসার জোসেফ, এই যে আদিম উপজাতি, এরা সেই ব্রাত্য মানবজাতিই, যাদেরকে অধোগতি থেকে উদ্ধার করে সভ্যতার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করা আমাদের মতো মানুষের কর্তব্য। আর সভ্য মানবের অর্থ হলো যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের এক একবাদ্বিতীয়ম প্রতিভূ বলে স্বীকার করনেওয়ালা।...তাই না?

জোসেফ—আজ্ঞে না। তুমি প্রাক্‌প্রত্যয় থেকে একথা বলছো। আর এতে তোমার নিজের সাবজেক্টই অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। অ্যানথ্রপলজি অনুযায়ী...

কুন্দন—...হ্যাঁ, আদম মানব হলো ইডেনের বাগানের নিষ্পাপ ও পবিত্র মানব। আর আমরা যারা তাঁর জীবনে গোয়েন্দাগিরি করছি, আমরাই পতিত মানব। কেননা কোনো ইশ্বর মানুষকে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করেনি, করেছে স্বয়ং মানুষই। অর্থাৎ সভ্যতার রেসে পাল্লা দেওয়া মানে নিজেদের দোষহীনতা খুইয়ে ফেলা। সেই স্বর্গ ফিরে পাওয়ার রাস্তা বাৎলাবে নৃবিজ্ঞান। তাই তো?

জোসেফ—আজ্ঞে না, বাজে কথা বলছো তুমি। আদিম মানব বা আদিম উপজাতি অচ্যুত মানব নয়...

কুন্দন—বন্ধু, অচ্যুত তো হিন্দু দেবতার নাম। ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম।

জোসেফ—হবে হয়তো। আমরা ওরকম দুরাচার করি না। মানুষ মানুষই, ভগবান ভগবান। দুটি পৃথক জিনিস, আর আলাদা-আলাদা থাকাই উভয়ের জন্যে শ্রেয়। বুঝেছো! হ্যাঁ...আমি বলছিলাম, আদিবাসী মানব ইডেনের বাগানের অচ্যুত মানব মোটেই নয়। সেও আমাদের মতো তথাকথিত সভ্য মানবের মতোই চ্যুত, ততটাই ভ্রষ্ট বা পতিত। সভ্য মানবের নকল মাত্রে তাদের উদ্ধার সম্ভব নয়। আবার, আদিবাসীদের অনুকরণ করে, অর্থাৎ সভ্যতার প্রগতিধারাকে বানচাল করে অগ্রগতির রথের চাকা উল্টোমুখে ঘুরিয়ে দিলেই আমরা স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে যাবো, এমন কথা নয়। জ্ঞান ফল আস্বাদন করা বা না-করা কি মানুষের হাতে? আমাদের সঙ্গে আদিবাসীদের তফাৎ শুধু এইটুকু যে তারা উন্নতি করতে পারেনি, তাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধেনি। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি বা জীবন-সংগ্রামের অভাবজনিত কারণে সমস্যা জন্ম নেয়নি আর সমস্যার অভাবে বুদ্ধিও বিকশিত হতে পারেনি। অন্যদিকে আমাদের সভ্য দুনিয়া ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক সমস্ত স্তরে পদে-পদে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের বুদ্ধি ক্রমশ আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্যা আমাদের শুধু এটুকু জানাতে পারে যে, তারা একেবারে অসভ্য আর আমরা অতি অভদ্র। এই বিদ্যা তাদের লাইফ-স্ট্রাকচারের হদিশ দিতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে তারাও মানব সভ্যতার একটা পরিক্রমা সাঙ্গ করেছে বটে, কিন্তু আমাদের তুলনায় তারা অনগ্রসর থেকে গেছে, যেখানে ছিল সেখানেই আটকে থেকে গেছে। তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে চলা আমাদের কর্তব্য। নইলে আমরা প্রগতিকেই ধোঁকা দেবো, নিজেদের 'কমন হিউম্যানিটি'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে সেটা জেনেশুনে তাদেরকে ঐ অনুন্নত অবস্থায় ফেলে রাখি কি করে? সেটা পাপ হবে।

কুন্দন—তা তো বটেই, তা তো বটেই। আর ঐ সমাজকে সমূলে উচ্ছেদ করা—

তাদেরকে তাদের শাশ্বত পরিবেশ থেকে উৎপাটন করা, খেদিয়ে তাদের ওপর বলপূর্বক নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা—সেটা পাপ ছিল না?

জোসেফ—ছিল, আবার ছিলও না। সেটা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ইতিহাস-চক্র যদি স্থির না থাকে, তাহলে, যারা অগ্রসরমান জাতি, তারা এগিয়ে যাবেই। জঙ্গল বিনষ্ট হবেই, খনি গড়ে উঠবেই, সড়ক তৈরি হবেই। আদিম পরিকাঠামোর সর্তে তো আর জীবন চলতে পারে না। তা উদ্যমশীল সভ্য মানবের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই অনুসরণ করবে। নিজের দেশের দিকেই তাকাও—বিগত শতাব্দীতে যে চতুর্মুখী বিকাশ এদেশে ঘটেছে তা কি দশগুণ দ্রুত গতিতে ঘটেনি? আদিবাসী এলাকাগুলোর দিকে তাকাও—এই মন্থরগতির সমাজেও কেমন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে সব! আমি হলফ করে বলতে পারি, আগামী একশো বছরে একজন আদিবাসীও আর আদিবাসী থাকবে না। তোমরা নিজেরাই যদি পশ্চিমের তুলনায় বেশি সভ্য ছিলে, তাহলে তাদের কায়েম-করা গণতন্ত্রটাকেই এদেশে রেখে দিলে কেন? গণতন্ত্র মেনে নিয়েছো যখন, তখন ওয়েলফেয়ার স্টেট, সৈন্যতন্ত্র, শিক্ষাতন্ত্র এসবও গ্রহণ করতে হবে। তোমার মনে বুঝি এই ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে বসে আছে যে পশ্চিমি দেশগুলোই যাবতীয় পাপকর্ম করেছে, তোমার দেশ তো ধোয়া তুলসী পাতা, তোমাদের সংস্কৃতি খুব মহান, তোমাদের ইতিহাস একেবারে নিষ্কলঙ্ক! কিন্তু এ মিথ্যে। আসলে পূর্ব-পশ্চিমের প্রশ্নই এটা নয়। পৃথিবীর সমস্ত সমাজের এই একই নিয়তি ঃ প্রগতি, নিরন্তর প্রগতি—যেখানে একটিই সভ্যতা থাকবে, একই প্যাটার্নের শিক্ষা আর একই ধরনের লক্ষ্য। একই রাজনীতি হবে ; আর একটিমাত্র ধর্ম থাকবে, যদি ধর্ম ছাড়া কাজ না চলে, তাহলে।

কুন্দন—আর, সেই একমাত্র সভ্যতাটি তো পশ্চিমি সভ্যতাই হতে পারে, একমাত্র ধর্মটি হবে খৃষ্টধর্ম। তাই না?

জোসেফ—যাই হোক না কেন, কী এসে-যায় তাতে? যে ধর্মটি সবচেয়ে প্রগতিশীল হবে, তাকেই স্বীকার করবে মানবতা। তুমিই বলো না, সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম কোনটা?

কুন্দন—ধর্ম, আবার প্রগতিশীল? তাও কি সম্ভব? ধর্ম তো সনাতন মূল্যবোধসমূহের সনাতন দর্শনই হতে পারে। হাক্সলির প্যারেনিয়াল ফিলজফি। নয় কি?

জোসেফ—হাক্সলিকে ঢাল বানাচ্ছো কেন? সনাতন হিন্দুধর্মের কথা বলো, যা নিজেদের মধ্যেই ছুঁৎমার্গ বজায় রেখেছে, তাদেরকে মন্দিরে ঢুকতে দেয় না, জল ভরতে দেয় না। প্রতিক্রিয়াবাদের সেই সনাতন দুর্গ, যাকে ভাঙার চেষ্টা করে মধ্যযুগের তামাম ভক্তি আন্দোলন, আধুনিক যুগের সমস্ত সংস্কারবাদী আন্দোলন—ব্রাহ্ম সমাজ, আর্যসমাজ, আরও না-জানি কতো কী, সমস্ত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সেই ধর্ম ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র ধর্ম হিসেবে গণ্য হবে

বলে তুমি মনে করো? তুমি নিজেকে একই সঙ্গে সনাতনী আর প্রগতিশীল বলে মনে করো?

কুন্দন—নিঃসন্দেহে।

জোসেফ—এই হঠাৎ ধর্ম-পরিবর্তনের কারণ? তুমি যে বলতে তোমার কোনো ধর্মই নেই আর কোনো দেবী-দেবতাকেও তুমি মানো না?

কুন্দন—সে তো এখনও মানি না। ধর্ম-পরিবর্তনের কথা তুমি বলতে পারো, আমি না।

জোসেফ—কেন বলতে পারো না? তুমি হাক্সলির কথা বলতে পারো। নিজের সনাতনী পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতে পারো, দেখো, বিশ শতকের সবচেয়ে তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিজীবীকে আমরা বৈদান্তিক বানিয়ে ফেলেছি। ঠিক কিনা? কিন্তু তোমাদের ঐ রামকৃষ্ণ মিশনটা কী? একদিকে মিশনারিগুলোকে গালমন্দ করো যে ওরা অস্পৃশ্যদের, আদিবাসীদের খৃষ্টান বানিয়ে চলেছে, আর অন্যদিকে নিজেদের সংগঠন খাড়া করার জন্যে ওদেরই বিকৃত অনুকরণ করবে? তুমি তো নিজে একজন শূদ্র, কুন্দন। সনাতন ধর্ম তো উঁচুবর্ণের। তার প্রতি তোমার এমন উগ্র পক্ষপাত কেন? আগে তো এসব কথা বলতে না! ইতিমধ্যে কোনো গুরু জুটিয়ে নিয়েছো নাকি?

কুন্দন—ধরে নাও, তাই। তুমি যথার্থ বলেছো, আমি শূদ্র। ঠিকই বলেছো যে সনাতন ধর্ম হাক্সলির প্যারেনিয়াল ফিলজফি মাত্র নয়, বর্ণাশ্রমধর্মও বটে। একদিকে এ হলো ধর্ম, অন্যদিকে মানবতা। আমিও ধরে নিলাম যে মিশনারিগুলো তোমাদের উদ্ধার না করলে তোমরা যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই পড়ে থাকতে—তুমি প্রফেসার জোসেফ হতে পারতে না। সহস্র বছর ধরে আদিবাসী উপজাতিরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বাস করে আসছে। তাদেরকে সামান্য ঘষে-মেজে নিজেদের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার কথা কেউ ভাবেনি, তাদের স্বায়ত্ত জীবন-পদ্ধতি থেকে বার করে এনে নিজেদের বিরাট সংগঠনের অঙ্গ করে নেওয়ার কথা কেউ চিন্তা করেনি। একে খৃষ্টানদের প্রখর ধর্মদৃষ্টিই বলবো যে, যে-কাজ হিন্দুরা হাজার-হাজার বছরে করতে পারেনি, তা তারা খুব কম সময়ের মধ্যে করে দেখিয়েছে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি, খৃষ্টধর্মকে ভারতীয় ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল বলে ধরে নিতেই হবে। সম্ভবত এই কথাটাই তুমি বলতে চাইছিলে, তাই না? কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল অন্য। আমি মৌলিক জীবনমূল্যের প্রশ্ন তুলেছিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল মানুষের ধর্মচিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের নির্বহন-সমস্যা। তোমার কি মনে হয় না জোসেফ, সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হবে সেটি যে নিজের মধ্যেই এই দুটি গুণের জন্ম দিতে পারবে: ধর্মসম্মত বৌদ্ধিকতা আর বুদ্ধিসম্মত ধার্মিকতা। এমন মূল্য-ব্যবস্থা যাতে ধার্মিক হওয়ার জন্যে নিজেরই বুদ্ধিকে অপমান করার

দরকার নেই, আর বুদ্ধির বিকাশ ধার্মিকতাকে অর্থাৎ প্রাণীজগতের প্রতি মৌলিক নম্রতার কোনো হানি না ঘটে। আমি বলছি না যে, এ কাজ সহজ। কিন্তু ভারতবর্ষ, তুমি স্বীকার করো বা না-করো, এই পরীক্ষারই পরীক্ষাগার। মানুষের ভেতরে যে মূর্তি-পূজক আদিবাসীটি বাস করছে আর মানুষের ভেতরেই যে নিরন্তর জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নাকুলতা রয়েছে—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের জেদ, ভারতবর্ষের একেবারে নিজস্ব জেদ। এই জেদ পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্যেও , প্রকৃতি ও পুর্বপুরুষের মতো বিভিন্ন ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া অনিবার্য মনে করে। এভাবে তা মানুষের বুদ্ধি ও উচ্চাকাঙক্ষাসমূহকেও গৌরবান্বিত করার ব্যবস্থা করে। যেখানে এতবড়ো লক্ষ্য রয়েছে, এতবড়ো ঐক্যসাধনার সংকল্প রয়েছে, সেখানে মাঝেমধ্যে একটু-আধটু গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকাটাই স্বাভাবিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় ঐতিহ্য ও সাংগঠিক-কৌশল থাকা সত্ত্বেও ইউরোপকে সমানতা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়সম্মত সমাজের নিছক বুদ্ধিগত অধিগমনে পৌঁছতেই সহস্রাব্দ কেটে গিয়েছিল। তুমি একটু ভেবে দ্যাখো যে, যে-সংস্কৃতির আদিতম অঙ্গীকার হলো—নর ও নারায়ণ ভিন্ন নয়, একই—তাকে মানুষে-মানুষে তোমার সেই অভিধেয় সামাজিক সাম্যে পৌঁছতে, তা চরিতার্থ করতে কতটুকু সময় লাগবে? আমরা হাজার বছরের দাসত্ব থেকে সদ্য মুক্ত হয়েছি, আর সত্যি বলতে কি, সেই পরাধীনতার জন্যে আমাদের সামাজিক দুর্বলতার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী ছিল আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের দুর্বলতা। তুমি বলবে, ইংরেজ জমানায় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রতন্ত্র অন্তত জন্ম নিতে পেরেছিল যা গোটা ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছিল। কিন্তু প্রিয় জোসেফ, সেই ঐক্যের কী দাম যা সমাজের অন্তর্শক্তিকেই নষ্ট করে দেয়? আমাদের কতো চড়া দাম গুণতে হয়েছে তার, বলো! দেশ ভাঙলো, সমাজ ভাঙলো, আমাদের দেশ কোন্ পথে চলবে সেটাও অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। আমি বলছিলাম জোসেফ, পরমেশ্বরের ভয়কেই চেতনার সূচনা বলে যে মনে করে, সেই উত্তম। তার ভয়েরও অবলম্বন রয়েছে, সর্বতন্ত্র-স্বাধীন বুদ্ধিরও। যেখানে ঐক্যের আগ্রহ থাকে, কিন্তু অনৈক্য ও বৈভিন্ন্যকে পোষণ করার দায় যদি না থাকে, সেখানে সমাজকে সংগঠিত করার কাজটা কতো সহজ হয়ে পড়ে, সেটা অন্তত তুমি বুঝতে পারছো। অন্যদিকে সেই সমাজটির দিকে তাকাও, যেখানে একের পর এক নতুন-নতুন সমুদায় এসে বসবাস করেছে, স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও ধর্মবিশ্বাস সহ...এবং যেখানে সব ধরনের ধর্মের স্বীকৃতি রয়েছে—এটাই মানব-ঐক্যের আদর্শতম ও দৃঢ়তম ভিত্তি নয় কি? ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে হিন্দুরা গোড়া থেকেই ঔদাসীন্য জাহির করেছে কেন আর কেনই বা খৃষ্টান সম্প্রদায় ধর্মের প্রচারাভিযানে ব্যস্ততা দেখিয়েছে—এটা গবেষণার বিষয়। এর পেছনে কোনো-না কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে। এই প্রশ্নের গভীরে ঢুকে বোঝবার চেষ্টা

করো, কোন দৃষ্টিকোণটি অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যব্যন আর চ্যালেঞ্জ ভরা—সেই সনাতন ধর্মদৃষ্টি, নাকি এই ঐতিহাসিক ধর্মদৃষ্টি?

জোসেফ—ওহো, এইটুকুনি কথা সারতে এতো কথা বলতে হলো তোমাকে? এ তোমার পুরনো বাতিক। আমি জানি।

কুন্দন—কিন্তু এই বাতিক হয় কেন, কিভাবে হয়, সেটাও তোমার জানা উচিত। নয় কি? তুমি যখন খৃষ্টান হও, খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না তোমার। আমি তো নিজের তাগিদে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। নিজের পরিণত-বুদ্ধি দিয়েই। তোমাকে কি বলবো জোসেফ, তুমি কি জানো, 'কনভারসন' ব্যাপারটা কী? আমার কাছে সেটা 'কনভালশনে'র চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। সারাটা যৌবন আমি পশ্চিমি সংস্কৃতি ও পশ্চিমি ধর্মচেতনার দ্বারা প্রভাবিত, বা বলতে পারো, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থেকেছি আমি। যখন নিজেকে প্রশ্ন করি আমাকে খৃষ্টান হতে বাধা দিল কে, তার স্পষ্ট উত্তর মেলে না। শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পাহাড়ের গায়ে ওঠা খৃষ্টানদের হীরাডুংরী কলোনিকে আমি দেখতাম। আর দেখতাম শহরের পাদমূলে নর্দমা-কর্দমায় নিমজ্জিত নিজেদের ডুমৌড়া বস্তিটাকে। গোড়ার দিকে ডুমৌড়াকে হীরাডুংরীতে বদলানোর স্বপ্ন দেখতাম আমি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম, এ কোনো উপচার নয়। এটা ধর্মের বিনিময়ে সামাজিক প্রতিপত্তি কেনার মতো ব্যাপার।

জোসেফ, আমি বিদেশ যাই যখন, মনে হয়েছিল এই প্রথম মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি যেন! আমার সমস্ত ক্ষত সেরে উঠলো যেন! তারপর কর্মসূত্রে আদিবাসী ভারতকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ মিললো। আদিবাসীদের সান্নিধ্য আমাকে তোলপাড় করে তুললো। সেই সময়েই মিশনারিদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আমার। জনৈক বেলজিয়াম পাদ্রির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তাঁর একাগ্রতা আর নিষ্ঠা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দেয় আর সেই ধর্মের প্রতিও আমার কৌতূহল জাগে, যে-ধর্ম মানুষকে এমন প্রগাঢ়ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাকে দিয়ে এমন ত্যাগ করাতে পারে আর এমন কঠিন কাজ করাতে পারে! এই মিশনারিরাই তো উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করার মতো দুঃসাহসিক কাজটি করে দেখিয়েছে, তাদেরকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত করেছে। নৃতত্ত্বশাস্ত্রের জন্মও এঁদের হাতে। আমার মন বলতো, এইসব আদিবাসীদের সংস্কৃতি তো একদিন এমনিতেই ধ্বংস হয়ে পড়বে। সরকারি তন্ত্র আর সুদখোর বেনিয়াদের সঙ্গে এদের কী-ধরনের সখ্যতা রয়েছে, তা আমার জানা ছিল। এদেরকে সমাজের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার কথাই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু, হিন্দুরা এদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করবে? তারা তো এদেরকে ডোম হিসেবেই দেখবে! এদের সেই আগের মতোই শোষণ করবে। এরপর আমার মাথায় ঢোকে, এদের সবাইকে একসঙ্গে খৃষ্টান বানিয়ে ফেললে

কেমন হয়? আমাদের সেকুলার গণতন্ত্রে তবেই এরা ভারতের সম্মানিত নাগরিক বলে গণ্য হতে পারবে। হিন্দুদের কাছে এদের বিশিষ্ট অস্মিতার কোনো দাম নেই। হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু সমাজের চোখে এরা সবসময় ব্রাত্য এবং অস্পৃশ্য হয়েই রয়ে যাবে।

প্রিয় জোসেফ, আমি তো একবার প্রায় তৈরিই হয়ে পড়েছিলাম মিশনারি হয়ে এই আদিবাসীদের যিশুখৃষ্টের শরণে নিয়ে যাওয়ার পুণ্য যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করার জন্যে। সেই পাগলামি অবশ্যই অচিরেই ঘুচে যায়ঃ স্বয়ং আমার গুরু, অর্থাৎ আমার শ্বশুর মশায় আমাকে তা থেকে বিরত করেন। আর হ্যাঁ, স্বয়ং আমার স্ত্রী, অর্থাৎ এলিসও। ওই দু'জন নিজ-নিজ কায়দায় আমাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করে। ওরা আমার এই পদক্ষেপকে আমার শালীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছিল। ওরা ঠিকই ভেবেছিল। বহুবছর আমি নিজের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাম্বিশান আর নিত্য-নতুন হুজুগের দ্বঙ্গে ভুগেছি। তারপর আমি ভারতে চলে আসি। এখানে আসার পর ধীরে-ধীরে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ক্রমশ আমি এই নিষ্কর্ষে এসে উপনীত হই যে ধর্মান্তরবাদী এই মিশনারি স্পিরিট একেবারেই ভুল। এ মানুষের মৌলিক ধর্মচিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না। আমার বাবা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামদত্ত মাস্টারের কথা মনে পড়ে আমার। আমি অনুভব করলাম ওঁরাই ছিলেন নির্ভুল, আমিই ভুল। কী নিদারুণ বিড়ম্বনা দ্যাখো, চৈতন্য-সহযোগে নিজের ভুল ধরতে পেরেও মানুষকে চিন্তা ও আচরণগত স্তরে সেই ভুলের সংশোধন করতে বছরের পর বছর কেটে যায়। যাক গে, লেট ইজ বেটার দ্যান নেভার, এতদিনে আমি অভ্রান্তভাবে বুঝে গিয়েছি, যে সেবা অনাসক্ত নয়, তা সেবাই নয়—অহংকার, শোষণ মাত্র। কিন্তু নিজেদের আসল সমাজের সঙ্গে আমরা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও শক্তিশালী বুদ্ধিজীবীরাই বা কী আচরণ করছি? মিশনারিরা যদি সেই কাজই করে থাকে, তাতে আশ্চর্যের কী?

জোসেফ—এ তোমার জোরের কথা, কুন্দন। ধর্ম-পরিবর্তন আবার শোষণ হলো কি করে? তোমার ধর্মতন্ত্র যদি ফোঁপরা হয়ে গিয়ে থাকে, দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্যে দায়ী কে? তোমার ধর্ম যদি ব্যক্তিবাদী হয়, সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষমতা বা সদিচ্ছার গোড়া থেকে অভাব থেকে থাকে তাতে, তবে সেই অভাবের দাম তো গুণতেই হবে।

কুন্দন—তোমার যুক্তি একদিক থেকে অকাট্য। আমি মনে করি না যে হিন্দুধর্ম আর ধর্মতন্ত্র ব্যক্তিবাদী। বরং উল্টোটাই সত্যি। হায়, এই ধর্ম যদি আর-একটু কম সার্বজনীন হতো! ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি একটু যদি বেশি আগ্রহ দেখাতো!...কিন্তু এ অবশ্যই কবুল করতে হবে যে শত-শত বছর ধরে এই ধর্মতন্ত্র সমাজকে শিক্ষিত করার, তাকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি সুসমৃদ্ধ ভাবে করে আসছিল,

আজ তেমনটা করতে পারছে না। ইংরেজ যুগেই তার এই ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দুর্বল হয়ে পড়েছিল বললে ভুল বলা হবে, বলা উচিত, ইংরেজ কর্তৃক তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর দেখতে-দেখতে ইংরেজি-জানা লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বে চলে এলেন, বিজাতীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ তাঁরা নিজেদের জাতীয় চৈতন্য থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, আমাদের গ্রামের বলদাউজীর মন্দিরটি ছিল একটি সার্বজনীন কেন্দ্রের মতো—কতো রকমের বক্তৃতা, উৎসব, অনুষ্ঠান হতো সেখানে। আমার বাবা মাঝেমধ্যে আমাকেও নিয়ে যেতেন সেই মন্দিরে। এটা সেই সময়কার কথা, যখন জাতপাতের দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত ছিল। যখন রাজপুতেরা নিজেদের কাগজ বের করতেন, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য আর শূদ্ররাও নিজেদের কাগজ চালাতো। আমার বাবা ছিলেন এর বিরুদ্ধে। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি আমাদের সমাজকে ক্রমশ ভাঙনের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। দলবদ্ধতা-গোষ্ঠীবদ্ধতার উনুনে বাতাস দিচ্ছিল। অথচ আমাদের সেই জীর্ণশীর্ণ ও ফোঁপরা ধর্মতন্ত্র পর্যন্ত—একটি মন্দিরের মাধ্যমে—গোটা সমাজকে এককাট্টা করার জন্যে অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিয়োগ করেছিল। তখন আমি বুঝতে পারিনি, এখন পারি, যে, একজন নিপীড়িত শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও আমার বাবা কেন সেই উৎসব আর অনুষ্ঠানসমূহে অংশ নিতেন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন কেন! কেন তিনি মন্দিরগুলির প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন না এবং সেগুলির সামাজিক ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এও বুঝতে পারি, বাড়ি ছাড়ার পর তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সাধু-সন্তের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন কেন। নিঃসন্দেহে তিনি নিজের ব্যক্তিগত শান্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়ান নি। তিনি গোটা সমাজের ক্ষত সারিয়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, যদিও শেষপর্যন্ত নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই জোটেনি তাঁর ভাগ্যে।

জোসেফ—নিরাশা কেন জুটলো, সেটাই তো প্রশ্ন। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে নিরাশ ছাড়া আর কিছুই কি পাওয়ার নেই?

কুন্দন—নিরাশায়-নিরাশায় তফাৎ আছে জোসেফ। আমার ধারণা, আমাদের আশার চেয়ে বাবার নিরাশা অনেক বেশি দামি। কেননা কোনো ফলপ্রাপ্তির আশা ছাড়াই তিনি নিজের কাজ করে গিয়েছিলেন। সিনিক্যাল হয়ে পড়েন নি কখনও। আর...আমাকে ঘিরে তাঁর যে আশা-ভরসা ছিল, আমি যদি তাঁকে সঙ্গ দিতাম, তাহলে হয়তো তিনি এতটা ভেঙে পড়তেন না। আমিই এর জন্যে দায়ী জোসেফ। বাবার সেই হাহাকারের জন্যে দায়ী আমিই।

জোসেফ—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছো তুমি। কিন্তু, এটা কি রিয়্যাকশান নয়? রাগ কোরো না, আমি এর মধ্যে তোমার রিয়্যাকশনারি হয়ে পড়ার বিপদ দেখতে পাচ্ছি।

কুন্দন—প্রায়শ্চিত্ত, আর রিয়্যাকশনারি! কেমন খৃষ্টান তুমি? আমার ধারণা ছিল এই একটি ব্যাপারে খৃষ্টানরা হিন্দুদের চেয়ে বেশি প্রগতিশীল। যে নিজের পাপের জন্যে নয়, অন্যের পাপের জন্যে নিজেকে কষ্ট দেওয়া সেই ধর্মের খাস আধ্যাত্মিক আবিষ্কার। কিন্তু আজ বুঝলাম, সেটা রিয়্যাকশান। যাক-গে, এই ধার-করা গালিগালাজ আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। যাদের কাছে করে, করুক। আমরা যদি পাপ করে থাকি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরকেই করতে হবে। আমরা আমাদের ঘা নিজেরাই শুকোবো। অন্যের হস্তক্ষেপ সইবো কেন? নির্বাচনের দিন প্রার্থীদের দালালরা যেমন ভোটারদের গাড়িতে করে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি আদিবাসীদের স্কুল-কলেজে ভরতি করানোর জন্যে মিশনারিদের ছুটে আসতে দেখেছি। যেন একথা জানানো মিশনারিদেরই কর্তব্য যে শিক্ষা প্রভৃতির জন্যে ভারত সরকার এই-এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন তোমাদের। তাহলে জোসেফ, হিন্দুদের ঔদাসীন্য যদি পাপ হয়, তবে খৃষ্টান ধর্মতন্ত্রের এভাবে পুণ্যার্জন করাকে আধ্যাত্মিক পাপ বলবো না কি? তারা আমাদের সামাজিক অক্ষমতার সুযোগেই এই ধার্মিক শরব্যতা চালিয়ে যাচ্ছে। কার ইশারায়?...এখন যদি বিদেশ থেকে জলের মতো টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়, দেখবে, খেল খতম্। পরাধীন আমলের সাম্রাজ্যবাদী লুটের তুলনায় স্বাধীন জামানার এই মাল্টিন্যাশন্যাল লুঠ কোন্ অংশে উৎকৃষ্ট, আমাকে বলো দেখি? লালসার ঝুনঝুনি দেখিয়ে স্বদেশী চৈতন্যকে বন্ধক রাখা—এ আরও ভয়ংকর নয় কি? আমি বলছি, এখন আমাদের সমস্ত সাবর্ণ ডোম। কেননা সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যেও তারা মিশনারিদের পা-চাটা জঘন্য ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলোর দিকে মুখিয়ে থাকে। আমার এক স্বজাতি 'ফাদার' ব'নে গিয়ে আমাদের গ্রামে 'সেণ্ট জোসেফ চিলড্রেন অ্যাকাডেমি' চালাচ্ছে। উঁচুবর্ণের বড়ো-বড়ো লোকেরা ঐ 'ডোম' প্রিন্সিপালের অধীনে পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাসোহারায় চাকরি করছে। এভাবে সেই ডোম উঁচুবর্ণের ছেলেমেয়েদের ভুলভাল ইংরেজি শেখানোর লোভ দেখিয়ে তাদের শোষণ করছে। লক্ষ-লক্ষ স্কুল রয়েছে এরকম। ঠিক আছে, তুমি বলবে, এটা স্বাভাবিক। এই শাস্তিই প্রাপ্য ছিল তোমাদের এই ছুঁৎমার্গী সমাজের। কিন্তু দ্যাখো, আমার সেই স্বজাতি এইসব উঁচুবর্ণের লোকেদের তাদের পাপের সাজা তো আর দিচ্ছে না। লোকটা একটা বিদেশি সংগঠনের জন্যে পুণ্য অর্জন করছে মাত্র। তার কাছে এটাই ধর্ম, সমাজসেবা। জোসেফ, দ্যাখো, ব্রাহ্মণ আর বেনিয়াদের ভণ্ডামি আর শোষণের চেয়ে এই ভণ্ডামি আর শোষণ কম ভয়ংকর কিছু? অন্যের দুর্বলতা, অন্যের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার নামান্তর নয় কি? আর একে চলতে দেওয়া হচ্ছে এই কারণে, যাতে তুমি নিজের সমস্যার সমাধান নিজে না করতে পারো। সবসময় অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে তোমাকে। আর, আমাদের শ্রেয়জনদের দ্বারা প্রোথিত ও পোষিত এই অনুকরণমুখী

ব্যবস্থার অমরবেল আমাদের সামাজিক সত্তাকে বিনষ্ট করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে আমরা একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে সেই একই ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছি। সর্বসাধারণকেও সেই নকলের পেছনে ছুটিয়ে মারছি।

জোসেফ, এই কুচক্রটাকে আমি যথার্থভাবে বুঝে ফেলেছি। এতকাল ঐ চক্রব্যূহে আটকে থাকার পর আজ আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি পশ্চিমি সভ্যতা ও ধর্মসমূহের গভীর অধ্যয়ন করেছি, নিছক অধ্যয়ন করার জন্যেই নয়, উপরন্তু নিজের বাস্তবিক অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে। তুমি তো জানোই একজন সাচ্চা খৃষ্টানের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি যে-পরিমাণ শ্রদ্ধা থাকে, আমারও ঠিক ততটাই রয়েছে। কিন্তু, তুমি রাগ কোরো না, এটা নিষ্ঠুর সত্য যে, এই ধর্মের প্রচারক-তন্ত্রটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ প্রণোদিত। আধ্যাত্মিক নয়। হ্যাঁ, এই মিশনারি ধর্মতন্ত্র, আর আমরা যাকে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি বলে থাকি, দুটি একই ঘুঁটের এপিট-ওপিট। এ হলো দাসত্বের বেড়ি, স্বাধীনতার শিক্ষা নয়। আমাদেরকে এই বেড়ি ভাঙতে হবে।

এলিস সম্পর্কে ঃ বাট ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স

স্যার! আজ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো? একটু সোজা হয়ে আমার চোখের দিকে তাকান, আর মুখটাকে ভালো করে দেখুন।—এরকমটা কি হতে পারে না, যে, এবার আপনি বলবেন আর আমি চুপ করে বসে শুনবো? মেশিনও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর আমি তো হাড়-মাংসে গড়া একটা মানুষ, আর এখনও, দুর্ভাগ্যক্রমে বেঁচে আছি। আমি নিজেও এভাবে একটানা কথা বলতে-বলতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি; অবশ্যি, বকবকানির নেশা বড়ো সাংঘাতিক, একবার পেয়ে বসলে সহজে ছাড়ে না—আমি কী করি? কথা বললে মুখই ব্যথা করে শুধু, না বলতে পারলে না জানি কত-কী ব্যথা করে, যা আরও দুর্বিষহ।

আপনার হিসেবে কোনো গোলমাল নেই স্যার, ব্যস্, আর মাত্র তিন দিন হাতে আছে আমার। তারপর আপনি দিব্যি ছাড়ান পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমার কী হবে ভেবে দেখেছেন? মাত্র তিন দিন হাতে রয়েছে আমার। আপনার আশ্রয় ত্যাগ করে বাইরে বেরনোর পর আমার কোনো হদিশ খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।...মৃত্যু আমার জন্যে ওত পেতে বসে আছে। তাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।...সে যে আমার মৃত্যু, আপনার নয়। প্রতিটি মানুষের মৃত্যু আলাদা-আলাদা। জীবনও আলাদা-আলাদা। বরং জীবনকে তবুও সে-অর্থে আলাদা বলা যায় না, স্যার। নইলে আপনি এতদিন ধরে আমার বকরবকর সইতে পারতেন?...আরে মশাই, যতই ভালোমানুষী আর শিক্ষা-দীক্ষা থাক আপনার, প্রথম দিনই আমাকে

খেদিয়ে বিদায় করে দিতেন। যাক্-গে। এখন মোদ্দা কথা হলো মৃত্যু আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে আর আমি যদি এই দু-তিনদিনের মধ্যে নিজের হিসেব-নিকেশ সেরে ফেলতে না পারি, তাহলে ধরে নিন, হামেশার জন্যে গেলাম। তারপর তো মশাই, মানুষ কেন, একটা কীট বা পতঙ্গের বেশেও আমি এই পৃথিবী এবং আকাশটাকে নিজের মুখ দেখাতে পারবো না।

এলিস এখন কোথায় কী করছে জানি না। সেও কি আমার মতো জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দোলা খাচ্ছে? ওর সামনেও কি নিজের কৃতকর্মের হিসেবনিকেশ করার বাধ্যবাধকতা দেখা দিয়েছে?

এলিস শেষপর্যন্ত নিজের জন্মভূমি ফিরে গেল। ওর কপালে আমার সঙ্গে এটুকু নরকভোগই লেখা ছিল। মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আপনাকে সাহচর্য প্রদান করতে পারে। আপনার মনের কথা আর সেন্টিমেন্টও আঁচ করে নিতে পারে তারা, ক্বচিৎ আপনার চেয়েও আগে। কিন্তু সেই সীমার বাইরে আপনি ওর কাছে পরদেশী হয়ে পড়েন। আমি যতখানি ওকে জানতাম আর বহুবছর ধরে জেনে এসেছিলাম—সে যে মনে-মনে এতখানি ধর্মপরায়ণ আর স্বদেশবৎসল, সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। দেখতে-দেখতে সে আমার কাছে অপরিজ্ঞাত হয়ে উঠেছিল। আমি মনে করতাম,—মনে করতাম শুধু বলছি কেন, প্রথম-প্রথম ওর আচরণ দেখে সন্দেহের অবকাশই ছিল না যে, এই দেশটাকেই সে নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছে আর এখানে আমার বিরুদ্ধে ওর কোনো অভিযোগ নেই। আসলে আমি ওকে স্বীকার করেছিলাম ওরই নিজের শর্তে। সে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। মাতৃত্বের বন্ধন থেকেও মুক্ত থাকতে চেয়েছিল। গোড়ার দিকে আমি ওর বুদ্ধিজীবী-সুলভ ওজস্বিতা দেখেই প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমরা অন্যান্য রিসার্চ স্কলারদের মতই একে-অপরের সঙ্গে মিশতাম। এও এক অদ্ভুত সংযোগ যে, এলিস ছিল আমার প্রফেসারের মেয়ে। কিন্তু ওর মধ্যে শুধু যদি বুদ্ধিজীবী-সুলভ ঔজস্ব্যই থাকতো, আবেগের উষ্মা যদি না-থাকতো, তাহলে হয়তো আমরা এত কছাকাছিও আসতে পারতাম না। ওর ব্যক্তিত্বে একটা বিরাট স্ববিরোধ ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমিই-বা সারল্যের সন্ধানে ছিলাম নাকি!

বিদেশে বসবাসকারী বেশির ভাগ ভারতীয়ই বিয়ের ব্যাপারে ভারতীয় মেয়েকে পছন্দ করে। তারা বিদেশি মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে পারে, রোমান্স করতে পারে, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ। আমি এই বকবৃত্তি হজম করতে পারিনি। এখন অবশ্যই মনটা মাঝেমধ্যে খচখচ্ করে যে বেঁচে থাকার জন্যে এটুকু কাপট্য সত্যিই জরুরী ছিল।...আমি বহুবছর অপেক্ষা করেছিলাম। তাড়াহুড়ো করিনি। সাত বছর বিদেশে কাটানোর পরই আমরা বিয়ের কথা ভাবি। বলা বাহুল্য ফয়সালাটা আমরা উভয়ে খুব ভেবেচিন্তে নিয়েছিলাম। এলিসের যেমন একজন সমধর্মী সহযোগীর

প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি আমারও আক্ষরিক অর্থে একজন সহধর্মিনীর এষণা ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমরা একে-অপরকে ভালরকমভাবে বাজিয়ে-বুজিয়ে দেখার পরই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে আমাদের জন্মই ঘটেছে একে-অন্যের জন্যে এবং এবার আমাদেরকে এক হয়ে যাওয়া উচিত। এই 'এক হয়ে যাওয়া'র অর্থ আমার কাছে একরকম আর এলিসের কাছে একরকম ছিল কি? জানি না।

আমি আমার অতীত, অতীতের স্মৃতি, অতীতের সমস্তকিছু থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি আমার পরাধীন-কৈশোরের প্রতিচ্ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারছিলাম না। গবেষণার কাজে নিজেকে সারাক্ষণ ডুবিয়ে রাখতাম। সেই সমস্ত প্রশ্নগুলিকে আমি গভীরে পুঁতে ফেলেছিলাম, যেগুলি ছোটবেলা থেকে আমাকে তাড়া করে ফিরেছে। দেশে ফেরার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিল না, যদিও কাজের সূত্রে মাঝেমধ্যে আমাকে ভারতে আসতে হতো, বিদেশি টিমের সঙ্গে। এভাবে নিজের দেশে বিদেশিদের মতো এসে একধরণের শান্তি অনুভব করতাম আমি। আমি সেই পরিবেশটাকে ঘৃণা করতাম, যেখানে আমাকে দয়ার পাত্র বলে মনে করা হয়েছিল। আমার জীবন, আমার ব্যক্তিত্ব এতদিন যেন অন্যের কাছে বাঁধা পড়ে ছিল। এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। একটা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সদস্য ছিলাম আমি।

আমার কিশোর বয়েসের সেই মফস্বল আর ইস্কুলের অভিজ্ঞতাই যে আমাকে তাড়া করে ফিরেছে, তা নয়, লেকচারার হিসেবেও আমার অভিজ্ঞতা কিছু কম তিক্ত ছিল না। আমার ধারণা ছিল, জাতপাত ভেদাভেদ আমাদের অনগ্রসর মফস্বলটিতে যতখানি রয়েছে, তেমন আর কোথাও নেই। কিন্তু আমি দেখলাম আমার সহকর্মীদের মাঝেও আমি সহজ হতে পারছি না। আমি যে তাদের চেয়ে আলাদা, সেটা তারা আকারে-ইঙ্গিতে আর না-বলা কথায় বুঝিয়ে দিতে ছাড়েনি। একমাত্র আর্থারের কাছ থেকেই সহজ স্বীকৃতি আর সরল আপনত্ব লাভ করেছিলাম আমি। বাদবাকি সবাই ছিল অভিজাত। একমাত্র সে-ই ছিল মানুষ।

বিদেশে থাকাকালীন একবার খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বড্ড সাধ জেগেছিল আমার। সেটা অকারণে জাগেনি। পরে দেখলাম, এর কোনো প্রয়োজনই নেই। এখানে জাত জানতে চেয়ে অপমান করার মতো কেউ নেই। আর এলিস? সে বেচারি তো ধর্মের নাম শুনলে সাত হাত দূরে পালাত। বিশেষত, খৃষ্টানধর্মকে নিয়ে এমন ঠাট্টা করত যে দেখে আমি তাজ্জব বনে যেতাম। আমি খৃষ্টান হতে চাই শুনে সে খুব হাসাহাসি করেছিল। আর আমি খৃষ্টান হতে-হতে যে হইনি, এটাও তার একটা কারণ ছিল হয়তো।

বিড়ম্বনা দেখুন, আমাকে দেশে ফেরার জন্যে আর এখানে থেকে নৃতত্ত্বের গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিল স্বয়ং এলিস। এ সেই তখনকার

কথা, যে-সময় গবেষণা-সূত্রে আমাদের দু'জনকে ভারতে আসতে হয়েছিল আর বস্তারে পুরো একটা মাস সে আমার সঙ্গে কাটিয়েছিল। সেই দিনগুলিও ছিল অদ্ভুত! আমার মাথাতেও না-জানি কী ঢুকেছিল, আমি ওকে নিয়ে বহুবছর পর নিজের বাড়ি চলে গেলাম। টিমের অন্যান্য সদস্যরাও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত আমাদের বিয়ে হয়নি। বাবার সঙ্গে মোটামুটি সেটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হই এলিসকে তিনি দারুণ প্রভাবিত করে ফেলেছেন দেখে। ইতিমধ্যে বাবা কাজ-চালানো গোছের ইংরেজিও শিখে নিয়েছিলেন।

যে-কথা আগেই বলেছি, এলিস জন্মসূত্রে খৃষ্টান হয়েও পুরোপুরি নাস্তিক আর স্বাধীনচেতা মেয়ে ছিল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ওর। কিন্তু মেজাজিও কম ছিল না। গাম্ভীর্য আর চাপল্য, সুতীক্ষ্ণ মতিপ্রকর্ষ আর চরম স্নায়বিকতা, ঘোর অনুশাসনপ্রিয়তা আর চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিল এলিস। ওর পছন্দ-অপছন্দগুলোও ছিল দারুণ স্বচ্ছ আর চোখালো। যতখানি চোখালো ছিল সে নিজে। ঠিক তেমনি কুশাগ্র ছিল ওর বুদ্ধি। সে ছিল জেদি আর আত্মাভিমানী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগাতার বকবক করতে পারতো, আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের মত চুপটি করে বসেও থাকতে পারতো। ওর এই স্ববিরোধী স্বভাবই আমাকে জোঁকের মতো টেনেছিল। সরল আর বৈচিত্র্যহীন মেয়েদের বড্ডো বোর মনে হতো আমার। ওরকম কলের পুতুল আমাদের দেশে বহু আছে।

ওর একটা কথা প্রথম শুনেই গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল মনে, যাকে মুছে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব তো হয়ই নি, বরং আর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। সম্ভবত সেদিনই প্রথম আমরা একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। রেস্তরাঁয় কিংবা অন্য কোনো খানে। সঙ্গে অন্যান্যরাও ছিল। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরোয়—'এই ছুরি-কাঁটা সহযোগে খাওয়ার রেওয়াজটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ভারতীয়দের মধ্যে আর যা দোষ থাকুক, এই একটা ব্যাপারে তারিফ করতে হয়। সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাদের সহজ-সরল আর অঢাকাঢাকি সম্পর্ক। এই খাওয়ার স্টাইলটাকেই নাও। ভগবান আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলোকে এরকম শেপ দিয়েছেন কেন? খাবারের সঙ্গে সোজা আর সবল সম্পর্ক কায়েম করার জন্যেই তো! কাঁটা-ছুরির কী দরকার শুনি?' প্রশ্নটা শুনে এলিস হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ জবাব ছুঁড়েছিল ঃ 'বাট, ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স...'! এমনিতে শুনলে মনে হবে খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু যে-প্রসঙ্গে যেভাবে সে বলেছিল কথাটা, তা আমার অন্তস্থলে গিয়ে স্পর্শ করেছিল। বলা যেতে পারে, বুকের প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়ে দাগ কেটেছিল সেটা। এলিসের মুখ-নিঃসৃত ঐ একটি মাত্র বাক্য বা বাক্যাংশ আমার কাছে পশ্চিমি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার পক্ষে যুক্তির যে-বনিয়াদ রচনা করেছিল, আমার মনে তা ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। ভাবনার এক সুগভীর সমুদ্রের পাড়ে আচমন করতে-করতে

ক্রমশ সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে থাকি আমি। একটি মাত্র বাক্য, কিংবা বলতে পারি একটি শব্দমাত্র দিয়ে সে যেন তছনছ করে ফেলেছিল আমাকে—আমার পাতা-হাতে তুলে দিয়েছিল একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির চাবিকাঠি। যে সত্যের মীমাংসা করার পক্ষে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থও অকুলান হতে পারতো, এলিস সেটা একটি মাত্র বাক্যের দ্বারা সমাধা করে দিয়েছিল। কী অদ্ভুত আর অকাট্য যুক্তি লুকানো ছিল ঐ বাক্যে! আর...সেই প্রথম মনে হলো আমার, যে-সূত্রের অন্বেষায় আমি না-জানি সেই কবে থেকে ঘুরে ফিরছি আর যাকে না-পেয়ে আমার জীবনটা যেন স্থাণু হয়ে পড়ছিল, আ-কৈশোর লালিত সেই আকাঙ্ক্ষার এইখানে পরিসমাপ্তি ঘটল, এই একটিমাত্র বাক্যে... 'বাট ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স...'। এরপর আর বলতে-শুনতে বাকি থাকে কী? আমার মনে হলো, এতটা কাল ধরে যে মনে হচ্ছিল সব কেমন থম্ মেরে আছে, আমি নিজেও কেমন নিজের কাছে একক- প্রশ্ন হয়ে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, আজ যেন সমস্ত ধুয়ে-মুছে একাকার! যেখানে বাইরের কেউ, কোনকিছুরই-আর ঢুকবে না বলে মনে হতো, সেখানে, আমার সবকিছুই এখন খোলামেলা, উন্মুক্ত, সুতরাং উজ্জ্বল। মনে হলো, আমার মধ্যে জমে-থাকা বহুবছরের পুঞ্জীভূত কুয়াশা, ঘন কুজ্ঝটিকা, এলিসের এই একটিমাত্র বাক্যে ঝটিতে কেটে গেল আর জীবনের অবধারিত দিশানির্দেশ খুঁজে পেলাম চকিতে।

সত্যিসত্যি আমার কাছে একটা সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত ছিল সেটা। এই তো আসল মূল্য—'কমপ্লেক্সিটি'! মানুষের তামাম সভ্যতা, যাবতীয় গরিমা আর আতঙ্ককে যথাযথ রূপে সংজ্ঞায়িত করার এই তো আসল বস্তু, যাকে আমরা সহজতা ও সারল্যের অছিলায়, প্রকৃতি বা মোক্ষের ওজর দেখিয়ে তোয়াক্কা না-করার হাস্যকর আর শোচনীয় চেষ্টা করে এসেছি। এই তো আমার মুক্তির পথ।...আমি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত নিজের শূদ্রত্বের অখল জ্বালায় পিষ্ট থেকেছি। স্যার, আপনি কল্পনা করুন সেই ছেলেটির মানসিক দুরবস্থার কথা, যার বাপ বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বড়ো হয়েছে যে। যখন সে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছে, সবকিছু জানতে-বুঝতে শিখছে, তখন অহরহ শূদ্রত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা হচ্ছে তার মনে। দিন-রাত, কয়েক-কয়েক বছর ধরে—আর সেই বছরগুলোকেও এক-একটা অনন্ত কালকুঠুরি বলে মনে হয়েছে আমার। মনে হয়েছে, বেঁচে থাকতে কখনও এই কারা থেকে মুক্ত হতে পারবো না আমি। দিনরাত, বছরের পর বছর ঐ শহরের আপন-পর সমস্ত ধরনের লোকের ঘৃণিত-করুণার তলে পিষ্ট হয়েছি আমি। 'হায় গো! রামীর ব্যাটা!' তারা আমাকে দেখতে পেলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করতো, এত জোরে-জোরে যে আমার পক্ষে না-শোনার ভান করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো। পথে চলতে-চলতে ঐসব নিষ্ঠুর বাক্যখণ্ড আমার কানে গলানো

সীসার মতো এসে ঢুকতো... 'হায় রে কসাই! রামীর তো কপালই পোড়া...বাড়িতে থেকেই বা কী-এমন রোজগার করতো...কিন্তু মরদ বলতে একজন তো ছিল!' আমি মুখবুজে পেরিয়ে যেতাম...কিছুই শুনিনি যেন এরকম ভান করতাম...লজ্জা আর গ্লানিতে আমার মন কানায়-কানায় ভরে যেত...আর মাথা সোজা রেখে হাঁটারও সাহস থাকতো না আমার মধ্যে। ঐসব পিশাচ-পিশাচিনীরা আমার মায়ের প্রতি করুণা দেখানোর অছিলায় নিজেদের মনের জ্বালা জুড়োতো।...আসলে ঐ হতভাগীর দুঃখ দেখে ওরা তৃপ্তি পেতো। কেননা, আমার মা ছিলেন যথেষ্ট দাম্ভিক আর পাড়াপড়শিদের একবারেই আমল দিতেন না। তাদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করতেন না, উল্টে সুযোগ পেলে তাদেরকেই দু-চার কথা শুনিয়ে দিতেন। ঐসব বজ্জাত মেয়েমানুষেরা আর তাদের বদমাইস পুরুষগুলো নিজেদের পচাগলা আত্মাকে এইসব আবর্জনার খোরাক দিয়েই জীবিত রেখেছিল। পরের সর্বনাশ না-দেখা পর্যন্ত তাদের আত্মা শান্তি পেতো না।

এই জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে, এই অনিঃশেষ লজ্জা আর গ্লানির হাত থেকে, এই উচ্ছিষ্ট জীবনের বিষ্ঠা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবো, শুতে-বসতে এই একটাই চিন্তা আমাকে কুরে-কুরে খেত। যেদিকে সামান্য আলোর ঝলকানি দেখতে পেতাম, ছুটে যেতাম সেদিকে, আর নোংরা মাকড়সার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যেতাম আমি। মনে হতো, গোটা পৃথিবী একদিকে, আর আমি নিজে একদিকে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একসঙ্গে মিলে আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র রচনা করছে। আর আমি ভেতর-ভেতর আরও সন্দিগ্ধ আর মনমরা হয়ে পড়তে থাকি। নিজের পরিবেশের প্রতি এক নিদারুণ কটু ঘৃণা সংপৃক্ত হতে থাকে আমার মনে। ঘৃণার সেই আগুন লেলিহান হয়ে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ সংস্কৃতিকে গিলে যে ফেলবে না, তার কী গ্যারাণ্টি ছিল? ইস্কুলে উঁচুজাতের ছেলেরা আমাকে উপেক্ষার চোখে দেখতো, আমি মনে-মনে ওদেরকে কুপোকাত করতাম। মনে হতো, আমার ভাগ্যই আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু আর এই ভাগ্যের প্রতিশোধ তুলতে হবে আমাকে। এই এঁটো আর নোংরা শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে—অন্য কোথাও গিয়ে জন্ম নিতে হবে—এই নরক থেকে অনেক দূরে, যেখানে এর ছায়া পর্যন্ত আমাকে ছুঁতে না পারে। আর, একটা তরতাজা দেহে একেবারে নতুন আত্মা ধারণ করতে হবে আমাকে। স্বভাবতই এটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল যে আমি ঐ সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাস ছাড়তে শুরু করেছিলাম যে-গুলি এই নোংরা পরিবেশ আমাকে প্রদান করেছিল। সেই মলযুক্ত উত্তরাধিকার চেতনাকে আমূল উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। ঐ সমস্ত সংস্কারগুলিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম।

আরে মশাই, কি বলবো আপনাকে, দেখি যে আমি ক্রমশ সফল হয়ে উঠছি এ-চেষ্টায়। আপনার কাছে এ-দাবি হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে

যে নিজের আত্মারই আমি কায়াকল্প করে ফেলেছিলাম। তার ভারতীয়ত্ব ঘুচিয়ে তাকে ইউরোপিয়ান বানিয়ে ফেলেছিলাম। নিজের আত্মাকে ইউরোপীয় বানিয়ে ফেলতে আমাকে খুব-একটা বেগ পেতে হয়নি বটে, কিন্তু আমার চালচলনে আমার নিষেধ সত্ত্বেও সেই ওঁছা ভারতীয়ত্বই উঁকি-ঝুঁকি মারা বাদ দেয়নি। সত্যি কথাটা কি জানেন স্যার, আমার মনের মধ্যে একটা সোসাইটি রয়েছে—সেই সমাজটা নয় যেখানে আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি—আমি বলছি সেই সোসাইটির কথা যার সদস্যতা আমার স্বোপার্জিত—সেই স্বরচিত সুচারু সোসাইটিতে বাস করা সত্ত্বেও আমি নিজেকে পুরোপুরি বিকশিত করে তুলতে পারিনি। সর্বদা সন্ত্রস্ত থেকেছি এই বুঝি এমন-কিছু করে ফেলবো যা পুরোপুরি বেমানান হয়ে যাবে, আর আমার কাছা খুলে যাবে সবার সামনে। আমার মনের এই দুর্বলতা পুনরায় কুণ্ঠা জাগিয়ে দেয় আমার মধ্যে। উপরন্তু, আমার যে-ব্যাপারটাকে আমোদ-বৃত্তি বলে তারিফ করতো লোকে, সেটাও, এখন মনে হয়, আমি কচ্ছপের মতো নিজের রক্ষাকবচের মতো ডেভলপ করেছিলাম হয়তো। নিজের স্পর্শকাতর আর কাঁচা ফোঁড়ার মতো বেদনাসিক্ত হৃদয়টাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে। এখনও আমার মুখ দিয়ে এমন-সব কথা মাঝেমধ্যে বেরিয়ে পড়ে, এমন-সব কাজ আমি করে ফেলি, নিজের অজান্তেই, যেগুলির সঙ্গে আমার বাস্তবিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই। সত্যি বলতে, সেগুলি বড্ডো বেশি বায়বীয় আর অনর্গল-গোছের কথা। তবু, মজার ব্যাপার হলো, লোকে এ-সব কথাতেই কাত হয়ে পড়ে। এখানেই একটা প্রশ্ন বেহায়ার মতো আমার মধ্যে চাগিয়ে উঠছে যে এলিস আর আমার গ্রহদুটি এতো কাছাকাছি চলে আসার মূলে এরকম কোনো অনর্গলতাই ছিল কি?

স্যার, আমি আর কী জবাব দেবো? এই মাথামুণ্ডুহীন প্রশ্নটাকে সামনে দেখে—যা না-জানি কোন্ হন্তারক আর নিষ্ঠুর কুমতলব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছি! না, না মশাই, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। এটা একেবারেই মিথ্যে কথা। মেয়েদের কাছে আমি কখনই আড়ষ্ট বোধ করিনি। মেয়ে জাতটার সঙ্গে আমি আগাগোড়াই খুব সহজ আর খোলামেলা ভাবে মিশে এসেছি। মেয়েরা সব জায়গাতেই একরকম। ওরা আপনার কদর্যতাটাকে আদর করে আপনাকে মনের দিক থেকে মুক্ত আর সহজ করে তোলে। বেশিরভাগ পুরুষই আমার কাছে বেজার আর নীরস ঠেকে, কিন্তু বেশিরভাগ নারী আমাকে আকৃষ্ট করে। আমার সন্দেহবাতিক স্বভাবটা নারীর ক্ষেত্রে যেন প্রযোজ্য নয়। আমি কখনও ওদের পোস্টমর্টেম করতে বসিনি, যেটা পুরুষদের বেলায় সচরাচর করে থাকি। সৌভাগ্যত, আমার জীবনে যে ক'জন নারী এসেছে, তাদের কেউই আমাকে ভুল ভাবেনি। ওদের কাছে, কোন্ অলৌকিক উপায়ে জানি না, আমি নির্ভুল থেকে যাই। এ-কথার সারাংশ, মশাই, এই নয় যে স্বভাবের দিক থেকে আমি স্ত্রৈণ।

মেয়েরাও যে দারুণ ঈর্ষাপ্রবণ আর শক্তিশালিনী হতে পারে, সেটা আমি মানি। ওরা আজেবাজে ওঁছা কথাবার্তা দিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে, যা পুরুষদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়, সেটাও মানছি। কিন্তু, হয়তো এই কারণেই মেয়েদেরকে আমার ভালো লাগে। মশাই, সত্যি কথাটা হলো, ওরা জীবনের অনেক কাছাকাছি থাকে। ওরা আমার ব্যথাদীর্ণ ঊষর অনাবাদি ঔদাস্যের জমিতেও কোঁড়া বের করে দেখিয়ে দিতে পারে। মশাই সত্যি বলছি, নারী না থাকলে এই পৃথিবী ধ্বংসতালিকায় চলে যেতো না কি? পৃথিবীর স্থিতি আর ভারসাম্যও, আমার তো মনে হয়, এই নারী জাতটার ওপরই আলম্ব করে রয়েছে। তাছাড়া, বেশিরভাগ নারীর মধ্যে একটা জন্ম-প্রতিভা থাকে ঃ আপনার সঙ্গে তাদাত্ম্য রক্ষা করার, আপনার যে-কোনো মতাদর্শকে গ্রহণ করার ক্ষমতা বা প্রতিভা। আপনি মুখ খুলবেন, তার আগেই ওরা ধরে নেবে আপনি কী বলতে চাইছেন। এরকমটা যখন ঘটে, তখন কোন্ পুরুষের কৃতজ্ঞতা ছলকে পড়বে না শুনি? আপনি স্যার আমার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, এই যে পুরুষ নামের জীব, এরা মূলত এক একটা নিরঙ্কুশ আর শিষ্টাচারহীন শিশু যারা হামেশা অজানাকে নিয়ে খেলা করার জন্যে মুখিয়ে থাকে। গোড়ার দিকে তাকে আগলে রাখে তার মা, পরে সে চলে যায় স্ত্রীর হেপাজতে। মানেটা এই যে, কোন-না-কোন নারীকে তার সামনে থাকা চাই যে তাকে সামলে রাখবে, নজরদাবি করবে। আর দিনবেলাবেলি তাকে টেনে ঘরে ঢোকাবে। নারীকে ছেড়ে পুরুষ থাকতেই পারে না, সত্যি যদি সে ফকির বা সাধুমহাত্মা না হয়। মায়, ফকিরদেরও যে খাস হিন্দুস্তানি প্রজাতি রয়েছে না, তাদের মধ্যে এ-পর্যন্ত দেখা গেছে যে মোক্ষপ্রাপ্তির আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত নিজের বউটাকে চিরবিদায় বলার সুযোগ ঘটেনি।

আপনি মাথাগরম করবেন না স্যার। ঠিক আছে মশাই, এই নারীজাতটা আমাদের ফাঁসে বেঁধে ফেলে ভয়ংকর ভাবে। এটাই বলতে চান তো আপনি? বেশ, আপনিই বলুন, এই পুরুষগ্রস্ত, পুরুষ নির্যাতিত সংসারটাকে তার নিজের অক্ষে কায়েম রাখার হাতিয়ার বলতে একজন নারীর কাছে আর আছেটা কী? পুরুষ স্বাধীনতাকামী. নিজের ঘর-সংসার আর আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে, নিজের সমাজ আর দেশের কাছ থেকে, স্বয়ং প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার দাবি তোলাটাকে সে নিজের জন্মসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করে। সে সমস্ত জিনিসকে, সমস্ত সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে। যেটুকু সে গড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট করে ফেলে। সে সবসময় ভালোবাসার মধ্যেই ডুবে থাকতে চায় আর যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাকেই সর্বাগ্রে সাবাড় করে। আপনিই ভেবে দেখুন স্যার, এরকম সর্বনাশা স্বাধীনতায় একজন নারীর কী কাজ?

তো, এই স্বাধীনতাকামী পুরুষকে তার চৌহদ্দির মধ্যে রাখা, তার নাকউঁচু

সর্বজ্ঞতাকে মল পরিয়ে রাখা, তার জীবনদেবতাটিকে দিয়ে খুব-করে গতর খাটিয়ে নেওয়া—এই হলো নারীর জন্মগত অধিকার এবং জন্মগত প্রতিভা। জীবনটা, মশাই, নিজেই একটা মেয়েমানুষ। আপনি যাকে প্রাণতত্ত্ব বলেন, সেটা আসলে নারীতত্ত্ব, আর কিছু নয়। পুরুষের এই মুক্তি-লালসা নিয়ে জীবন করবেটাই বা কী? পুরুষের এই মুক্তি-তৃষ্ণার কোনও নির্দিষ্ট সীমা আছে নাকি? এক মিনিটও ধৈর্য ধরে বসতে শেখেনি এই পুরুষের বাচ্চা! কোন-না-কোন উৎপাত সে করেই যাবে আর মিছিমিছি ব্রহ্মাণ্ডে বিক্ষেপ সৃষ্টি করবে। প্রত্যেক ব্যাপারে নিজের 'কেন'র ডাণ্ডা ঘোরাবে। এমনকি কোনো পুরুষকে আপনি যদি চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে থাকতে দেখেন, তবু মনে করবেন না যেন যে, সে শান্ত হয়ে বসে আছে। আরে মশাই, লোকটা চুরাশি লক্ষ যোণির প্যাঁচ খোলার দুর্বুদ্ধি আঁটছে মনে-মনে। সে ব্যাটা তো নিজের খোলনলচেই বদলে ফেলতে চায়। মেয়েরা এসবের চক্করে কখনও পড়বে না, যদি পড়ে, গোটা চক্রটাকেই উল্টে দেবে। ঐ মহাশূন্যের বুক থেকেও একটা তরতাজা ফসল তুলে এনে দেখিয়ে দেবে। অর্থাৎ মুক্তিটাকেও পোষ্য আর উষ্ণতাময় করে তুলবে। আপনার কি মনে হয় স্যার, আপনি কি ভাবতে পারেন যে একজন নারী কখনও অতিমানব বা রোবোট বা ইতিহাসের লৌহবিধানের মতো ভয়ংকরতাসমূহকে জন্ম দিতে পারে?

মেয়েরা কখনও এরকম নিরাবয়ব জিনিসের পেছনে ছোটে না। হয়তো এই কারণে, যেহেতু পুরুষের এই নারী-প্রকৃতিই বেশি পছন্দ। সত্যি বলতে স্যার, একমাত্র নারীই বারবার জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু ঐ ব্যাটা পুরুষশাবক নারীর হাত গলে বারবার সেই আলেয়ার পেছনে ধাওয়া করেছে। সাবিত্রী সত্যবানের গল্পটা নিছক গল্প নয় স্যার, ওর পেছনে আছে সহজ সরল তথ্য, যাকে আমার আধবিলেতি আত্মাও পরিষ্কার বুঝে নিতে পারে।

...কিভাবে জানি-না এইসব আজেবাজে কথায় জড়িয়ে পড়লাম। আমি তো আমার স্ত্রীর কথা বলছিলাম। যে তখন আমার বউ ছিল না, ছিল প্রেয়সী। বরং, প্রেয়সীর চেয়ে বেশি, বিশুদ্ধ এলিস—আমার গুরুকন্যা, যার প্রতি আমি বেশি আকৃষ্ট ছিলাম, না আতঙ্কিত ছিলাম, সেটা বলা দুষ্কর। হ্যাঁ, বলছিলাম যে, এই এলিসই আমাকে এক দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বসে ঠোঁটের পাউটিং সহ স্মিতহেসে বলেছিল—'বাট, ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স'।...বুঝলেন মশাই, জীবনটা মূলত যাই হোক না কেন, তাকে যাপন করাটা 'কমপ্লেক্স' ছাড়া কিছু না। আর, এই সত্যটাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগোনো উচিত। সারল্য আর স্বাভাবিকতার মিথ্যে অভিনয় করে লাভ কী। এলিসের এই বাক্যটি আমার এতোবৎ-প্রতিপালিত ধারণার মূলে তীব্র প্রতিঘাত ছিল এবং আমি এই একটি মাত্র বাক্যের বিনিময়ে নিজেকে ওর সামনে এমনভাবে মেলে ধরি, আল্লার কৃপাদৃষ্টি লাভ না-করা পর্যন্ত

হজরত মুসা যেভাবে পাহাড়ের ওপর নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছিলেন। আরে, সভ্যতা তো একটা কমপ্লেক্সই। তাকে সরল বললে সত্যের অপলাপ হয়। আমরা ভারতীয়রা তো 'হেডও আমার টেলও আমার'-গোছের মানসিকতা পোষণ করি। আমাদের প্রকৃতিও চাই, সংস্কৃতিও চাই আর দুটোই চাই স্ব-শর্তে। এই একই গণ্ডগোল কি জীবনের ক্ষেত্রেও করি না? প্রকৃতি আর সংস্কৃতিকে, বিজ্ঞান আর দর্শনকে, জ্ঞান আর ভক্তিকে এভাবে গোঁজামিল দেওয়ার অর্থ কী? মশাই, এতদিনে আমি জানতে পেরেছি গোলমালটা আসলে কোনখানে।

...'বাট ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স...' একটা অকাট্য যুক্তি, ভারতবর্ষীয় গোঁজামিলকে বাক্যহারা করে ফেলার মতো একটা অব্যর্থ শল্যক্রিয়া।...আর অকস্মাৎ আমার মনে হলো যে আমার গুরুকন্যাটি আধুনিক সভ্যতার সেই মূলমন্ত্রটি আমার কানে ঢুকিয়ে দিল, যা ব্যতিরেকে আমি অসম্পূর্ণ ছিলাম। অসম্পূর্ণ আর মৃয়মাণ। আমি ওর সামনে নতমস্তক হয়ে পড়লাম। আমার গুরুকন্যা, আমার চমৎকারিণী এলিসকে আধুনিক সভ্যতার অবতার বলে মনে হতে লাগলো। আদিমতা থেকে আধুনিকতা পর্যন্ত মানবজীবন-যাত্রার রহস্যই যেন সে উন্মোচিত করে দিয়েছিল আমার সামনে। সেও যে আমার মতো নৃবিজ্ঞানের ভট্টারিকা হতে চলেছে, এটা মনে করেই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হতে লাগলো আমার। আমাদের কাজের ক্ষেত্র একই ছিল। নিয়তির অদৃশ্য-সূত্রে আমরা উভয়ে একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম। প্রফেসার সাহেবের প্রিয়তম ছাত্র হবার সুবাদে আমি ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, এই কারণেও, এবং সম্ভবত এক বিজাতীয় আকর্ষণের যুক্তি-সূত্রেও সে আমার প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল এবং শেষের দিকে আমার প্রতি ওর আগ্রহ এতখানি উৎকট হয়ে উঠেছিল যে, স্বয়ং গুরুর কাছে নিজেকে আড়ষ্ট মনে হতে শুরু করেছিল আমার।

আমার প্রতি এলিসের বিশেষ পক্ষপাতের দরুণ আরেকটা ফল পাওয়া গেল। আমি জার্মানদের আদব-কায়দা আরও দ্রুত রপ্ত করে ফেললাম আর তাদের মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললাম। মনে-মনে ঈর্ষা করার লোকের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু গুরু ও গুরুকন্যার পরাক্রমের দরুণ কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। এলিস আমার মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল, পাশাপাশি আমার নিজের মধ্যেও সামাজিক কুণ্ঠা ক্রমশ ঘুচে যেতে থাকে। একান্ত আনকোরা-পদ্ধতিতে সে আমাকে আমার পরিবেশের কমপ্লেক্সিটিতে দীক্ষিত করে তুলেছিল। অবশ্যি, আমার ধারণা, আকর্ষণের জন্যে বিপরীত-মেরুর প্রয়োজন থাকে এবং গোড়ার দিকে সে নিঃসন্দেহে আমার সারল্যের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। উল্টোদিকে সে আমাকে বশ করেছিল নিজের অনন্য কমপ্লেক্সিটি ও স্ববিরোধের জাদুতে। এতদিন তো এই জাটিল্যকেই খুঁজে-ফিরেছি আমি!

এখানে আপনার কাছে এটাও স্বীকার নিচ্ছি যে, ভাগীরথীর ক্ষেত্রে আমার

যে-দুর্দশা হয়েছিল, সেটা আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে এমন এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল যে, স্বাধীন হয়ে ওঠার পরও সেই জ্বালা থেকে খামতি পাইনি আমি। কেন জানি-না, এলিস কী জাদু করেছিল আমার ওপর, আমি নিজের ভাগ্যকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে শুরু করি যে ভালোই হয়েছে, ওর খপ্পরে পড়িনি। আমার আত্মা আসলে ভাগীরথীকে নয়, চেয়েছে এলিসকে। এলিসই একমাত্র ঢেকে দিতে পারে আমার অসম্পূর্ণতাকে। তারপর, অন্যান্যদের মতো ভাগীরথীকেও অতিরিক্ত 'সিম্পল' আর 'প্রিমিটিভ' মনে হতে থাকে আমার। পরিবর্তে, এলিস উঠে আসে কমপ্লেক্সের, সমৃদ্ধি আর আধুনিকতার প্রতীক হয়ে। এলিস আসায় ঢাকনা-আঁটা প্রেসার কুকারের মতো ভাগীরথীর স্মৃতি চাপা পড়ে যায়। প্রথম-প্রথম মাঝেমধ্যে হুইসেলটা কেঁপে-কেঁপে উঠতো, এই যা। আরে, টিউব ফেটে গেলেও তো হাওয়া কিছুক্ষণ-অন্ত বের হতে থাকে,—এ তো আস্ত একটা মন। যা-হোক, এটা এতদিনে দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে গেল যে 'কমপ্লেক্সটাকে' বরণ করাই ছিল আমার নিয়তি, সেই 'সিম্পলটাকে' নয়।

আপনিও স্যার, ভাবছেন হয়তো একটা সাধারণ কথাকে আমি এতো আস্কারা দিচ্ছি কেন! কিন্তু আমি যে আমার ভাবাবেগের কাছে অসহায়! আমি কী করতে পারি বলুন? আমার বাবা আমাকে হামেশা সত্য কথা বলার দিব্যি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন 'সিম্পল' ব্যক্তি। তিনি জানতেন না যে জীবনটা সিম্পল নয়। জীবনে এই সত্য বলার সরল জেদ নিয়ে চলতে চাওয়াটা নিচ্ছক গোঁয়ার্তুমি। আর তাতে ক্ষতি বই লাভ কিছু হাসিল হয় না। স্বীকার করছি যে মানুষের সত্য বলার বাসনা একটা মৌলিক বাসনা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তারও একটা ঢঙ আছে, আর সেই ঢঙটা নিছক সরল নয়। যেমন, সত্যও কখনও সরল হয় না, তা বরাবরই জটিল। সত্য স্বয়ং জটিল যখন, তখন তার বলার পদ্ধতিটা সরল হবে কি করে? কমপ্লেক্স জিনিসকে কমপ্লেক্স চিমটে দিয়েই তো তোলা সম্ভব! খামোকা নিজের আঙুল পুড়িয়ে বা নোংরা করে লাভ কি? সেটা বুদ্ধিমানেরও কাজ না। দৃষ্টান্তত, এই ধরুন আমি এসেছি আপনার কাছে, কেন এসেছি? সত্য কবুল করার ছটফটানির ধাক্কা খেয়েই তো এসেছি। এতসব নাটক যে আমি করছি, এসব করে মরছি কেন? যেমনটা এলিস আমাকে সেই দুপুরে বলেছিল, 'বাট ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স'। বেশ, সে একথা খাবার খাওয়ার স্টাইল প্রসঙ্গেই না-হয় বলেছিল। কিন্তু আমি যে এতবড়ো নারীপুরাণ আপনার কাছে ব্যাখ্যা করলাম, তা কিসের জন্যে? মেয়েদের বৈশিষ্ট্যই এই, বড়ো-বড়ো আর সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কথাও ওরা এইভাবে চলতে-ফিরতে অবলীলায় বলে ফেলতে পারে। খাওয়ার পদ্ধতিই শুধু নয়, বেঁচে থাকবে, প্রেম করার অথবা সত্য বলার পদ্ধতিও কখনও সরল হতে পারে না, তা অবশ্যই পদ্ধতিগত দিক থেকে জটিল, এবং তা হওয়াও উচিত।

এই কথাটাই সে কেমন বেমালুম আর চাতুর্যপূর্ণ পদ্ধতিতে বলে দিল! অন্তত এই একটি বাক্যের কারণে আমি আমার গুরুর চেয়ে বেশি, গুরুকন্যার শিষ্য বলে সাব্যস্ত হই। এর পেছনে বিধাতার একটা জটিল বিধানই চোখে পড়ছে আমার, সেটা হলো, এতদিন যাকে আমি আশ্রয় করে থেকেছি সেটা আমার কমপ্লেক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র সে-ই এহেন দুরবস্থায় আমাকে গচ্চা দিতে পারে। আমার বাবা আমাকে গচ্চা দিয়েছে, ভাগীরথী আমাকে গচ্চা দিয়েছে, আর এলিসও আমাকে গচ্চা দিয়েছে। যাক্-গে, মোদ্দা কথা হলো, যেদিন এলিস আমার সামনে এই সূত্র-বাক্যটি বলে, আমার মনে হয় সেদিনই ভাগীরথী নিজের জায়গা থেকে সরে দাঁড়ায় এবং এলিস সেখানে আসীন হয়ে পড়ে। এমনিতে ঐ ঘটনার পরেও বহুদিন আমরা বন্ধু হয়েই ছিলাম। বুদ্ধির পথ বেয়েই এলিস ধীরে-ধীরে আমার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে এবং একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করি আমি পুরোপুরি ওর কব্জায় চলে গেছি। স্বাভাবিকই ছিল সেটা। সেও হয়তো এমনি এক পুরুষের খোঁজে ছিল যে নিজেকে ওর ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে, ওর ওপর নির্ভর করবে আর সেই পুরুষটির জীবনের ওপর ওর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে। বলা বাহুল্য, যতদিন আমি আলাদা থেকেছি, পুরোপুরি আলাদা হয়েই থেকেছি, আর যখন মেলামেশা শুরু করি, আলাদা বলে কিছুই আর থাকেনি তখন। আর, এখানেই, আমার ধারণা, মস্ত বড়ো ভুল করে ফেলেছিলাম আমি।

পিতা ও পুত্র

আমি আপনাকে বলেছিলাম বোধহয়, যে, গবেষণা-সূত্রে আমি যখন ভারতে আসি, একটি জার্মানি টিমের সঙ্গে, এলিস আমার সঙ্গে ছিল এবং আমি ওকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এও বলেছিলাম, যে, বাবার সঙ্গে আমার সেটাই ছিল শেষ দেখা। বাবার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ থাকাটা এমন দীর্ঘসূত্রতা লাভ করেছিল যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমি চাইছিলাম, ঝগড়াই বাধুক না কেন, তবু কিছু একটা তো হবে। ঝগড়া আর গালিগালাজের মাধ্যমেও মানুষকে ক্বচিৎ কাছে আসতে দেখা যায়। তাই নয় কি? বাবার সঙ্গে এলিসের সাক্ষাৎ ঘটানোর পেছনেও, খুব সম্ভবত, এই ইচ্ছেটাই সক্রিয় ছিল আমার মনে। কিন্তু শেষাবধি তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। যা আমি চেয়েছিলাম, মুখোমুখি ঝগড়ার মতো কিছুই ঘটেনি। সম্ভবত মুখোমুখি বসে মিটমাট করে নেওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি দুজনের মধ্যে একজনেরও ছিল না। যা হোক, জার্মানি ফিরে গিয়ে দেখি বাবার একখানা লম্বা-চওড়া চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ঘটনাটা এমন কিছুই ছিল না।

আমি যখন ওঁর সামনে এলিসকে নিজের সহকারিনী বলে পরিচয় দিই, তখন উনি আগে-পিছে কিছু না ভেবেই ফস্ করে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, 'তুই কি একে বিয়ে করার কথা ভাবছিস?' আমি তো হতবাক! এতোটা সহজ প্রশ্নের জন্যে বিন্দুমাত্র তৈরি ছিলাম না। সুতরাং নিপাট মিথ্যে কথাটাই বলতে হলো আমাকে। কিন্তু উনি আশ্বস্ত হবেন কেন? ঐ মুহূর্তে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মায়ের সামনে আমাকে একরকম সতর্কবার্তাই দিলেন শুনিয়ে, যা আমার খুব খারাপ লাগে। যার দরুণ বেশ মজাদার কথাবার্তার মাঝখানে আমাকে উঠে পড়তে হয়। কেন-যে উঠে পড়েছিলাম, বলতে পারবো না। আমি তো চেয়েছিলাম, ঝগড়া হোক। তাহলে সেই সুযোগ আমি ছেড়ে দিলাম কেন? পালিয়ে এলাম কেন? স্নেহের সুরেই হোক, চ্যালেঞ্জ তো উনি ছুঁড়েই দিয়েছিলেন! আমি সেই চ্যালেঞ্জ কবুল করলাম না কেন? উনিও বোধহয় নিরাশ হয়েছিলেন, নইলে এতো লম্বা-চওড়া চিঠি লিখতে যাবেন কেন? এতো বড়ো চিঠি আগে বা পরে আর-কখনও আমাকে উনি লেখেন নি। এভাবে সংঘাত ঘটলো বটে, কিন্তু লিখিত ভাবে। মৌখিক হলো না, যেমনটি আমি চেয়েছিলাম। মৌখিক বাকবিতণ্ডায় উষ্মা থাকে, তাতে মীমাংসারও একটা সম্ভাবনা থাকে। লিখিত ঝগড়া অতি বিপজ্জনক, তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রচুর এবং তা দূর করার সম্ভাবনা—একরকম শূন্য। সেটা তখন ফাইলবন্দী মামলায় পর্যবসিত হয়, যার কখনও বিহিত হয় না। অবশ্যি, আমার ধারণা, বাবা এমনটা চিঠি লেখার মুহূর্তে অন্তত কল্পনা করেন নি। হয়তো উনি লেখার সময়েও কথা বলে চলেছিলেন, চিঠির মধ্যে সংলাপেরই ছড়াছড়ি। কথা শুরুও করেছেন সেইখান থেকে, সে-রাতে ছেদ পড়েছিল যেখানে...

'প্রিয় কুন্দন,

আমি জানি আমার কথা তোর পছন্দ হয় না। কিন্তু দেখা করতে যখন এসেই ছিলি, তখন তোর ভালোর জন্যে কিছু বলা বাবা-হিসেবে আমার কর্তব্য ছিল। ঘরসংসার এক ব্যাপার, আর এ-ধরনের বন্ধুত্ব আরেক ব্যাপার। এ আমাদের অনেক বড়ো ভ্রান্তি যে আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। সেই মেয়েটিকে—কী-যেন নাম ওর—আমার ভারি ভালো লেগেছে। তোর মাও ওর প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু আমি দুনিয়া দেখেছি এবং আমি তোকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে এখন সবই ভালো-ভালো মনে হবে। ঘরকন্নার বোঝা যখন কাঁধে চাপবে, তখন বুঝবি ঠ্যালা। বিয়ে জিনিসটা নিছক দুজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কুন্দন। কতো কী সংস্কার আমাদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে রয়েছে তা আমরা জানতেও পারি না। সেগুলো তখন নিজেদের শক্তি দেখাতে শুরু করে। এখন তোর মনে হচ্ছে বটে যে তোদের দুজনের মধ্যে অমিল কিছুই নেই। একসঙ্গে থাকা শুরু করবি যখন, তখন টের পাবি এমন শতশত ব্যাপার রয়েছে যা তোদের দুজনকে এক হতে

দিচ্ছে না। আর, সংসারে এই দূরত্ব, এই বিচ্ছিন্নতা খুবই ক্ষতিকর। এটাই তোকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই হঠাৎ ক্ষেপে গেলি...। হয়তো এই চিঠিটা পড়েও ছিঁড়ে ফেলবি তুই। সেটা তোর ইচ্ছে। কিন্তু তুই যদি যা খুশি তাই করতে পারিস, তবে কি নিজের মনের কথা বলারও অধিকার নেই আমার?

মনে রাখিস, কোনো মানুষই জীবনের নিয়মের বাইরে নয়। তুইও নোস। এই বিদেশী মেয়েটির জগৎ আলাদা, সংস্কার সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোরা সারাজীবন ভালো বন্ধু হয়ে থাক, একে-অপরের ভাবনাচিন্তা আদানপ্রদান কর, সেটা জরুরী, কিন্তু এর জন্যে বিয়ে করাটা মোটেই জরুরী নয়। তুই তো সমাজ শাস্ত্রের বিদ্বান— তোকে আমি আর কী বোঝাবো! তুই আমাকে প্রাচীনপন্থী বলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিস, কিন্তু আমার ধারণা বদলাবার নয়। বিয়েটাকে আমি মনে করি একটা সামাজিক বন্ধন এবং তা থাকবেও। যদি তাই হয় তবে তা সমকক্ষ সমাজের মানুষের মধ্যেই হতে পারে। তুই কি আজীবন বিদেশেই কাটাতে চাস? স্বদেশে ফিরবি না কখনও? এতো বড়ো অভিমান মনের মধ্যে পুষে রাখাটা ঠিক নয় কুন্দন, মানুষের মন কখন কোথায় বদলে যাবে, তার ঠিক নেই। আমি তোকে বলছি কুন্দন, কোনো মানুষই তার সমাজের চেয়ে বড়ো হতে পারে না। মহাপুরুষেরা পর্যন্ত নিজের সমাজে পা গেড়েই পুরো দুনিয়ায় যশ অর্জন করেন। নিজের দেশ আর সমাজেই শেকড় নেই যার, দেশের বাইরে গিয়ে কী আর করতে পারবে সে! একটা কথা সবসময় মাথায় রাখিস, দুনিয়া তোর কদর তখুনি করবে, যখন তুই নিজের সমাজ আর সংস্কৃতির সত্যিকারের একজন প্রতিনিধি হতে পারবি। যদি তুই বিদেশীদের শর্ত মেনে ওদের মতো করে নিজেকে গড়ে তুলিস, তাহলে মুখের ওপর যাই বলুক ওরা, ভেতরে-ভেতরে তোকে অবজ্ঞাই করবে। বলবে, দ্যাখ, আমাদের কেমন নকল করছে বাঁদরটা! এমনিতেও, কিছু খারাপ মনে করিস না, নিজের দেশ আর নিজের পরিবেশ সম্পর্কে তোর মনে কী ধারণা জমাট বেঁধে আছে আমি তা ভালোভাবেই জানি। একদিন আসবে কুন্দন, যেদিন এই অবজ্ঞাই, যা আজ তুই নিজের দেশ আর পরিবেশ সম্পর্কে পুষে রেখেছিস মনে, সেটাই পাল্টে গিয়ে তুই ঐ বিদেশীদের প্রতি অনুভব করবি, যারা তোর চোখে আজ মনুষ্যত্বের মুকুটমণি রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সেদিন তুই তাদের ক্ষেত্রে এইরকমই অন্যায় করবি যেমনটা আজ নিজের দেশবাসীদের বেলায় করছিস, নিজের ঘর-পরিবারের বেলায় করছিস। একটু ভেবে দ্যাখ কুন্দন, সেদিন তোর কী হবে! তুই যখন এ-কূল ও-কূল দুই কূলই হারাবি, তখন তোর দাঁড়াবার ঠাঁই হবে কোথায়?

আমি জানি কুন্দন, তুই কী প্রচণ্ড ঘৃণা করিস আমাকে! তোর কোনো প্রত্যাশাই আমি পূরণ করতে পারিনি। এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর মুহূর্তে, যখন আমাকেই তোর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, আমি তোকে অন্যের ভরসায় ছেড়ে দিই,—এর

জন্যে আপশোস আমারও কিছু কম নয়। জানি না কুন্দন, জীবনের সেই অধ্যায়টিকে স্মরণ করে নিজেই অবাক হয়ে ভাবি, এ কী ঘটলো, কেমন করে ঘটলো! যে পরিস্থিতিতে পড়ে তুই জ্বলেপুড়ে মরসিত, তার চেয়ে দশগুণ খারাপ অবস্থায় আমার শৈশব কেটেছে। তুই জানিস না কুন্দন, তোর কিছুই জানা নেই, কোন্ জীবন আমাকে সইতে হয়েছে। আমার অন্যায় এটুকু যে তোর কাছ থেকে আমি এটুকু সহানুভূতি পেতে চেয়েছিলাম। কেন জানি না, তুই যখন খুব ছোটো ছিলি, তখন থেকেই তোর ওপর আমার খুব বিশ্বাস। আমার ছোট্ট-একটা ভুলের জন্যে তুই যে আমাকে এমন দীর্ঘস্থায়ী আর এতো কঠোর শাস্তি দিতে পারিস, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমাদের বংশে বড়ো ছেলেকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তোর ওপর আমার একটু বেশিই আস্থা ছিল আর আমি এটাই মনে করতাম যে...। যাক। আমি অতটা খারাপ লোক নই কুন্দন, যতটা তুই ভাবছিস। আমি অসফল আর অযোগ্য হতে পারি, কিন্তু স্বার্থপর নই। ঐ অস্বচ্ছলতার মধ্যেও আগাগোড়া ঘরের দায়িত্ব পালন করে এসেছি। এ কি সত্যি নয়? আমার মধ্যেও কোনো তড়পানি যদি থেকে থাকে, নিষ্ঠা থেকে থাকে, তার জন্যে আমাকেও মূল্য দিতে হয়নি কি? ভেবে দ্যাখ কুন্দন, আমার কারণে তুই যতটা কষ্ট পেয়েছিস, তোর মায়ের কষ্ট কি তার চেয়ে কম ছিল কিছু? তুই কি নিজেই সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যক্ষ করিসনি। আমাদের মধ্যে যতই ঝগড়াঝাঁটি হোক না কেন, আমরা হামেশা একে-অন্যের সহায় হয়ে থেকেছি! দুনিয়ায় আর কোনও নারী কি আমার জীবনে তোর মায়ের জায়গাটি নিতে পারতো? তোর চোখে আমি যতই নিষ্কর্মা আর দায়িত্বজ্ঞান-শূন্য হই না কেন, তোর মায়ের চোখে আমি বরাবর এককাঠি ওপরেই থাকবো। তা সত্ত্বেও আমার মাথায় কী যে ভূত চাপলো যে আমি সংসারের খুঁটো ছিঁড়ে পালিয়ে গেলাম। তার কী দোষ ছিল? প্রত্যেক স্ত্রীর মতো সেও চাইতো আমার নামযশ হোক, আমি নিজের আদর্শের কারণে যেটুকু কষ্ট ভোগ করেছি, তার মূল্য যেন সমাজ আমাকে দেয়। আমাকে করিতকর্মা পুরষ বলেই সে ভাবতো। ঠিক এই কারণেই আমার জীবনে আসা প্রথম সম্মানটিকে আমার মূর্খের মতো লাথি বসিয়ে দেওয়াটাকে সে বরদাস্ত করতে পারেনি। কী এমন অন্যায়টা ভেবেছিল সে!...কিন্তু সে বেচারি বুঝবে কেমন করে যে তার স্বামী শুধু একটা অজুহাতের অপেক্ষায় ছিল, আসলে ঐ মফস্বলে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কুন্দন, যদি বলি আমার কোনো উচ্চাশা ছিল না, সেটা মিথ্যে বলা হবে। তুই কল্পনাও করতে পারবি না যে কী প্রবল ছিল সেই উচ্চাশা! তুই কেন, তোর মাও কি আন্দাজ করতে পেরেছিল নাকি? ছোট্টো একটা নির্বাচনী জয় আমার সেই উচ্চাশার মুখে লাগাম পরাতে পারতো না। এই অকিঞ্চিতকর, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ডোম নিজের দলিত-মথিত আত্মার ভিতর কী নিদারুণ রোষাগ্নি গোপন করে

রেখেছিল, তা ভগবান আর আমি ছাড়া কেউ বুঝবে না। আমি নিজেও বা সেভাবে বুঝেছিলাম নাকি? আমি সত্যিই জানতে পারিনি কুন্দন—কি করে জানবো! আমার না আছে বিদ্যা, না ভাষা...পাঁচজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হলে আমার গলা শুকিয়ে আসে। এ কথা মানতে কেউ রাজি হবে না যে ঐ হতদরিদ্র গোলামের বুকের গভীরে নিজের দেশ আর সমাজের জন্যে কী গভীর বেদনা প্রেথিত ছিল, যা তাকে এক লহমাও স্থির থাকতে দেয় না!...তুই আর কি করে বুঝবি কুন্দন কোন্ ধাতুতে আমি গড়া,—এই সসাগরা পৃথিবীও তোর বাপের উচ্চাকাঙক্ষার কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র। তুই এখন নিশ্চয়ই জানতে চাইবি কী ছিল সেই উচ্চাকাঙক্ষা? আমিও শুনি। হ্যাঁ, তোকে জানাবো বৈ কি। আমার সেই উচ্চাভিলাষটি ছিল, নিজেকে নিঙড়ে গোটা পৃথিবীকে বুকে জড়িয়ে ধরার, তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা শুষে নেওয়ার—তুই বুঝেছিস? আর অন্যদিকে আমার সামনে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র লালসার, ক্ষুদ্র নিয়তির এবং তার চেয়েও এক ক্ষুদ্র রাজনীতির ফাঁদ পাতার ষড়যন্ত্র চলছিল। ফাঁদ নয় ঠিক, চোরাবালি বললেই সঠিক বলা হয়, কাউকে যা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে দেয় না, প্রতিটি নিঃস্বার্থ চেতনার জন্মমুহূর্তেই টুঁটি চেপে ধরে যা। নিজেদের মধ্যে ছোটো-ছোটো গোষ্ঠী তৈরি করে পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করে বেড়াতো যারা, আমাকে নিয়ে তারা হাসাহাসি করতো, আমাকে পাগল ভাবতো...তাদেরই মধ্যে আমি রাতারাতি হিরো বনে গেলাম। কেন? কি করে?...এবং আমার অন্তরাত্মার ভেতর থেকে ভেসে এলো একটি কণ্ঠস্বর যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না...'এ তোর মৃত্যু, নারায়ণ ; এ তোর ফাঁসির ফাঁদ। পালিয়ে যা নারায়ণ, সময় থাকতে দূরে পালিয়ে যা...এ তোকে শেষ না করে ছাড়বে না! পৃথিবী অনেক বিশাল! তোর ভারতমাতার কোল এতো ছোটো নয় নারায়ণ, নিজের মায়ের সন্তাপ শুনবি না তুই? যা, গিয়ে তার সন্দেশ শোন। ঐ যন্ত্রণার মহাসমুদ্রে একটা ডুব দিয়ে দ্যাখ। তুই এখানে বসে করছিসটা কী রে? এই গর্তে বসে মিছিমিছি হাত পা ছুঁড়ে মরছিস। কাদা ছাড়া এখানে আর কী হাসিল হবে তোর? কিন্তু তোর গোটা দেশটা কাদায় ভরা নয় নারায়ণ, সে এক মহাসমুদ্র। যদি মরতেই হয় সেখানে গিয়ে ডুবে মর। এইটুকু ডোবাজলে তো ভালোভাবে মরতেও পারবি না তুই।'

আর আমি নিজেকে ঐ মহাসমুদ্রের বুকে সঁপে দিলাম। আমি সেই সমস্ত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করেছি যা এ দেশের দরিদ্রতম মানুষ প্রতিদিন ভোগ করে। আমার এই নির্লজ্জ শরীরটাকে দ্যাখ কুন্দন, যে মুটেগিরি করেছে, ক্ষেতে মজুরী খেটেছে, ইঁট বয়েছে, বাসন মেজেছে...আরও কতো কী! সাতদিন একবার-মাত্র জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার কখনও কিছু হয়নি। অভাব আর সমৃদ্ধি দুয়েরই তাণ্ডব দেখেছি আমি। অপমান ও শোষণের চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ করেছি। কোটি কোটি

মানুষের এই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী সেটা আমি জেনেছি, নিজেকে দিয়ে জেনেছি। তোর হয়তো মনে আছে, একবার সাংবাদিক হওয়ার জেদ চেপেছিল তোর মাথায়। সমাজকে এতো কাছাকাছি দেখার পর আমি এতদিনে জানলাম, সত্য ও সংবাদপত্রের মাঝখানে কী দুস্তর ব্যবধান! আমি এও অনুভব করেছি কুন্দন, যে, যে-ধরনের রাজনীতি এখন আমাদের দেশে চলছে, তা বাড়তে পেরেছে আমাদের সমাজের দুর্বলতার জন্যেই। এই রাজনীতি সেই সামাজিক দুর্বলতাগুলোকেই পোষণ করবে। ধীরে-ধীরে সময় যতো এগিয়ে যাবে, জঘন্য লোকের সংখ্যা ততো বাড়বে, আর সমাজে এখনও যেটুকু সততা বেঁচেবর্তে আছে, তাকেও নেংটি ইঁদুরের মতো কুরে-কুরে খাবে। কতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেই তো দেখলাম। সবগুলোই দেখে মনে হয়েছে, ধুঁকছে। তাদের দার্ঢ্য ভেঙে পড়ছে। সেখানেও ঢুকে পড়েছে রাজনীতি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুব কাছে থেকে দেখেছি আমি। কী দেখেছি, কেমন দেখেছি, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। আমি ক'জন সহায়তাকারীকে পেয়েছি, অযাচিত বন্ধু, ওদের কথা তোকে জানাবো পরে, সময় আর ইচ্ছে মতো। মানুষ যখন জগৎ-সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, তখনই সে কু আর সু-এর আসল শক্তি বুঝতে পারে। ঘরে বসে আমরা শুধু ভুল ধারণা নিয়েই বেঁচে থাকি।...যাই হোক, বলছিলাম যে শিক্ষার পুরো-একটা জাল দেশময় পাতা রয়েছে, তা আমাদের মানসিক দাসত্বের বন্ধনকে আরও মজবুত করছে—এ আমি পাক্কা বুঝেছি। স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীন জীবন বা স্বাধীন আকাঙক্ষাসমূহের কোনো গন্ধই আমি খুঁজে পাইনি। সাধু-সন্তের সান্নিধ্যও লাভ হয়েছে আমার—পুরো একটা বছর আমি তাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখে অবাক হয়েছি যে এ ধরনের মুনি-ঋষি এখনও এ দেশে বাস করেন! অথচ তাঁদের কথা কেউ জানেই না। এই স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই। দেশের নির্মাণ ব্যাপারে তাঁদের কোনো ভূমিকাই নেই। যেদিকে দেখি, 'কু' একের পর এক অগণিত সংগঠন গড়ে তুলছে আর অন্যদিকে 'সু' ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ কি সুলক্ষণ?...

আজ তোকে এসব লিখছি কেন কুন্দন? এটা জানা সত্ত্বেও যে তোর কাছে আমার কথার কণামাত্র মূল্য নেই! আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যে তোর চোখে আমি মরে গিয়েছি। তুই যদি এভাবে হঠাৎ নিজের বন্ধুদের নিয়ে এখানে না এসে পড়তিস তবে হয়তো এই চিঠি লেখার চিন্তাও মাথায় আসতো না। পাঁচ বছর হয়ে গেল তুই বিদেশে আছিস। এযাবৎ চিঠিপত্রের কোনো বালাই ছিল না। মাঝে-মধ্যে মা-কে দু-এক কলম লিখে পাঠাস, বছরে এক-আধবার কুশল-সংবাদ পাঠিয়ে দিস, টাকা-পয়সাও পাঠিয়ে দিস, এটাই কম নাকি! মা-বাপের ঋণ তুই শোধ করছিস—তোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকার কথা নয়। ভগবানের আশীর্বাদে আজ তুই অনেক ওপরে উঠে গেছিস। নিজের চেষ্টায় সমস্ত হাসিল করেছিস।

আমি কি আর জানি না এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করার জন্যে কতো কাঠখড় পোড়াতে হয়! তোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার অধিকারই বা আমার আছে নাকি? তোর জন্যে আমি করেছি-বা কী যে আমি নালিশ জানাবো আর তুই সেটা পূরণ করবি? আমি বুড়ো হতে চলেছি কুন্দন! জীবনে যা-কিছু ভোগ কারবার, করেছি। ভুগেওছি সবই, যা ভাগ্যে ছিল। আর কোনো মনোবাঞ্ছা নেই। কিন্তু দুনিয়ার আর-সব বাপের মতো আমারও মনে এটুকু বাসনা ছিলই যে ছেলে হয়ে তুই অন্তত আমাকে বুঝবি, তুইই আমার জীবনের ব্যর্থতাকে সাফল্যে বদলে দিবি। আমার কাজ—যদি সত্যিই সেটা কাজ হয়, যদি তাতে কোনো অর্থ থেকে থাকে—তবে, তুইই সেটা এগিয়ে দিবি।

মনে করে দ্যাখ, কতো বছর পরে তুই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলি, তাও একজন অপরিচিতের মতো এলি। তুই আমাকে বলেছিলি, 'তোমার পথ আলাদা, আমার পথ আলাদা।'...শুনে কী প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম, তুই কল্পনাও করতে পারবি না। মনে আছে এক রাত্রে রামদত্ত মাস্টারের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তুই আমাকে ধড়িবাজ মিথ্যেবাজ আরও কী-কী সব বলেছিলি! সেই প্রথম আমি তোকে ভয় পাই। মনে হয়েছিল, তুই আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেলি। তুই যে আমাকে ঘেন্না করিস, সেটা একটু-আধটু আঁচ করেছিলাম বটে, কিন্তু পুরোপুরি জানতে পারলাম সেই রাতে। সেই প্রথম তোর প্রতি বিষিয়ে গেল আমার মন। আজ আমি তোর কাছেই স্বীকার করছি, তোর প্রতি আমার মনে শুধু রাগই নয়, ঘৃণাও জন্মেছিল। এও স্বীকার করছি যে তা অহিংস ছিল না। একটু সংযম রক্ষা করা উচিত ছিল আমার। এমন অধিকার-চেতনা যে একজন সাবালক পুত্রের প্রতি জাগতে পারে, সেটা আজও বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের দোষ সম্ভবত এটাই যে আমরা অন্যকে নিজের থেকে পৃথক দেখতে পারি না। অন্যের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রতি ততোটা সম্মান জানাই না যতোটা জানানো দরকার। কিন্তু কুন্দন, মনের সংস্কারেরও একটা তো শক্তি আছেই। তুই কেমন উদ্ধত হয়ে নির্লজ্জভাবে ঐ কথাগুলো বলেছিলি, মনে পড়ে? আমার সংস্কারের পক্ষে সেগুলো হজম করা সম্ভব ছিল? রমদা আমার কাছে বড়ো দাদার মতো। তুই জানিস না আমার দুর্দিনে উনি কীভাবে সহায় হয়েছিলেন। এক-আধটা ব্যাপারে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও। সম্পর্কেরও একটা মর্যাদা থাকে বৈকি। তুই নিছক আবেগে ভেসে গিয়েছিলি, কিন্তু আমার চোখে ওটা প্রেম ছিল না, ছিল মিথ্যে দর্প। ভাগীরথীকে আমি আগাগোড়া নিজের মেয়ের মতো করে দেখেছি। তুইও ওকে নিজের বোনের মতো করে দেখতিস, আমি জানি। তবে, তুই স্বীকার করিস বা না করিস, সেটা তোর অহংকার ছিল না কি? জাতপাত-চেতনা এভাবে ঘোচে না। তা ঘুচবে, অবশ্যই ঘুচবে, কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে। আমাদের গোরা-

মালিকদের মতো করে ভাবলে চলবে না। নিজেদের স্বার্থে তাঁরা আমাদের সমাজের দোষক্রটিগুলোর যে-ছবি এঁকে রেখে গেছেন, তাকেই চোখ বুজে মেনে নেওযা মোটেই উচিত হবে না, আমাদেরকে নিজেদের বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। আমাদের রোগ যখন আমরাই জন্ম দিয়েছি, তখন তার চিকিৎসার কথাটাও আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আমাদের ব্যাপারে বিদেশীদের শুধুশুধু মাথা গলাতে দেব কেন, তুইই বল। শুদ্র হওয়ার যে-বিড়ম্বনা আমি ভোগ করেছি, উঁচুবর্ণের লোকদের হাতে যে-যন্ত্রণা সয়েছি, তা তোর কল্পনার বাইরে। তবু, তুই বল, তা সত্ত্বেও উঁচুবর্ণের প্রতি তেমন ঘৃণা জন্মায়নি কেন? আমি আত্মমর্যাদাহীন ক্রীতদাস নাকি, পোকামাকড় নাকি? আর, তুই আমার চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর! আমি নিজের সমাজের রোগ চিনি না, আর তুই চিনে ফেলেছিস? তুই হয়তো ধরেই নিয়েছিস যে ঘৃণা দিয়েই ঘৃণার উপচার সম্ভব। কিন্তু আমি জীবন দেখেছি, তোর চেয়ে ঢের বেশি দেখেছি। আর, তোর মতো পড়াশোনা না থকেতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গে থেকে অনেককিছু শিখেছি, জেনেছি। আমার মধ্যে তেমন কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই। অনেক পণ্ডিতপ্রবর আর সাধুসন্তের সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই পিশুরোগ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরাও একে কুষ্ঠব্যধি বলেই মনে করেন। এমন নয় কুন্দন যে চিরদিন এরকমটা চলবে। বদলাবে সব, কিন্তু সমাজটা বদলাবে নিজের পুরুষার্থেই।

কুন্দন, ভাগীরথীকে তুই বিয়ে করতে চেয়েছিলি না? আমাকে বলেছিলি, তুই ওকে পছন্দ করিস। নিজের পছন্দের ওপর এতোটা দেমাক তোর হয়েছিল কি করে? ওর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কথাটা একবার ভেবেও দেখলি না? তোর বিদেশ যাবার আগেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরে একদিন আমি রমদাকে এমনি ঠাট্টাচ্ছলে বলি—রমদা, জানো, কুন্দন আমাকে এই কথা বলেছিল। রমদা কী বললো জানিস? অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে বললো, 'তুই এ কথা এতো দিন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন? আমাকে বলিসনি কেন?...তাই তো বলি, সে আসা হঠাৎ বন্ধ করে দিল কেন!... মনের মধ্যে কী কষ্টটাই না নিয়ে গেল সে! আরে, আমিই ওকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম, তোর মাঝখানে আসার কী দরকার ছিল?' রমদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'মনে হচ্ছে ওর কোথাও একটা ভুল হয়েছে। এ আর কিছু নয়, বয়েসের দোষ। আমি যদ্দুর জেনেছি ভাগীর মনে কুন্দনকে নিয়ে সেরকম-কিছু ছিল না। ওর কোনো ভাই ছিল না বলে কুন্দনকেই ভাইয়ের চোখে দেখতো। কিন্তু নারায়ণ, কারও মনের থই পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়, নিজের সন্তান হলেই বা। আমি ভাগীকেও জিজ্ঞেস করে দেখতাম। তেমন-কিছু দেখলে কুন্দনের সঙ্গেও খোলাখুলি কথা বলতাম। দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জানতে চাইতাম। তুই আমাকে একটু আভাস তো দিতে পারতিস! কে-জানে,

আমার মাথা কী কাজ করতো তখন। সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটে যেতো, আর ছেলেটাকেও মনে খুঁত নিয়ে যেতে হতো না।'

কুন্দন, তোর রামকাকা বার-বার আমাকে এই কথাই বলেছিল, তুই আমাকে গোপন করলি কেন, করা উচিত ছিল না। এ ঠিক হলো না। আজ আমি তোকে বলছি। আমার কথা যদি বলিস, আমি তখনও যা ভেবেছি, এখনও মনে করি যে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। মেয়েটাকে আমি বহুবার তোকে 'দাদা' বলে ডাকতে শুনেছি। সে তোকে বিয়ে করতে রাজি হতো বলে মনে হয় না। তোর মনেও যে আগে কখনও সেরকম চিন্তা এসেছিল, তাও মনে করি না। রমদা যাই বলুক না কেন, আমার এরকম যথেচ্ছাচার মোটেই পছন্দ নয়। ভাগীরথী আর তোর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কটাই ছিল স্বাভাবিক আর সত্য।...যাক গে, এমন আজেবাজে প্রসঙ্গে এলাম কেন? এলাম এইজন্যে যে তুই একটা ভুল আর অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছিস। বয়েসের দিক থেকে তিরিশের কাছাকাছি এসে পড়েছিস তুই। এই বয়েস আমি দুটো সন্তানের বাবা ব'নে গিয়েছিলাম। নিজের একরোখা স্বভাবের দরুণ আমার প্রতিশোধ তুলছিস তুই। মুখে নাই-বা কবুল করিস, কিন্তু বাপের চোখকে ফাঁকি দিতে পারিসনি তুই। তুই হয় ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলেছিস, কিংবা বিয়ে করতে চলেছিস। যদি করে নিয়ে থাকিস, ভগবান তোর রক্ষা করুন, আমার কিছু করণীয় নেই। কিন্তু যদি করতে চলেছিস, দোহাই তোর, আরেকবার ভেবে দ্যাখ। অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়িস না। তোর জন্যে এখানে মেয়ের অভাব নেই। তুই বেজাতে করতে চাস কর, সেটাও আমি আর তোর মা মেনে নেবো। কিন্তু যে তোর দেশের নয়, সমাজের নয়, যার কাছে তোর শেকড়ের কোন হদিস নেই, যার শেকড়ের সন্ধান তোর কাছেও নেই, তার সঙ্গে সংসার পাতলে পরিতাপ ভিন্ন আর কিছু থাকবে না তোর। এটা ভালো করে চিন্তা করে দ্যাখ। তোর চোখ যখন খুলবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন। এখনও কিছু বিগড়ায় নি. দোহাই তোর, একবারটি আমার কথা-মতো চলে দ্যাখ। এখানে ফিরে আমাদের সামনে বিয়ে কর। তারপর যেখানে মন চায়, চলে যাস। আর কিছু বলতে চাই না আমি। অন্য কোনো ব্যাপারে তোকে কিছু বলা অনর্থক। তা আমি আগেই দেখেছি। তোর ওপর নিজের ইচ্ছের বোঝা চাপাতে চাই না। তোকে শুধু নিজের সমাজে, নিজের দেশে জীবনসঙ্গিণী বেছে নিতে বলছি। ব্যস, আর কিছু বলার নেই আমার। তোর মাকেও এটা পড়ে শুনিয়ে দিয়েছি। সেও তাই ভাবছে যা আমি ভাবছি।

তোর
নারায়ণরাম'

ভাবলে সত্যি অবাক লাগে, বাবার এই চিঠিটিও এতোদিন সযত্নে রেখে দিয়েছি

আমি! অথচ, সৎভাবে বলতে হলে, প্রথম পড়ার পর আমার তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়া এটাই হয়েছিল, যে, পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু কেন জানি না, এ চিঠি শুধু যে আমি সামলে রেখেছি তা নয়, এর জবাব দিতেও বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করিনি।

পূজনীয় বাবা,

এতো বড়ো চিঠি লিখে তুমি ভালো করেছো। তোমার ব্যাপারে আমার মনে ভ্রান্ত ধারণা কখনই ছিল না। জানি না কোন চেতনার বশীভূত হয়ে এতবছর পর তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে গিয়েছিলাম! আক্ষেপ শুধু এই, যে, এসব লেখার সুযোগ আমিই তোমাকে দিয়েছি।

তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারী বলেছো। এখনও কি বলার অপেক্ষা রাখে, যে, তাই যদি হয়, এরজন্যে দায়ী কিন্তু তুমিই। তোমার রূপে আমি এক স্বৈরতন্ত্রকে ভোগ করেছি। গোটা গৃহস্থালীটাকে ভগবানের ভরসায় ফেলে রেখে ছ'বছর তুমি মজা করে ঘুরে বেড়ালে। যা করেছো, তার জন্যে কোনো অনুশোচনাও নেই তোমার। উল্টে আশা করছো আমি তোমাকে পুজো করবো, নিজের জীবনটা তোমার চরণে অর্পণ করে দেবো? তুমি মায়ের কথা লিখেছো, ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা করে আমাকে ভর্ৎসনা করেছো। আমি খুব খুশি হতাম মা যদি তোমাকে ঘরে ঢুকতে না দিতেন। তুমি যাকে ওঁর স্বামীভক্তি আর ঔদার্য মনে করছো, আমার চোখে তা হলো অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর ব্যক্তিত্বহীনতা। তোমাকে এ কথাও জানাতে হবে নাকি বাবা, যে, তোমার জন্যেই আমি নিজের মা-র কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছি, ওঁকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছি। যে-বয়েসে একজন শিশুর নিজের বাবাকেই প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি, দরকার হয় তাঁর সাহায্যের, সেই বয়েসে তুমি আমাকে অনাথ আর বেওয়ারিস বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলে। এহেন নৈষ্ঠুর্য দেখানোর পরেও তুমি আমার কাছ থেকে পিতৃভক্তির প্রত্যাশা করে বসে আছো? বাঃ! তার ওপর আবার আমার পড়াশোনা নিয়েও কটাক্ষ করছো, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর থুতু ফেলছো!—এর চেয়ে বড়ো হৃদয়হীনতা আর কী!

আর আজ তুমি জানাতে এসেছো যে রামকাকা আমার সঙ্গে ভাগীরথীকে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যেতেন! এতবছর পর আমাকে এ-কথা জানাবার সময় একটুও বুক কাঁপলো না তোমার? তুমি কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি বাবা? তুমি কি জানো, ঐ ঘটনায় আমি কী নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম এবং যা আমাকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল? তুমি যদি আমার কাছে সে-ভাবে প্রতিক্রিয়া জাহির না করতে, আমাকে যদি অপমান না করতে, তাহলে, খুব সম্ভবত আমার জীবনটা অন্যরকম বাঁক নিতো, আর তোমার-আমার মাঝখানে এই ফাটলও ধরতো না।

তোমার জন্যেই ভাগীরথীর কাছ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে আমাকে। আর

এখন সেই তুমিই এলিসের কাছ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছো। কান খোলা রেখে শুনে নাও তুমি—আমার জীবনে কোনরকম হস্তক্ষেপ করার অধিকার এখন আর তোমার নেই। যদি কখনও সেই অধিকার থেকে থাকে, তবে তা বহুদিন আগেই খুইয়ে ফেলছো। বরং, স্পষ্ট করে বলে দিই, তেমন কোনো অধিকার কখনও অর্জনই করো নি তুমি। হামেশাই নিজের জেদ আর একরোখামি নিয়ে থেকেছো আর অন্যান্যদেরও থাকতে বাধ্য করেছো। ভুলেও অন্যের কথা চিন্তা করো নি। আর তুমিই আমাকে অহংকারী বলছো! অহংকারী কাকে বলে, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন তো তুমি নিজেই, বাবা! তথাকথিত সত্যনিষ্ঠায় তোমার যে এতো অহংকার, তা তোমার নিজের সংসারে কী অমানবিক প্রতিপন্ন হয়েছে, তুমি তা কখনও বুঝবে না জানি। দুনিয়ার চোখে তুমি যাই হও, আমাদের কাছে একজন আততায়ী ছাড়া আর কিছু নও। একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? কথাটা এতদিন যেভাবে গোপন রেখেছিলে, আজও যদি তেমনি নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখতে, কিছু ক্ষতি হতো তোমার? আমি তো তোমার ছায়া থেকেও দূরে সরে এসে এই বিদেশ বিভূঁয়ে এসে কোনো উপায়ে নিজের ভাঙ্গা-ফাটা জীবনটা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছি। এটাও সইলো না তোমার? এসব আমাকে জানানোর দরকার কী ছিল? তুমি যে নিজেকে নিজেই অহিংসার অবতার মনে করে বসে আছো, আসলে তুমি যে কতো ক্রুর আর জল্লাদ, সেটা আজ জানলাম। আমার সমস্ত ধ্যান-ধারণার তুমি টুঁটি চেপে দিয়েছো, আমাকে নরকে ঠেলে দিয়েছো, এতশত ক্ষতি করার পরেও আমার প্রতি তোমার করুণা হয় না? এই বিদেশেও আমার পেছনে এসে লেগেছো! তোমার এই চিঠি আমার মধ্যে কী উথালপাথাল সৃষ্টি করেছে, সেটা তোমার মতো পাষাণ হৃদয় মানুষ কখনও ভাবতেও পারবে না। আমি ভালোভাবে বুঝেছি, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই এই বিষ তুমি আমার ওপর উগরে দিয়েছো। যাতে আমার শুকনো ক্ষত নতুন-করে আবার জেগে ওঠে। পচে যায় আর আমি জন্মের মতো শেষ হয়ে যাই। আমি আর এ-জীবনে তোমার মুখদর্শন করছি না বাবা। তোমার একটি অপরাধই আমাকে পিষে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তবু তো আমি কোনোরকমে বেঁচে ছিলাম। কিন্তু তোমার এই দ্বিতীয় অপরাধটিকে কখনও আমি ক্ষমা করতে পারবো না। কক্ষণও না।

তুমি আমায় সত্যি কথা বলার দিব্যি খাইয়েছিলে আর তুমিই আমাকে মিথ্যে বলার জন্যে বাধ্য করেছিলে। হ্যাঁ, আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, বাবা। আমি এলিসের সঙ্গে বাস করা তখুনি শুরু করে দিয়ে ছিলাম, বিয়ে না করেই। তুমি নিশ্চিন্ত জেনো, এই সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বিয়ে করছি। এখন তোমার ঐ অযাচিত-সতর্কবাণী আর শিক্ষার কোনই দাম নেই আমার কাছে। তা আমি তোমাকেই

ফিরিয়ে দিচ্ছি। এমনিতেই, তুমি যতটা ক্ষতি আগেই করে দিয়েছো, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি আমার আর কী হতে পারে! এখন আমার দাম্পত্যজীবনের চিন্তা করনেওয়ালা তুমি কে? আমার ভাগ্যে যা থাকে, আমি ভুগবো। এই অপ্রিয় সত্যি কথাটা তুমি ভালো করে হজম করে নাও যে তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের যেটুকু তন্তু এতদিন যাও-বা বেঁচেবর্তে ছিল, এই চিঠির পর সেটুকুও চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল। তোমার জন্যে আমি মরে গেছি বাবা,—আর, আমি চাই, এ কথাটা তুমিও ভালোভাবে নিজের মাথায় ঢুকিয়ে নাও।

আরেকটা শেষ কথা। তোমার শুদ্রত্বের যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার নির্গলিতার্থ যদি এই হয়, যেমনটি তোমার চিঠি বাৎলাচ্ছে, তবে সেটা কোনো গর্বের ব্যাপার নয়। আমি তা তোমাকেই ফেরৎ দিচ্ছি, কেননা তা আমার কোনো কাজে লাগবে না। তোমার তথাকথিত সহিষ্ণুতা আর প্রেমও আমার কাছে কোনো অর্থ বহন করে না। আমি নির্ভুলভাবে জেনে ফেলেছি তোমার ঐ প্রেম কী! আমি এরকম অসহায় আর পঙ্গু ভালোবাসার চেয়ে নিজের সত্যিকারের ঘৃণাকে দশ লক্ষ গুণ ভালো আর মূল্যবান মনে করি। ব্যস, তোমার মতো ধানাইপানাই করার ইচ্ছে আমার নেই, ফুরসৎও নেই।

শেষবারের মতো
তোমার কুন্দন।

স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

অগণিত দরজা আর অগণিত জানালা।...স্নানঘরে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আমি...। এক-এক করে সবক'টি জানালা-দরজা বন্ধ করে দিতে দেখি নিজেকে।...বিবিক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বাথরুম-সংলগ্ন পাশের ঘরটিতে, একজন রমণী সেখানে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। ঘরের দরজাটা বাথরুমের দিকে খোলা!...আমি ঝটিতে এগিয়ে যাই কপাট বন্ধ করতে...কিন্তু, কোথায় কপাট? তা তো নেই! যাক্-গে, ওর তোয়াক্কা না করে আমি শাওয়ার খুলে দিই আর তার তলায় বসে পড়ি। তখুনি হঠাৎ সেই রমণীর অস্ফুট স্বর স্পষ্ট শুনতে পাই কানে, 'এই, তোমার শাওয়ারটাকে দ্যাখো, কেমন উঁচিয়ে রয়েছে!' পরমুহূর্তে সেই নারীকে মেঝের ওপর শায়িত অবস্থায় দেখি আর আমি তার ওপর আরূঢ়।...আমার ঠোঁট তার ঠোঁটদুটিকে স্পর্শ করে, রগড়ায়, তবু কোনো স্ফর্শানুভূতি জাগে না মনে...সে আমাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে চলেছে...,সম্পূর্ণ বিবসনা নারী সর্বদেহের জোর দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে আমাকে তার নিজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে...কিন্তু

তার সেই উদলা শরীরের কোনো সুখানুভূতিই জাগে না আমার দেহে...এক মদির হাসি নিয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে...অধরে ঝুলে রয়েছে সেই হাসি...অঝরুর ভেতর লোলায়মান তার শরীর...তার অঙ্গবিক্ষেপ...চোখ দুটিও—আর অঝরু থেকে অঝোরে গড়িয়ে পড়েছে জলধারা. তার সর্বাঙ্গে...স্পর্শহীন শরীরে আমরা পরস্পর লীন হয়ে রয়েছি...সমস্ত একটা ছবির মতো। ...সশব্দে হাসছে সে...আমি অল্পসল্প শনাক্ত করতে পারি তাকে...আমার এক বন্ধুর স্ত্রী সে...কিন্তু মনে না জাগছে অপরাধী-চেতনা, না বিস্ময়বোধ। গোটা ব্যাপারটা এতই আকস্মিক, এমনই ঐন্দ্রজালিক!...আর সেই নারী আমার মধ্যে না-পারছে আকর্ষণ জাগাতে, আর না-পারছে বিকর্ষণ জাগাতে! আমার ইচ্ছাশক্তির কিছুই করণীয় নেই যেন...ফোয়ারারই একটা অংশ বলে মনে হচ্ছে তাকে...কিন্তু এতক্ষণে তার সেই অশরীরী-চেতনা ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছে আমাকে...আর সেই অনুভূতির সঙ্গে আমি বুঝে চলেছি...নিজেকে প্রত্যয়ান্বিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছি...সত্যিসত্যি এ নারী-অধরের স্পর্শ, বায়বীয়-কিছু নয়।...আমি আমার অবচেতন বিহ্বলতায় চুম্বনে-চুম্বনে ভরিয়ে দিই তাকে...সেই শূন্য জায়গাটিকে...এবং সহসা এক বিচিত্র তরাসে শিউরে উঠি অন্তর্মনে। রমণীর সেই স্মিতহাসি আমার কাছে ভুতুড়ে মনে হয়...আমার মুখ দিয়ে হয়তো একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে...এবং আমার চোখ খুলে যায় এবং নিজেকে নিজের ঘরে বিছানার ওপর শায়িত অবস্থায় আবিষ্কার করি। জেগে ওঠা-মাত্র যে জিনিসটির ওপর আমার চোখ গিয়ে পড়ে সর্বাগ্রে, সেটি আমার শিয়রের কাছে রাখা আধখোলা একটি খাতা। আমি চোখ কচলাই। এখনও সেই স্বপ্নের আবেশ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারিনি। হঠাৎ-ই মনে পড়ে, আজ আমার ছুটির শেষ দিন এবং কাল সকালের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে এই কলোনি।

এই হঠাৎ-ত্রাস-জাগানো অনুভূতি মনের মধ্যে জেগে ওঠা সত্ত্বেও আমি চোখ দুটি বন্ধ করে আবার সেই স্বপ্নটাকেই মনে করবার চেষ্টা করি। আমি দ্রুত লিখে ফেলতে থাকি সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত...যেটুকু মনে পড়ছে। স্বপ্নটা তো আমিই দেখেছি। কী অদ্ভুত অনর্গল আর উদ্ভট স্বপ্ন! অথচ সেটাকেও আমি লিখে রাখছি!...আপনাকে বয়ান করছি! কেন? কি জন্যে?...গত রাত্তিরে ঘুমের অতলে ঢলে-পড়ার আগে কোথায় যেন ছেড়েছিলাম আপনাকে? এখনও আপনাকে তেমন-কিছু জানাতে বাকি থেকে গেছে নাকি? নিজেকে এমন জর্জরিত আর পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে কেন? এতক্ষণের অন্তর্ঝড়ে ছিন্নভিন্ন কি হয়ে গেছে মুখ? আয়নায় হয়তো ধরা পড়বে মাংস-খোবলানো চোয়ালের দু-পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে স্বেদ, চোখের কোণে ক্লান্তির পিচুটি, আর চুল উদ্ভ্রান্ত। পুরো একটা রাত এত সুন্দর ঘুম দেওয়া সত্ত্বেও দেহমন জুড়ে এ ক্লান্তি কিসের? আর কতটুকুই-বা সময় রয়েছে আমার হাতে?...আমার

এই স্ব-নির্মিত বিবিক্তিও তো এবার ভাঙলো বলে। ব্যাস্, আজকের দিনটুকু...তারপর আবার সেই অগণিত মুখ আর অগণিত কণ্ঠস্বরের ভিড়ে হারিয়ে যাবো আমি। বেশিরভাগ লোকই কাল দুপুরের মধ্যে এসে পড়বে। কিন্তু দু-একজন হয়তো আজ রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারে। জোসেফ তো একবার এসে ফিরে গেছে। এই নিভৃতি ওর ভালো লাগেনি। সম্ভবত কাল দুপুরেই ফিরবে সে।

না, আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনো বাসনা নেই। আমার এই একাকীত্বও এবার ছিন্নভিন্ন হতে চায়। এই একমাসের চুক্তি, যা আপনার সঙ্গে করেছিলাম, এবার শেষ হবার মুখে।

তবু, পুরো একটা দিন এখনও আমাদের হাতে আছে। একটা গোটা সকাল, একটা গোটা দুপুর আর সন্ধ্যা। তারপর গিয়ে বিদায় নেবো আমি। আমি এখনও স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই আছি...স্বপ্নটা কী অদ্ভুত ছিল, তাই না? ...কেমন চমকপ্রদ, আর, শেষের দিকটা কেমন ভুতুড়ে আর ভয়-ধরানো!...স্বপ্নটা ভাঙার পর দেখি ঘামে নেয়ে উঠেছি আমি আর বুকটাও অসম্ভব ধড়ফড় করছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে কতখানি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম! কিন্তু স্বপ্ন-বৃত্তান্তটা লিখে ফেলার পর কেমন হাসি পাচ্ছে। তাজ্জব কাণ্ড, এই স্বপ্নে আবার মেয়েমানুষের আসার কী দরকার ছিল? তাও এমন একজন মেয়েমানুষ এলো, যার সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই কোনো। এত মেয়ে থাকতে একা তাকেই আসতে হয় আমার স্বপ্নে?...আমার শত-শত চেনা মেয়েদের মধ্যে একা তাকে দেখতে পাওয়াটা ততটাই বিস্ময়কর নয় কি, যতটা সেই বাথরুম? অজস্র দরজা আর জানালাওয়ালা সেই বাথরুম!!! দুটিই সমান অসম্ভব আর সমান আজগুবি। তাছাড়া আর কি?

জীবনের ঘটনাসমূহকে পর্যায়ক্রমে মনে করতে পারাটা এক দুরূহ সমস্যা।...আনুপূর্বিকতাই চাই আমি—অবিন্যস্ততা মোটেই পছন্দ নয় আমার। কিন্তু কালের এই আকাশ-ছোঁয়া আস্তাকুঁড় নিয়ে আমি করবটা কী? পারিপাট্যের কোনো অবকাশই নেই যাতে। আপনি এতখানি বরদাস্ত করলেন আমাকে, এভাবে এতক্ষণ সঙ্গে দিলেন, ব্যাস্...আর বেশিক্ষণ আপনার সহনশীলতাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করার ইচ্ছে নেই আমার। এবার শেষ করছি। ...এলিস শেষপর্যন্ত ফিরেই গেল নিজের দেশে—আর...এখন সেসব ঘটনা সুদূর অতীতের বলেও মনে হচ্ছে, যেন গতজন্মের ব্যাপার। পুনর্জন্মে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।

এমনিতে, আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত কারণ ছিল ওর কাছে। নতুন-নতুন আসার পর, প্রায়ই বলতো, মনে হচ্ছে ভারতবর্ষই আমার আসল জন্মভূমি, জার্মানি নয়। প্রতিটি ব্যাপারে কী-নিদারুণ কৌতূহল ছিল ওর! সে যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি রোমান্টিক আর কল্পনাপ্রবণ, সেটা আগে ভাবতে পারিনি। দারুণ বিস্ময়কর ঠেকেছিল আমার। অথচ ওকে আমি অনেক বছর ধরে চিনতাম। জার্মানরাও কম

বিচিত্র নয়। একবার কোনো কিছুকে নিয়ে পড়লে প্রাণ বের না-করে ছাড়বে না। ওদের কল্পনারও কোনো লাগাম নেই, তা এমনই প্রবল যে একবার করতে বসলে পৃথিবীটাকেও গ্যাসের বেলুন বানিয়ে দেয় আর কি! ওর সেই উৎসাহের ছোঁয়া আমার গায়েও লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি? নিজের দেশটাকে আমারও এক আশ্চর্যলোক বলে মনে হতে শুরু হয়। তখন কি বুঝেছি যে স্বয়ং এলিসই যাবে বদলে, তাও এত তাড়াতাড়ি আর আমূল! আমি যদি ওর মতো করে নিজেকে বদলাতে না পেরে থাকি, তাতে আমার দোষ কী? আমি তো একেবারে উল্টো মেরুতে চলে গিয়েছিলাম। ঘৃণা ও দ্রোহের শেষ সীমা ছুঁয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি। কিভাবে? এলিসের জন্যেই তো? অন্তুতপক্ষে এটুকু বলা যেতেই পারে যে, আমার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে এলিস একটা নিমিত্ত ছিলই। আর, দৌর্গত্যি দেখুন,...এখন সে-ই আমার বিরুদ্ধে! এলিসের মনে হয়তো এক-চিলতে আশা এখনও বেঁচেবর্তে আছে যে আমি আবার ফিরে যাবো সেই ঘৃণায় আর আমরা আবার আগের মতো হার্দ্য হয়ে উঠবো...

কি বিচিত্র সমন্বয় দেখুন! এহেন ফ্যাণ্টাসি আর কঠোর বাস্তবধর্মিতার। আপনি স্বয়ং না-ভোগা অব্দি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। ইদানিং আমার মাথায় অদ্ভুত-অদ্ভুত চিন্তা জন্ম নিচ্ছে। এখন আমি আমার স্বদেশবাসীর ডাস্টবিন হতেও রাজি আছি, সেটাও আমার কাছে সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। ভালো কথা, তারা অলস আর কাতর। কিন্তু সেই আলসেমি আর কাতরতা তাদের রক্ষাকবচও তো বটে। এই ভয়ংকর দ্রুত ও মুহুর্মুহ বদলায়মান পৃথিবীতে এই দুটিই তো আমাদের মূলধন, যে-দুটিকে আমাদের আঁকড়ে থাকা উচিত। নইলে এই তেজিয়াল শেতাঙ্গরা, এই শুক্রাচার্যের উদ্বহরা আমাদেরকে এমনভাবে গিলে খাবে যে আমরা টেরও পাবো না। কিংবা এমনও হতে পারে যে সত্যি-সত্যি এমন একটা সিদ্ধি আমরা হাসিল করে নিলাম যা দিয়ে তাদের অন্তর্জঠরে ঢুকে তাদের নাড়িভুঁড়ি চিরেই বেরিয়ে আসতে পারি আমরা! মশাই, আপনি কি মনে করেন, সেটা কি সম্ভব?

আমি আপনাকে জানিয়েছি, এলিসের বাবা আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমি আমার গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছি, ডক্টরেট হাসিল করেছি। আমি ছিলাম তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। মশাই, কমসে-কম এই একটা ব্যাপারে ইউরোপীয়দের মহানুভবতা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। বিদ্যার্জন মাত্র নয়, তাকে দূর দূরান্তে পৌঁছে দেবার ব্যাপারেও তাঁরা অদ্বিতীয়। তাঁরা সত্যিকার-অর্থে গুরু, তাঁদের কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই, জাতবিচার নেই। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের কোনো তুলনাই হয় না। সমাজে বিদ্যত্বের কী সম্মান, সেখানে গিয়ে চোখে পড়ে সেটা। আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটা মেকি সমাজ যা সেই আসল সমাজটিকে লাশ মনে করে কাপালিকের মতো চড়ে বসেছে তার ওপর। কিংবা

বলতে পারি যে আমাদের তথাকথিত জ্ঞানই একটি অনুচিকীর্ষু জ্ঞান। অর্থাৎ উভয় অর্থেই, এ হলো অবিদ্যা বা মূঢ়তা। আমাদের মোক্ষ, আমাদের জীবনবোধ বা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই সন্দেহজনক।

এলিসের মনে স্বভাবতই আমার সহযোগিদের প্রতি, আমার সঙ্গী-অধ্যাপকদের প্রতি একটা সত্যিকারের আর তীব্র ঘৃণা ছিল। আমি ওকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এ তার একেবারেই অন্যায়। বুদ্ধির দিক থেকে আমরা কেউই জার্মানদের চেয়ে কম যাই না। কর্মবিমুখতা আর আলস্য, পরনিন্দা আর ওপরচালাকি অতবড়ো দুর্গুণ নয় যতটা তুমি ভাবছো। এই লোকগুলোও বিদেশে গিয়ে কামাল করছে কিনা? বিদেশিদের মুখোমুখি বসে পাঞ্জা কষছে কিনা? ওসব দুর্গুণ অমূলক? শতশত বছরের পরাধীনতা আর দাসত্বের বেড়ি ভেঙে সবেমাত্র মুক্ত হয়েছি আমরা। জাড্যের নিয়ম কেবলমাত্র ভৌতজগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, মানুষের সমাজেও তার সমান কার্যকারিতা রয়েছে। আমাদের পরিবেশের সর্বত্র যে-জড়তা এখনও জড়িয়ে রয়েছে, তাকে দূর করার জন্যে সময় তো চাই-ই তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। এই সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে দুটি সভ্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যে-দুটি সভ্যতা পরস্পর জাতে ও টোনে আলাদা তো বটেই, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত ধর্মী। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, দুটি পরস্পর-বিরোধী সভ্যতার সন্নিবেশ যখনই যে-সমাজে ঘটেছে, তখনই একটা খচ্চরপনার জন্ম ঘটেছে। আমরা না অশ্বগতি লাভ করতে পারছি, না গর্দভের মতো স্থিতধী হয়ে থাকতে পারছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে দুটো গুণই প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমশ। তোমার কি মনে হয় না এলিস যে, পশ্চিমকে হজম করতে হলে আমাদের নিজের মতো করেই হজম করতে হবে? তোমাদের চাবুক আমাদেরকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়ে মারুক আর আমরা মুখে গ্যাঁজলা তুলে ধপাস করে পড়ে যাই, এ তুমি চাইবে কেমন করে? এর আগেও এ ধরনের লোক ছিল, আগেও এই ইউনিভার্সিটি ছিল, সেদিন তো তোমরা আমাদেরকে সহানুভূতির চোখেই দেখতে। তখন তো তোমরা এসব জিনিসে মজা পেতে বেশ। তবে আজ হঠাৎ কী হলো? গভীরে ঢুকে দ্যাখো এলিস, তোমার কি চোখে পড়ে না, আমরা প্রত্যেকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে একই দ্বন্দ্বে ভুগেছি।— ইউনিভার্সিটি হোক পার্লিয়ামেণ্ট হোক, সেমিনার হোক, হাট-বাজারই হোক— প্রতিটি জায়গায় একটা দ্বৈধীভাব সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে আমাদের আর আমরা অসহজ আড়ষ্ট বোধ করছি। দ্যাখো, কত-কত ব্যাপার এসে আমাদের ওপর দুমদাম চেপে বসেছে, যেগুলোতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। ধীরে-ধীরে তো আমরা আমাদেরকে এসব অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি।

কিন্তু এলিসের যৌক্তিকতা আমার যৌক্তিকতা ছিল না। একথা ভেবে সে যুগপৎ অবাক আর ক্রুদ্ধ হতো যে, যে-সব ব্যাপার আমার দু-চক্ষের বিষ ছিল, সেগুলোই

আজকাল আমার কাছে প্রিয় ঠেকেছে কেন? আমার এই লক্ষণটাকে সে আমার পতন বলে মনে করতে শুরু করলো—চেতনাগত ও চারিত্রিক পতন। সে ওর বাবাকেও এসব জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। অন্যের চিঠি খুলে পড়ার অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু মানুষের কিছু-কিছু দুঃখ এমন হয় যা তাকে সন্দিগ্ধ আর সংকুচিত করে তোলে। দুর্ভাগ্যত, এহেন সন্দেহ নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আমার মনেও যে সন্দেহ জেগেছিল, তা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। মনে খুব চোট পেলাম এই ভেবে যে এলিস এখন আমার গুরুর কাছেও হীন প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। আমার মনে এলিসের যে ভাবমূর্তি ছিল, চুরি করে পড়া ঐ চিঠিগুলো তাতে একটা ফাটল ধরিয়ে দিল। আলবাৎ, কাজটা আমি ঠিক করিনি। আর যখন করেই ফেলেছি, তখন এলিসকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে ঝড় উঠবে বটে, কিন্তু সেটা উভয়ের ক্ষেত্রেই ভালো হবে। আমি আমার ক্ষোভ জাহির করবো, সে নিজের ক্ষোভ জাহির করবে। কিন্তু এতটা সাহস আমার মধ্যে ছিল না। আমি আমার দৌর্বল্যের কাছে অসহায় ছিলাম। হৈ-হল্লাকে ভয় পেয়ে এসেছি চিরকাল। আর এটাই ছিল আমার মস্ত বড়ো ভুল। মনে-মনে গুমরে মরার চেয়ে চুটিয়ে ঝগড়া করা সব দিক থেকে ভালো। ঝগড়াঝাঁটির পর একধরনের শান্তি পাওয়া যায়—সমস্ত কাদা ধুয়ে বেরিয়ে যায়। আমার মায়েরও এই এক অভ্যেস ছিল—মনের মধ্যেই গুমরে মরতেন তিনি। এর ফলে মিছিমিছি ভুল-বোঝাবুঝি বাড়ে। নিচু ক্লাসের লোকদের দেখেছি—পুরুষ মেয়েমানুষের মধ্যে আকছার গালিগালাজ, মারামারি, হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। মাঝে-মাঝে মনে হয় সভ্যভব্য-মার্জিত হওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো আপদ। কিংবা মানুষকে অসাধারণ আর সর্বজ্ঞ হওয়া উচিত। যা সম্ভবত হাজারে একজন হয়। বাদবাকি আমাদের মতো লোকেদের নিজেদের রাগ-দ্বেষ ঘৃণা ক্ষুব্ধতা নীচতাকে সটান বাইরে বের করে দেওয়া উচিত, মনে পুষে রাখাটা ঠিক নয়। মানুষকে শেষ পর্যন্ত সত্যই রক্ষা করেঃ হয় আত্ম-সংযমের সত্যতা, নয় আত্ম-অভিব্যক্তির সত্যতা। দুটোর মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই, সেখানে শুধু ভণ্ডামি আর দম্ভের বাস। আরে, আমরা যেমন, তেমনি থাকি না কেন? যা চিন্তা করি, সেটা করলেই দোষ কী? অপরকে অন্ধকারে রেখে লাভ কি? অন্যকে নিজের সম্পর্কে অন্ধকারে রেখে, অন্যেরও সমস্ত না-জেনে এহেন প্রাণরসহীন সম্পর্ক বা সংযুক্তি একে-অপরের শরীর স্পর্শ করতে পারে মাত্র, পারস্পরিক আত্মার রহস্যঘন অবচেতনাকে ছুঁতে পারে না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অ-ঢাকাঢাকি সম্পর্ক গড়ে তুলতে না-পারা অব্দি সত্যিকারের মিলন সম্ভব হবে কেন? আসলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্র লালসা, নিজেকে অন্যের কাছ থেকে কোনো-না-কোনো ভাবে গোপন করে চলার মানসিকতাই, প্রতিটি জীবনের গোপন-সংগোপন সত্তাই আমাদেরকে এক হতে দেয় না। দুর্বলতা যাই

থাকুক অন্যের কাছে ক্রমশ তা খোলসা হয়ে পড়া দরকার, তবেই হয়তো সেই দুর্বলতা থেকেও মুক্ত হতে পারবো আমরা। মুক্ত হতে না পারলেও, একে-অপরের দুর্বলতাগুলোকে পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা তো যায়ই। আমরা পরাদর্শী হতে পারলে, একজনের স্ব-এর সঙ্গে অন্যজনের স্ব-এর মেল ঘটতে পারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পর্কের ভিত্তিই হলো এই। এমনটা করলে আমরা অন্তত পক্ষে নম্র হতে পারি। এ জিনিস আমাদেরকে স্বীকার করতে আর ক্ষমা করতে শেখায়। মানুষকে নিজের সম্পূর্ণ স্বভাব নিয়ে বাঁচা উচিত, নয় কি?

কিন্তু, এ তো হলো পশ্চাৎবুদ্ধি! এখন পরিতাপ করলে কী হবে? এমনিতে এলিস এখনও আমাকে চিঠি লেখে। আমাদের দু'জনের মধ্যে যাকে বলে সম্বন্ধবিচ্ছেদ বিধিসম্মতভাবে এখনও সেটা হয়নি। আমার গুরু জানিয়েছেন, এলিস আমাকে ঠিক আগের মতই চায় তাই ওর স্বভাবের বৈচিত্র্যগুলোকে জানা-বোঝার জন্যে আমাকে ধৈর্য ধরে চলতে হবে। আমি তাঁকে এখনও জবাব দিই নি। কী জবাব দেবো বলুন! বাবা আর মেয়ের মধ্যে একধরনের গভীর টান থাকে। তিনিও তো আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু এলিসের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে নিয়ে তিনি কতখানি আশ্বস্ত ছিলেন, এটা বলা দুষ্কর। একদিক থেকে তিনি আমাকে চাইতেন বটে, যেহেতু আমি তাঁর সবচাইতে প্রিয় আর আদুরে ছাত্র ছিলাম আর আমিই তাঁর একমাত্র মেয়ের প্রেমিক ছিলাম। এলিসের একটা জিনিস দেখে তাঁর ভালো লেগেছিল যে, এলিস প্রত্যেক লোকের মধ্যেই কোনো-না কোনো খুঁত বার করে অথচ আমার সম্পর্কে ওর কোনো অভিযোগ ছিল না, বরং আমার প্রতি পক্ষপাতটা ও প্রকাশ করে ফেলেছিল। কিন্তু অন্যদিকে আমাদের দাম্পত্য-ব্যাপারে তিনি ছিলেন সশঙ্কচিত। এলিসের সঙ্গে আমার মেলামেশার বিরুদ্ধে কখনই আপত্তি তোলেন নি তিনি। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব তাঁর সামনে উপস্থাপন করি, উনি চমকে উঠেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয়রা ভীষণ রক্ষণশীল আর আন্তর্জাতিক বিয়ের সেখানে চল নেই। তিনি এও মনে করতেন যে প্রত্যেক হিন্দু পরিবারই একান্নবর্তী পরিবার এবং সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আর নিজস্ব সত্ত্বার কোনো গুরুত্ব নেই। এলিসের পক্ষে সেরকম পরিবেশে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়— এ আশঙ্কা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও তাঁকে এই বলে দুর্ভাবনামুক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম যে আমার বাবা-মা আমাদের সঙ্গে থাকবেন না। শুধু আমার আর এলিসের, দু'জনের সংসার হবে। তবুও, তিনি বলেছিলেন, আমাকে আমার মা-বাবার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে হবে। এলিসকে তাঁরা পছন্দ করেন কিনা, স্বীকার করেন কিনা সেটা জানা দরকার। আমি তাঁকে মিথ্যেমিথ্যে বলে দিই যে এবার যখন আমি আমার টিমের সঙ্গে বস্তার গিয়েছিলাম তখন নিজের বাড়িতেও গিয়েছিলাম আর বাবা-মা উভয়েই এলিসকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন

আর তাঁরা এলিসকে পুত্রবধূ হিসেবে পেতে আগ্রহী। শুনে, বলা বেশি, তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এলিসকে আমি এই নাটকীয় মিথ্যাচারণে আগেই শরীক করে নিয়েছিলাম।

কিন্তু এরপরেও আমার আচার্যের মন থেকে দ্বিধা ঘোচে নি,—এটা আমি জানতে পারি তখন, যখন তিনি একদিন আমাকে—আমি যেখানে বাস করতাম সেখানে এসে একান্তে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'এলিসকে তুমি ততখানি চেনো না, যতখানি আমি তাকে চিনি। আমার বিশ্বাস, সে তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারবে। তোমরা দু'জনে মিলে নিজেদের ফিল্ডে ভালো কাজ করতে পারবে, সেটাও আমি জানি। কিন্তু একদিন না একদিন তুমি স্বদেশ ফিরে যাবেই। জানি না, এলিস সেই বিজাতীয় পরিবেশে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা। আমি চাই, তুমি এতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। খুব ভালো করে চিন্তা করো, বোঝো। তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি যে, আন্তর্জাতিক বিয়ের লঞ্জেভিটি সম্পর্কে আমার মনে গভীর আশঙ্কা রয়েছে। আমি তোমাকে চাই আর তোমাকে নিরুৎসাহ করাটা আমার অভিপ্রেত নয়। আমার স্থির বিশ্বাস, এলিস তোমাকে চায়, গভীরভাবে চায় আর তুমিও তাকে চাও। কিন্তু কালকের মধ্যে তুমি ফয়সালা করো যে, তোমরা ভারতে গিয়েই বসবাস শুরু করবে, সেখানেই কাজকর্ম করবে—আমার সমঝদারি মোতাবকে, সেটাই সবদিক থেকে স্বাভাবিক আর সঠিক হবে। কিন্তু আসল সমস্যাটাও দেখা দেবে সেখান থেকে। আমার ভালভাবে জানা আছে যে তোমাদের দেশের জলবায়ু শুধু নয়, তোমাদের পুরো সংস্কৃতিই আমাদের চেয়ে একেবারে আলাদা আর একজন ইউরোপিয়ানের পক্ষে সেখানে টিকতে পারাটা অসম্ভব না হলেও, খুবই কঠিন। আমি চাই, এই বাস্তবিকতাটাকে তুমি অদেখা কোরো না। এলিসের মাথায় একবার যেটা বাসা বাঁধে তাকে দূর করার বা তাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন মনে করে না। সে ভীষণ জেদি আর ইমপালসিভ। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, তুমি স্বভাবের দিক থেকে ধীর আর গম্ভীর, বলছি যে অন্ততপক্ষে তুমি এই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে দ্যাখো। আমি ভারতবাসীদের জানি শুধুমাত্র বইয়ের মাধ্যমে—কিন্তু তবু আমার মনে হয়, সেটা একেবারেই আলাদা ধরনের সমাজ আর এতো বড়ো ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলা সহজ নয়। আমি শুধু এই ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম। বাদবাকি, তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমাকে ভুল ভেবো না।' ইত্যাদি-ইত্যাদি।

স্যার, আজ স্মরণ করতে বসে সেই কণ্ঠস্বরটি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি যেন...গুরুমশাইয়ের মুখভঙ্গি, তাঁর হাবভাব, যেভাবে তিনি আমার ঘরে ঢুকেছিলেন, যেভাবে বসেছিলেন...সমস্ত চোখের সামনে ভেসে উঠছে যেন। একমাত্র তাঁরই

সামনে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় আমার। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কতটা নির্ভুল ছিল, সেটা এলিস বা আমি, কেউই জানতে পারিনি। গুরুত্ব দিই নি।

এলিস মা হতে চায়নি—এটাও আমার ভালই ঠেকেছিল। ওসব ঝামেলা সামাল দেওয়ার ফুরসৎ আমারই বা ছিল নাকি? আমার ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাম্বিসান সেইসময় তুঙ্গে ছিল। এটা তো পরে, ভারতবর্ষে দু-তিন বছর কাটানোর পর ক্রমশ জানতে পারি যে শুধুমাত্র ইন্টেলেকচুয়াল জিজীবিষাই আমার পুরো জীবন নয়—আমি এর বাইরেও, অন্যকিছু। আর ঐ 'অন্য কিছু'র হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার এলেম আমার ইন্টেলেক্টেরও নেই। এটাই ধরে নিলাম, কিংবা বলতে পারেন, আমি এটা আকাঙক্ষা করে বসলাম যে, এলিস যেহেতু আমার সহধর্মিনী, সুতরাং আমার ঐ 'অন্যকিছু'র সঙ্গে ওকেও সংযুক্ত হওয়া উচিত। ওকে এটাও গ্রহণ বা মেনে নেওয়া উচিত। এ কি আমার সহজ আর স্বাভাবিক আকাঙক্ষা ছিল না?

কিন্তু, সম্ভবত এখানেই ভুল করছি আমি। সেই 'অন্য কিছু'র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তো এলিসের মধ্যে আরেকজন এলিসের জন্ম ঘটেছিল, যে ছিল আমার অপরিজ্ঞাত। আমি আপনাকে সম্ভবত গোড়াতেই জানিয়েছিলাম, যে, আমাদের দু'জনের মাঝখানে একজন পাদ্রির আবির্ভাব ঘটেছিল। সত্যি বলছি স্যার, এ ছিল আমার কাছে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য। মতাদর্শগত দিক থেকে এলিস পুরোপুরি নাস্তিক ছিল। চার্চ আর পাদ্রি কেন, ধর্মমাত্রের নাম শুনলেই সে চিড়বিড়িয়ে উঠতো। আমাদের দু'জনের মধ্যে খৃষ্টধর্মকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই তর্কবিতর্ক হতো। ওর বাবাও ধার্মিক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদে তবু ধর্মানুভূতির সামান্যতম স্থান ছিলই। প্রায়শই বিতর্কের সময় আমরা দু'জনে একতরফে চলে আসতাম আর এলিস একা অন্য তরফে। সেই এলিসই হঠাৎ চার্চ যেতে শুরু করলো, কিভাবে সে ঐ অস্ট্রিয়ান পাদ্রির খপ্পরে পড়লো, এসব ছিল আমার বোধগম্যির বাইরে। হয়তো সে নিজেকে চারদিক থেকে বন্দী করতে শুরু করেছিল। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-চরিত্রের প্রতি বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াই ওকে নিজধর্মের প্রতি উন্মুখ করে থাকবে হয়তো আর যে-খৃষ্টসংস্কারসমূহকে সে নিজের সমঝদার-মোতাবেক অনেক গভীরে পুঁতে ফেলেছিল, সেগুলিই শত্রুপক্ষের ঘেরাও থেকে ওকে মুক্ত করতে একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এখানে একটা কথা উল্লেখ না-করলেই নয় যে, এলিসের মা খুবই ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনিই শেষাবধি এলিসকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই বলে, যে, এলিসের হাওয়া-বদল করা একান্ত দরকার, নইলে অসুখ ধরে যাবে। সেইসময় আমাদের ছেলের বয়স মাত্র ছ'মাস।

নিষ্ফল দাম্পত্যের হতাশ! ইন্টেলেকচুয়াল চাইল্ড বলে কোনো কথা নেই, আর যদি থাকেও, তার অধিষ্ঠান দাম্পত্য নয়। এমন নয় যে কথাটা এলিস ক্রমে-ক্রমে বুঝে ওঠেনি। না বুঝে থাকলে মাতৃত্ব স্বীকার করে কি করে? কিন্তু তবু

শেষপর্যন্ত সে সহজ হতে পারেনি—সংশপ্তকের মতো ভুগেছে শুধু—যেন এই আপদি আমিই চাপিয়ে দিয়েছি ওর ঘাড়ে। অথচ মা হওয়ার জন্যে সে নিজেই, বেজার মনেই সই, প্রস্তুত হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, ওর মা হওয়াটা আমাদের মাঝখানে ক্রমবর্দ্ধমান একাকীত্ব বা বিচ্ছন্নতাবোধের তেমন লাগসই উপচার ছিল না বটে, কিন্তু প্রায়-ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব এহেন দূরত্ব হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। তা একটা অমিল দাম্পত্যকেও সহনীয় করে তুলতে পারে। একটা সেতু-গোছের হয়ে ওঠে দু'জনের মাঝে এই তৃতীয় জন। দু'জনকে সে নতুন করে জুড়তে শুরু করে। মনে-মনে আমরা উভয়েই কি ঐ অদৃশ্য-সেতুটিকে অনুভব করিনি? নিশ্চয়ই করেছিলাম। নাহলে সে যে একেবারে বিরুদ্ধস্বভাব ছিল, অনুকূল হয়ে ওঠে কেমন করে?...সেও এমনি কিছু অনুভব করেছিল, হয়তো। বিড়ম্বনা এই যে, সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও সে সহজ হতে পারেনি—উল্টে আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছিল। বাচ্চাটা পেটে থাকতেই আমি আমার মাকে আনিয়ে নেওয়ার কথা বলেছিলাম, কিন্তু সেটা ওর পছন্দ হয় নি। জোসেফের স্ত্রী আমাদেরকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এলিস তার সঙ্গেও সবসময় ঠাণ্ডা আর রুখুরুখু থেকেছে। এটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি।

ছেলে হয়েছে শুনে মা দূর থেকেও ছুটে এসেছিলেন। আমার ভারত আসা তখন তিন বছর হয়ে গেছে। এই তিন বছরের ব্যবধানে আমরা কখনও অনন্তপুর যাইনি। তাঁরাও আমাদের বাড়ি আসেন নি। আমি মাকে ডেকে পাঠাইনি, খবর দিয়েছিলাম মাত্র। আমাদের মধ্যে আগের মতো সম্পর্কই বা ছিল নাকি? কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মা এসে পড়ায় স্বস্তি বোধ করেছিলাম। একধরনের মেণ্টাল সাপোর্ট পেয়েছিলাম। অবশ্য মুখে সে-কথা জাহির করিনি। এলিস মোটেই খুশি হতে পারেনি। মা যে সবসময় নাতিকে কোলে নিয়ে বসে থাকেন, সেটাও সে বরদাস্ত করতে পারতো না। মা-র কিন্তু তাতে খারাপ লাগতো না। তিনি নিজের নাতিকে নিয়েই মেতে থাকতেন—এলিস, এমনকি আমার সঙ্গেও খুব-একটা কথা বলতেন না। ওঁর শুধু একটাই অভিযোগ, আমি কেন বাবার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেছি! তাঁকে ওই চিঠি লিখেছিলাম কেন? আমাদের সঙ্গে যতদিন ছিলেন এই ছিল তাঁর রোজকার কথা। মায়ের হয়ত ধারণা ছিল, এবার আমি বাবা হয়ে নিশ্চয়ই তাঁর দুঃখ বুঝবো। বারবার তিনি বাবার সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার কথা বলছিলেন। আমার আচরণ বাবাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। কিন্তু তবু, উনি তো আশুতোষ মানুষ, ছেলেকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন। এটা দু'জনের পক্ষেই ভালো হবে।

মায়ের আসা দু'মাসও পেরোয় নি, এমন সময় ছোট ভাই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হাজির। বাবা ওকে পাঠিয়েছেন। ভাইয়ের হাত-মারফৎ একটা চিঠিও

পাঠিয়েছেন আমার জন্যে যার কাঁপা-কাঁপা হরফগুলো পড়তে-পড়তে আমার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল—

'কুন্দন!

আমার শরীর ভালো নেই, তোর মাকে পাঠিয়ে দিস। এমনিতে চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু বার্দ্ধক্যে ছোটোখাটো কষ্টও অনেক বড়ো মনে হয়। আর তোর মা, তুই জানিস, আমার অভ্যেস এমন খারাপ করে রেখেছে যে ও না থাকলে নিজেকে পঙ্গু মনে হয়। আমি এখন, ধরে নে, শেষ বিকেলের সূর্য, যে-কোনো মুহূর্তে ঢলে পড়তে পারি। ব্যাস্ তোকে, বৌমা আর নাতিকে একবার শেষ দেখা দেখবার ইচ্ছে আছে। না ভোগালে আমি নিজেই তোর মায়ের সঙ্গে আসতাম, তোর নেমন্তন্নের অপেক্ষায় থাকতাম না। কিন্তু...কি করবো বল! যদি পারিস, একবার বৌমা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে, দু'দিনের জন্যেও, দেখা করে যা। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। বাচ্চাটা একটু বড়ো হোক, তারপরেই না-হয় আসিস। আমি অপেক্ষা করবো। চিন্তা করিস না। নিজের যত্ন নিস, আর আমার দোষ-ত্রুটি মার্জনা করিস। আর কি লিখি, তুই নিজেই বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। ইতি,

তোর

নারায়ণরাম'

মা চলে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চলে গেলে কতো ভালো হতো! কিন্তু, 'যে অভাগার কপালে দুঃখ আছে, বিধাতা তার বুদ্ধি আগেই হরণ করে নেন'— কথাটা এমনি-এমনি বলা হয়নি। এলিসকে দোষ দেব কেন? সে না-ই যেতো, আমি একাই দু-চারদিনের জন্যে যেতে পারতাম না কি? কিন্তু আমার স্বভাবে যে আত্মঘাতী প্যাঁচ রয়েছে।...কোনো সমস্যার তৎক্ষণাৎ মোকাবিলা করতে আমার ভয় হয়। সমস্যাকে এড়িয়ে চলি। যেন তাতেই সমাধান হয়ে যাবে....এখন ওসব মনে করে কী লাভ! বাবার চিঠিটা পড়ে আমি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, একান্তে। কেঁদেই যেন স্বস্তি পেলাম, আর সেই চিঠির অব্যক্ত কিন্তু অসন্দিগ্ধ ও তাৎকালিক নির্দেশকে অমান্য করারও একটা ছুতো পেয়ে গেলাম। কেন? এখন তো এটাই বলতে হবে।

মাসও ফুরোয়নি, আমি কাজে বাইরে গিয়েছিলাম, সম্ভবত ওড়িশা। ফিরে এসে দেখি দুটো টেলিগ্রাম এসে পড়ে রয়েছে। একটায় 'বাবা সিরিয়াস', আমাকে শিগ্‌গির ডেকে পাঠানো হয়েছে, দ্বিতীয়টি দিন পাঁচেক পরের, তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। তাও তিন দিন আগে এসেছিল।

জীবনে প্রথম মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখি আমি। মা মানতেই চাননি যে আমি বাড়িতে ছিলাম না। তাঁর বিশ্বাস, আমি জেনেশুনেই বাবাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগের

মুহূর্ত পর্যন্ত কষ্ট দিতেই এই নিষ্ঠুর কাজ করেছি। আর বাবা সেই পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শুধুই 'কুন্দন! কুন্দন' করে গেছেন।

আমার ভাই ও বোন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। হাহাকার করে মা আমাকে শুনিয়ে দেন যে সেই পেত্নী, অর্থাৎ এলিস, আমাকে তুকতাক করেছে, ওর কখনও মঙ্গল হবে না। এই অভিশাপ ছুঁড়ে দেওয়ার সময় মায়ের খেয়াল থাকেনি যে সেই পেত্নীর যদি মঙ্গল না হয়, তাহলে তাঁর ছেলের মঙ্গল হবে কেমন করে! সেই পেত্নীর সঙ্গে বাস করতে হবে যাকে।

আনমনা ধুলো

তো, নিন স্যার, আমার এই অনিঃশেষ গল্পের শেষটাও এসেই পড়লো। এখন আপনি জানতে চাইবেন—জানতে চাওয়া উচিতও আপনার—যে, এইসব মাথামুণ্ডুহীন গল্প আপনাকে শোনানোর কী দায় পড়েছিল আমার? সত্যি বলতে স্যার, কিছুটা তো মনের ভার হালকা করার জন্যে, আর কিছুটা এজন্যেও যে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি নিজের হিসেব চুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। দেখতে চেয়েছিলাম, এর পরেও আমার শ্বাস নেওয়ার মতো সামান্যতম গুঞ্জাইসও বেরিয়ে আসে যদি!

আর এখন, গল্প যখন শেষ, আর আমার-আপনার মধ্যে যে-চুক্তি হয়েছিল সেটাও যখন চুকেবুকে গেল, তখন বিদায়ের আগে একটা কথা জানিয়ে যাওয়া অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করছি যে, যে-দুরারোগ্য ব্যাধিটির উল্লেখ আমি এই গল্পের উপারম্ভে করেছিলাম, তা থেকে নিবৃত্তিলাভের কিছু-কিছু লক্ষণ আমি টের পেতে শুরু করেছি নিজের মধ্যে। সততই আমি এই সারবত্তায় এসে উপনীত হয়েছি যে মাস-দু'য়েকের জন্যে একটা ফাঁকা ঘরে নিজেকে কয়েদ করে রাখার এক্সপেরিমেণ্টটা কিছু মন্দ হলো না। আর এই দুটো মাস এমন, যখন এদেশের সূর্য এদেশের মাটিকে সবচেয়ে বেশি তাতিয়ে রাখে, ঝল্‌সে দেয়। দেখছেন স্যার, মাস-দু'য়েক বেবাক শূন্য পড়ে-থাকা এই কলোনির বুকে আবার কিভাবে প্রাণচিহ্ন ফুটে উঠছে ক্রমশ! আপনার কানে ঐ কোলাহল এসে পৌঁছচ্ছে না? আর কিছুক্ষণ বাকি...তারপর এই নির্জনতাও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে আর একটা তুমুলের মাঝখানে ধপাস্‌ করে গিয়ে পড়তে হবে আমাকে। যে-তালাটি আমার দরজায় দু-মাস ধরে আঁটা রয়েছে, সেটা খোলার শব্দ শুনতে পাবেন আপনি। দেখবেন, আমি স্বয়ং নিজের হাতে সেটা খুলছি আর একটা লম্বা ছুটি কাটিয়ে তরতাজা হয়ে ফেরা নিজের সঙ্গী-সাথীদের স্বাগত জানানোর জন্যে প্রস্তুত রয়েছি।

...কী, আপনি ঐ কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন না?...এতদীন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা

দরজা আর জানালাগুলো খোলার শব্দ, অটো রিকশা আর ট্যাক্সির ছেদহীন ঘরঘরানি...শিশুদের কলকলানি, বড়দের খুশি-ঝলমল ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি এসব কিছুই কানে আসছে না আপনার? বহুকাল জমে-থাকা থকথকে ধুলোর 'পরে নির্মম ঝাড়ুর যত্রতত্র প্রহার। ধুলোর আর্তনাদ!...ঐ নিন-শুনতে পেলেন? কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। হ্যাঁ, ওরা আমার কথাই জিজ্ঞেস করছে—অন্য কারুকে—আর সে-লোকটাও, আমি যে এখানে নেই, সেকথা চিৎকার করে জানান দিচ্ছে। বেশ মজা পাচ্ছি আমি। ওরা ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি যে আমি এখানে ছিলাম, আর এখানেই রয়েছি। ধীরে-ধীরে ওরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এই কামরায় ঢুকে পড়বে। আমাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরবে, নিরত্যয় প্রশ্ন প্রাবৃটে প্লাবিত করে তুলবে আমাকে। বড়্ডো বাচাল আর বিবিৎসু এই লোকগুলো। জন্ম-কৌতূহলী।...কিন্তু মাঝেমধ্যে ওদের সহানুভূতিও ছলকে পড়ে আপনা-আপনি। ওরা মনের দিক থেকে ক্ষুদ্র হতে পারে, আবার অকারণে উদারও। ওরা ক্বচিত আপনার সঙ্গে অহেতুক শত্রুতা করে বসতে পারে, আবার পরক্ষণে জলও হয়ে পড়তে পারে, নিজে থেকে। ওরা এখানে-ওখানে সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আর হাজার চেষ্টা করলেও আমি ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি না। ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আমি যাবই-বা কোথায়, বলুন?...আমার এখন আর কোনো ইচ্ছেও নেই ওদের বা অন্য কারো থেকে পালানোর। ওরা এসে আমাকে ঘিরে ধরার আগে আমিই গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করবো। আমি ওদেরকে অবাক হবার সুযোগ দেবো। এটা তো ঠিক স্যার, মনে-মনে আমি উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত রয়েছি।...এমন তো নয় যে ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি ছটফট করছি।...আমার আশঙ্কা, ঐ কোলাহল আমাকে নিমজ্জিত করে ফেলবে। ওদের সামনে মুখ খুলতে হবে আর ফালতু ফরম্যালিটি দেখাতে হবে ভেবেই আমি শিউরে উঠেছি। সত্যি বলতে কি, আমার অবস্থাটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো। কিন্তু...এখন আপনাকেই বা কোন্ মুখে বলি স্যার—সেই যে মৃত্যুফাঁদের উল্লেখ গোড়াতেই আপনার কাছে করেছিলাম, সেটা যেন এখন হঠাৎ শিথিল হয়ে গেছে। এ-চেতনা যে হঠাৎ এই মুহূর্তে জেগে উঠলো আমার মধ্যে, তা নয়। কিন্তু আমার কাছে এটাও কম বিস্ময়কর বলে বোধ হচ্ছে না যে আমি এখন এই উদ্ভট দুনিয়ার একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছি যেটা আগে পারতাম না। এটাই কি যথেষ্ট কারণ বলে মনে হচ্ছে না আপনার যে, আমি এসব লোকের মাঝে নিজের জীবনযাপন অব্যাহত রাখতে পারি? সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ারও দরকার নেই, যেটা আগে করেছিলাম। আপনার কাছে এসব খুবই সিনেমাটিক মনে হচ্ছে হয়তো। কিন্তু বিশ্বাস করুন,

নিজের ওপর এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমার আর আমার মাথাটাও ঠিকঠাক কাজ করছে।

আপনার মনে আছে স্যার, আমি এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম যে, আমি কে? আমি এ-দাবি করতে পারি না যে এ-প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিতে পেরেছি বা নিজে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু একটু অন্তত বলতেই পারি যে প্রশ্নটাকে এখন আর সেই আগের মতো প্রাণঘাতী বলে মনে হচ্ছে না যাকে এড়িয়ে চলা আমার পক্ষে জরুরী। না। এখন আমি এই প্রশ্নটাকে নিয়ে সহজভাবে বাঁচতে পারি এবং তাকে নিজের মতো করে জিজ্ঞেস করতে পারি। যা-হোক, আমার-আপনার মধ্যে যে এক মাসের এগ্রিমেণ্ট ছিল, সেটা পুরো হয়ে গেছে আর আমরা বস্তুত আগেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছি, তবে এই অতিরিক্ত আর অনর্গল উপসংহার কার জন্যে?...তাতে কিছু এসে-যায় না স্যার, এখনও আপনি আমার কাছ থেকে এতদূরে চলে যাননি যে আমাকে চিৎকার করে নিজের কথা আপনার কানে পৌঁছে দিতে হবে।...তাহলে, বিদায়, স্যার...আপাতত বিদায়...সেইসমস্ত দিন আর রাতগুলিকে বিদায়, যেগুলি আমরা একে-অপরের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি...

Printed at Shagun Offset, Mohammad Pur, New Delhi-66